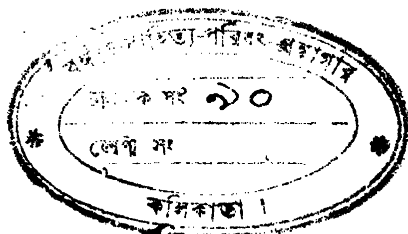
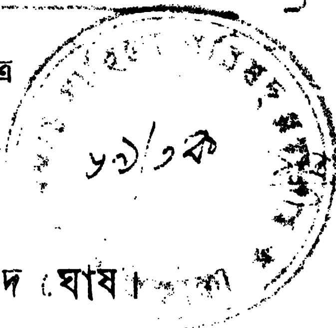


আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র





শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদিত।



তৃতীয় বর্ষ।



দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৯

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ক[illegible]তা।

প্রবন্ধের বর্ণমালানুক্রমিক সূচী।

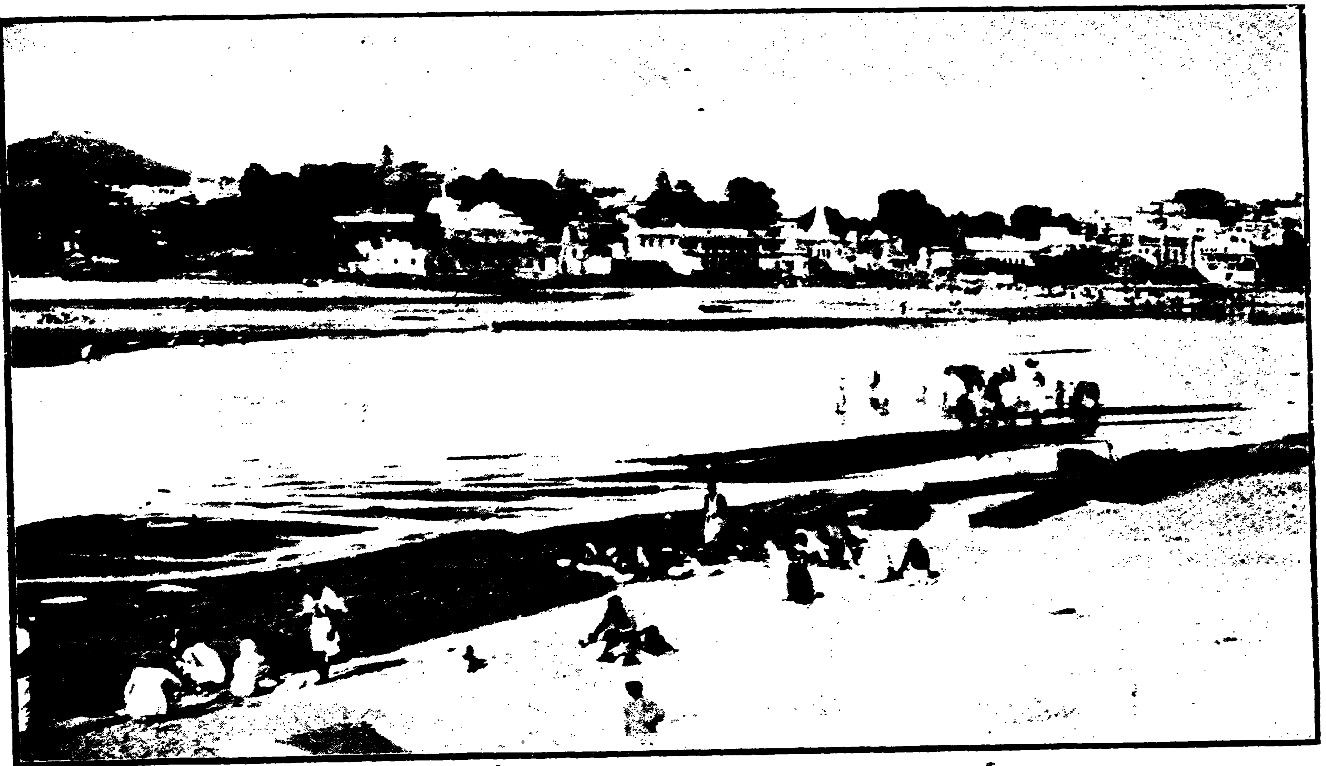
চ

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

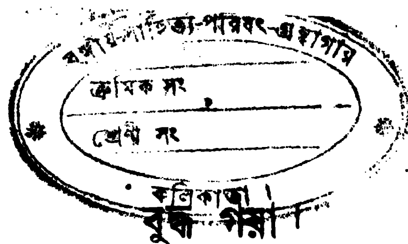
শ

হ

চিত্রসূচী।



গয়া



বুদ্ধ গয়া।

—•:•:•—

(১)

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল তীর্থে ভারতের নানা স্থান হইতে হিন্দু নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে সে সকলের মধ্যে গয়া আমাদের যত নিকট স্থিত এক বৈদ্যনাথ ব্যতীত আর কোন তীর্থই তত নিকটস্থিত নহে। পূর্ব্বে যখন ভারতে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই—বাষ্পীয় যানের বা বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব সূচিতও হয় নাই তখনও বাঙ্গালার স্নিগ্ধ পল্লী হইতে বর্ষে বর্ষে বহু নরনারী বিহারের কঙ্করকণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া গয়ায় বিষ্ণুপাদে মৃত স্বজনাদির পিণ্ডদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও পরলোকগত স্বজনগণকে মুক্ত মনে করিত। তখন "সুফল" প্রদানের অধিকারী গয়ালীদিগের কর্ম্মচারীরা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া "যাত্রী" সংগ্রহ করিত। তাহার পর বহু যাত্রী একত্র বিঘ্নবহুল পথ অতিক্রম করিত। তখন গয়ালীর কর্ম্মচারীর আগমনে শান্ত পল্লীগ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত। অন্তঃপুর-চারিকাদিগের গুপ্ত পরামর্শ—পুরুষ অভিভাবকদিগের সম্মতিলাভের উপায়-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি তখন মহিলাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তাঁহারা পুণ্য লাভের আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় পথশ্রমে অনভ্যস্তার ক্লেশসম্ভাবনার কথা ভুলিয়া যাইতেন। বাস্তবিক মানুষ ধর্ম্মের জন্য যে ক্লেশ—যে যাতনা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে পার্থিব কিছুরই জন্য সে ক্লেশ—সে যাতনা সহ্য করিতে পারে না।

এখন দেশের সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করা দূরে থাকুক এখন আর কেহ সুগঠিত ও সুরক্ষিত রাজপথে অশ্বযানে বা গোযানে গয়ায় গমনের কথাও মনে করে না। রেলপথের বিস্তারহেতু গয়া এখন নিতান্তই "ঘরের কাছে" হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা হইতে যাইতে এখন গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে যাওয়াই সুবিধা। পথ রম্যদর্শন। প্রথমে দুই পার্শ্বে কেবল সমতল ভূমি—শ্যামশস্যপূর্ণ—প্রাচুর্য্যের পরিপূর্ণ প্রফুল্লতায় প্রহৃষ্ট,—দূরে চক্রবালরেখায় প্রান্তর ও অম্বর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ;—মধ্যে মধ্যে পল্লবশ্রীসুন্দর বৃক্ষ—বৃক্ষের শ্যাম শোভার মধ্যে বংশ-

গুল্মবেষ্টিত বাঙ্গালার গ্রাম ; স্নিগ্ধ—শান্ত—সুন্দর'। মাঠে কৃষক কায করিতেছে—কৃষক-বালক গোপাল চরাইতেছে। সমস্ত পথে কোথাও মাঠে কোন রমণীকে কঠোর শ্রমে রত দেখিতে পাইবে না। গৃহ তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র—তাহারা গৃহের লক্ষ্মী। তাই পুরুষ তাহাকে গৃহের ভার দিয়া সানন্দে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতেছে। আপনার স্বেদে তপ্ত ভূমি সিক্ত করিয়া সে নিদাঘের মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডতাপেও ভূমি কর্ষণ করে,—বর্ষার অবিরল ধারায় সিক্ত হইয়া জলোকাবহুল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সে ধান্য রোপণ করে,—দারুণ হিমে সে বিনিদ্র হইয়া রজনীতে শস্যক্ষেত্র আগুলিয়া থাকে। সংসারের শ্রম তাহার, গৃহস্থালী রমণীর। এ উদারতা প্রতীচ্যে কোথায়? অবরোধ প্রথা পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়ক, না স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়?

তাহার পর ভূমির মূর্ত্তি ও প্রকৃতি, বর্ণ ও বৈষম্য পরিবর্ত্তন প্রকাশিত করে। প্রান্তরে সরসতার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, পাদপপত্রে বর্ণের গাঢ়তায় পরিবর্ত্তন দেখা যায়—গুল্মের বিরলতা ধরিত্রীর স্নেহের অভাব সূচিত করে। ক্রমে ভূমি কঙ্করাকীর্ণ দেখা যায়। আর দূরে মেঘের কোলে গাঢ়তর মেঘের মত গিরিশ্রেণী দেখা দেয়। প্রকৃতি জীবের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রান্তরে কৃষিকার্য্য শ্রমসাপেক্ষ পর্জ্জন্যের পর্য্যাপ্ত অনুগ্রহও শস্যোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নহে, তাই মানুষকে ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়া শস্যোৎপাদন করিতে হয়। যে স্থানে খালে বা খাতে জল নাই সে স্থানে কূপ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্র সিক্ত করিতে হয়। এই দারুণ শ্রমে রমণী পুরুষের সাহায্য করে। ক্ষেত্রে মলিনবাস শ্রমজীবীর পার্শ্বে শ্রমশীলা রমণীর মূর্ত্তি দেখা দেয় ; তাহার রঞ্জিত বাস প্রান্তরদৃশ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চার করে।

ক্রমে ট্রেণ পর্ব্বতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কোথাও পর্ব্বত কাটিয়া পথ—দুই পার্শ্বে উচ্চ গিরি, মধ্যে পথ ; গিরিগাত্রে লতাগুল্ম। কোথাও বা শীর্ণ জলধারা শিলা বাহিয়া ঝরিতেছে। কোথাও পর্ব্বতের পদে ঘুরিয়া, কোথাও পর্ব্বতের উপর দিয়া, কোথাও বা খাতপথে বা সুরঙ্গে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বৃহৎ উরগের মত ট্রেণ চলিতে থাকে।

প্রথমে পর্ব্বতাঙ্গে বৃক্ষলতাগুল্মের শ্যাম শোভা ; ক্রমে গিরিগাত্রে বৃক্ষলতার বিরলতা লক্ষিত হয়। শেষে ট্রেণ যখন গয়ায় আসিয়া উপনীত হয় তখন পর্ব্বতাঙ্গে শিলাখণ্ডেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

চারি দিকে গণ্ড শৈল গয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি—নানা পর্ব্বতে গয়া পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের শিরোদেশে প্রায়ই মন্দির দৃষ্ট হয়।

রামশিলা গয়ার উত্তরে অবস্থিত। এই গণ্ডশৈল ৩৭২ ফিট উচ্চ। ইহার চূড়ায় 'পাতালেশ্বর' মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের উপরার্দ্ধ দেখিয়া পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি দিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিম্নাংশে প্রায় ১০ ফিট পুরাতন—সম্ভবতঃ ১০১৪ খৃষ্টাব্দে (১০৭১ সম্বৎ) নির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে এই কালপরিচয় উৎকীর্ণ। পূর্ব্বে পর্ব্বতে উঠিবার সোপান সুগঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে সুগঠিত সোপানশ্রেণী পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত; ৩১৯ টি ধাপ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপনীত হইতে হয়। এই সোপান-শ্রেণী ১২৯২ সালে "টিকারির শ্রীযুক্ত রাজা রণবাহাদুর সিংহ নির্ম্মিত।" সোপানশ্রেণীর সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু মধ্যপথে বিশ্রামগৃহটির জীর্ণসংস্কার একান্তই প্রয়োজন।

রামশিলা হইতে একটি সুগঠিত রাজপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রেতশিলার পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বত ৫৪১ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতে প্রেত-শান্তির জন্য পিণ্ড প্রদত্ত হয়। পর্ব্বতোপরি অহল্যাবাইর প্রতিষ্ঠিত মন্দির বিদ্যমান।

গয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত। ইহাই পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোলাহল গিরি। পর্ব্বতের উচ্চতা ৪৫০ ফিটের অধিক নহে। পর্ব্বতোপরি শক্তিমন্দিরে শক্তির পঞ্চমুণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু দেব রাও ভাও সাহেবের ব্যয়ে পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির-মধ্যস্থিত মূর্ত্তির বেদীতে উৎকীর্ণ শ্লোকে জানা যায়, বেদীটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু মূর্ত্তি তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, শাক্যসিংহ বুদ্ধের অবস্থান স্মরণীয় করিবার জন্য বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এই গিরিশিরে শত ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিউয়েন্থ সাং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে গয়ায় আসিয়াছিলেন। তখন আর সে স্তূপের চিহ্নও বিদ্যমান নাই। তাহার পূর্ব্বেই ব্রহ্মযোনি শৈল হিন্দু তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

গয়ায় বাঙ্গালীরা ৪৫ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিয়া থাকেন। এই কার্য্য

দীর্ঘকালসাপেক্ষ। তাই আজ কাল অনেকে ফল্গুর বালুবক্ষে, বিষ্ণুপাদে ও অক্ষয়বটমূলে পিণ্ড দিয়াই গয়ালীর নিকট "সুফল" (সফলতা) লইয়া থাকেন।

গয়া ফল্গুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ফল্গু পার্ব্বত্য নদী—অন্তঃসলিলা। নদীগর্ভে বালুবিস্তার—স্থানে স্থানে সামান্য জল বাধিয়া আছে। এই ফল্গুর পরপার হইতে গয়া সহর অতি সুন্দর দেখায়—কূলে গৃহশ্রেণী—মধ্যে মধ্যে মন্দিরচূড়া। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান মন্দির বহু দিনের নহে। ইহা অহল্যাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, এই মহারাষ্ট্রীয় রাণী গয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠায় ১৬,০০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মন্দিরনির্ম্মাণে ৯,০০,০০০ টাকা ব্যয়িত হয়; অবশিষ্ট অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইয়াছিল।* এই মন্দির ধূসর প্রস্তরে গঠিত। মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান অংশ একটি মণ্ডপ মাত্র। গুচ্ছ গুচ্ছ স্তম্ভোপরি গম্বুজ—প্রতি গুচ্ছে চারিটি স্তম্ভ—স্তম্ভগুলি দুই স্তরে সজ্জিত। গর্ভগৃহ অষ্টকোণ ও চূড়াকৃতি। এই গৃহমধ্যে প্রস্তরে পদচিহ্ন—ইহাই গয়াসুরের শিরোপরিস্থ ধর্ম্মশিলায় বিষ্ণুর চরণচিহ্ন। মন্দিরের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বিরাজিত। ইহা নেপালের রাজমন্ত্রী রণজিত পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরের প্রবেশপথে আর একটি ঘণ্টা আছে—তাহাতে লিখিত, "বিষ্ণুপাদে মিষ্টার ফ্রান্সিস গিলানডার্স কর্ত্তৃক অর্পিত। গয়া, ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৯৮"। গিলানডার্স বহুদিন গয়ায় যাত্রী-শুল্কের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বিষ্ণুপাদের সন্নিকটে গদাধরের মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি শীর্ষাভরণহীন স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ হইতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমণের পথ আরব্ধ।

অদূরে সূর্য্যমন্দির। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব-বাহিত যানে আসীন। কিছু দূরে "অক্ষয় বট"—মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

গয়ায় বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকলের অধিকাংশই পাল রাজাদিগের সময়ের। পাল রাজগণ বারাণসী, মগধ ও বাঙ্গালা শাসন করিতেন। সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার প্রভুত্বচ্যুত করিলেও তাঁহারা মুসলমান বিজয়কাল পর্য্যন্ত মগধের অধিপতি ছিলেন।

* বুকানন বলেন, মন্দিরনির্ম্মাণে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।



গয়ায় বৌদ্ধ মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল মূর্ত্তি গয়ায় ছিল, কি নিকটবর্ত্তী বুদ্ধ গয়া হইতে আনীত তাহা স্থির করা অসম্ভব।

বাস্তবিক গয়ায় হিন্দুবৌদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতের স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য-সাধন। কিম্বদন্তীর ফেনপুঞ্জতলে ঐতিহাসিক সত্যের শীর্ণ ধারার চিহ্ননির্ণয় এত দিন পরে আর সম্ভব নহে। তবে গয়া যে বৌদ্ধ প্রাধান্যকালে বৌদ্ধ-দিগের প্রচারকেন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ ছিল বর্ত্তমান গয়ানগরের উপকণ্ঠস্থিত বুদ্ধ গয়ার মন্দির, বৃত্তি, স্তূপ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ।

বৌদ্ধদিগের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষে চারিটি তীর্থ বিশেষ সমাদৃত। বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে সমগ্র এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ছিল। এখনও এসিয়ায় নানা রূপে তাহার বিস্তার সামান্য নহে। বিশেষ বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়ায় শিল্পে ও সাহিত্যে যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছে তাহা অক্ষয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ, বহু শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনেও তাহার বিলোপ সংসাধিত হয় নাই। এই চারিটি স্থান সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রথম প্রচারক শাক্যসিংহের জীবনের চারিটি ঘটনার লীলাভূমি'; (১) কপিলবস্তু—বুদ্ধের জন্মস্থান, (২) উরুবিল্ব—বুদ্ধের সন্ন্যাসভূমি, (৩) বারাণসী—বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্ম প্রচারস্থান, (৪) কুশী—বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভভূমি। পঞ্চদশশত বৎসর বৌদ্ধগণ এই চারিটি তীর্থে গমন করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার উরুবিল্ব ও বারাণসী সমধিক সমাদৃত ছিল। বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক নেপালে সে ধর্ম্ম আত্মপরিচয় দিতে পারে, অন্যত্র তাহা ক্রিয়াকলাপে বিকৃত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাহা যে হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা নহে, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ পুরাণে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের উল্লেখ আছে, উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হইলেই প্রচলিত ধর্ম্মমতের সহিত তাহার বিরোধ অনিবার্য্য। যখন রাজ্যত্যাগী রাজপুত্রের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচলিত ক্রিয়া-কাণ্ডের নিন্দা করিয়া—বর্ণাশ্রমের মূল শিথিল করিয়া—গৃহস্থকে গৃহত্যাগী করিয়া—শত শত নরনারীকে নির্ব্বাণের কথা শুনাইতে লাগিল—আর নরনারী চূতকুলগন্ধাকৃষ্ট মধুমক্ষিকার মত সেই ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল তখন হিন্দু সমাজ যে চঞ্চল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজানুগৃহীত হিন্দু সমাজের সে চাঞ্চল্য যে একান্তই নির্ব্বিরোধীভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এমনও বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধনিপীড়নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘাতের প্রতিঘাত কিরূপ হইয়াছিল সে কথার উল্লেখ ইতিহাসে নাই। কিন্তু শিলালিপি ও শিল্পনিদর্শন সে বিষয়ে আর অধিক দিন সত্য গোপন রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

ইহার পর বৌদ্ধ শ্রমণগণ তুষারমণ্ডিত হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া, মরু পার হইয়া যে সকল দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন সে সকল দেশে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার কল্পনাও বোধ হয় শাক্যসিংহের মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছিল। শাক্যসিংহ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে তাহাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। রাজ্যত্যাগী রাজপুত্রের আদর্শে ও উপদেশে যে ধর্ম্মমত বিস্তারলাভ করিয়াছিল; সাধারণের বোধ্য ভাষায় যে ধর্ম্মমতের সার সত্য প্রচারিত হইত*, শাক্যসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আঘাতে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এদিকে সে ধর্ম্মে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানে ও ধ্যানে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ অসম্ভব; অজ্ঞানের জন্য দৃশ্যমান আদর্শের প্রয়োজন হয়। হিন্দুর সাকারোপাসনা সেই জন্যই নিরাকারের স্বতানুভবের সোপান। যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক ব্যবহারের বিরোধী হইয়াছিল সেই বৌদ্ধধর্ম্মেই ক্রমে মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তন হইল; বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, পৃথিবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা আরব্ধ হইল। বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—মন্দির ছিল না। প্রসিদ্ধ শ্রমণগণের দেহভস্মের রক্ষার্থ গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। প্রথমে সে সকল গৃহ কারুকার্য্যহীন ছিল—ক্রমে তাহাতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল—কারুকার্য্যের বাহুল্য তাহার অভাবের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। চৈত্যগাত্রে মূর্ত্তির স্থান হইল—চৈত্যমধ্যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গৃহে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশাধিকার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল হইতে লাগিল। শেষে শঙ্কর-বিজয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল। মাতৃকল্পা মহাপ্রজাপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মহিলাদিগকে স্বীয় প্রবর্ত্তিত

* সুত্তগণ।

ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় শাক্যসিংহ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—আনন্দ, এই ধর্ম্মে যদি রমণীর প্রব্রজ্যার ব্যাবস্থা না থাকিত, তবে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত—সহস্র বৎসর অটুট থাকিত; কিন্তু যখন ইহাতে রমণীর প্রবেশাধিকার হইল তখন ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না—ইহার পরমায়ু পঞ্চশতবর্ষের অধিক হইবে না। শঙ্কর-বিজয়ে শাক্যসিংহের সেই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল।

কিন্তু তখন বৌদ্ধ মত সিংহদ্বারপথে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে না পারিলেও পশ্চাতের দ্বারপথে সে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের উদার বক্ষে স্থায়ী স্থান লাভ করিল; বৌদ্ধ তীর্থ হিন্দুর তীর্থে পরিণত হইল; শাক্যসিংহ হিন্দুর অবতারমধ্যে পরিগণিত হইলেন। জয়দেবের স্তোত্রে বুদ্ধের বর্ণনা—

"নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতি-জাতং
সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশু-ঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর, জয় জগদীশ হরে।"

নিন্দা কর শ্রুতিজাত যজ্ঞবিধিচয়
লক্ষ্য করি' পশুঘাত সদয়-হৃদয়,
কেশব উরিলা যবে বুদ্ধরূপ ধরি'।
জয় জয়; তব জয়, জগদীশ হরি।

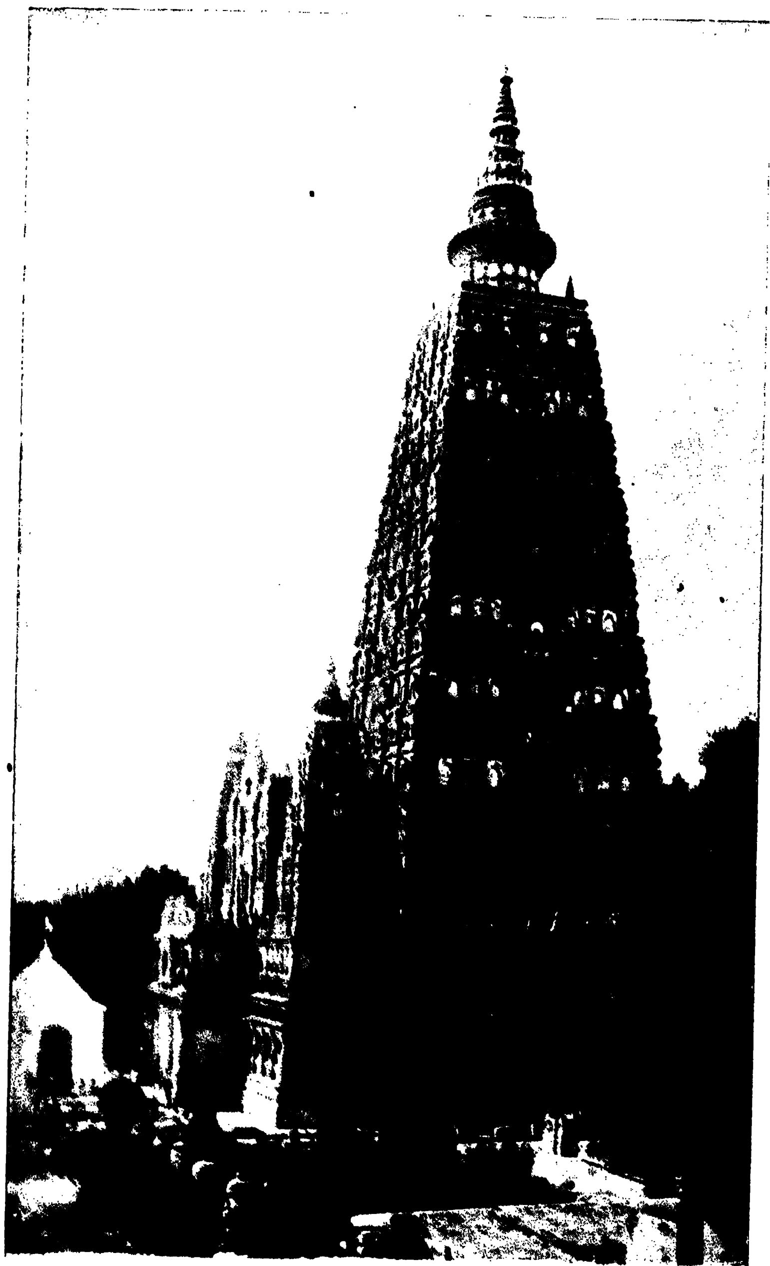
• শাক্যসিংহের জীবনকথা সম্বন্ধে 'ললিত বিস্তর' বিশেষ প্রামাণ্য পুস্তক। তাহাতে প্রকাশ, ব্যাধিত, জরাগ্রস্ত ও মৃত মানব দেখিয়া শাক্যসিংহ সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন; এবং মানবকে এই সকল স্বাভাবিক বিকারমুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীর চিত্তে শান্তি বিরাজিত মনে করিয়া তিনি সেই শান্তির সন্ধানে সন্ন্যাসী হয়েন। তিনি প্রথমে কোন শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রমে উপনীত হয়েন ও তথা হইতে পদ্মার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ব্রহ্মর্ষি রৈবতের ও রাজকের আশ্রম হইয়া ক্রমে বৈশালী নগরে কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সে শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি রাজগৃহে আসিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া সপ্ত শত শিষ্যবেষ্টিত রুদ্রকের শিষ্য হয়েন। তাঁহার শিক্ষাতেও শাক্যের অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হইল না। তখন তিনি

গয়ায় গমন করেন। রুদ্রকের আর পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সহগামী হয়েন। গয়ায় বা ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে অভীপ্সিত কার্য্যের সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব গ্রামে উপনীত হয়েন এবং ষড়্বার্ষিক ব্রত পালন করেন। ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াও যখন তিনি শান্তি পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সে পথ প্রকৃত পথ নহে। তিনি আহার্য্যের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আহার্য্যের জন্য গৃহস্থের দ্বারে যাইতে হইলে বসনাবৃত হইতে হয়। তাঁহার জীর্ণ বাস নষ্ট হইয়াছিল। তিনি শ্মশানে শবদেহ হইতে বসন সংগ্রহ করিলেন।

তাহার পর নিরঞ্জনার জলে স্নানে স্নিগ্ধ ও সুজাতাপ্রদত্ত আহার্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তিনি বোধিদ্রুমতলে প্রাণপণ করিয়া মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মারপ্রদর্শিত সকল প্রলোভন পরিহার করিয়া তিনি এই স্থানে দিব্য জ্ঞান লাভ করেন; এবং এই স্থান হইতেই তিনি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জগৎকে জ্ঞানজ্যোতিতে ভাস্বর করিবার জন্য বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই উরুবিল্বই বর্ত্তমান বুদ্ধ গয়া।

এই স্থানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাই উত্তর কালে বৌদ্ধ নৃপতিবৃন্দ বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধের অবস্থান স্মরণীয় করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া উরুবিল্বকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এখনও তাহার নিদর্শন বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। এখনও ব্রহ্ম, সিংহলাদি বৌদ্ধপ্রধান স্থান হইতে বহু যাত্রী এই পুণ্য তীর্থে সমাগত হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধ গয়া হিন্দু মোহান্তের অধিকারে—হিন্দুর তীর্থে পরিগণিত।



বুদ্ধ গয়ার মন্দির

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

সমাজনীতি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে "শক্তিশালীর প্রাধান্য" বা "Survival of the fittest" বলিয়া একটা কথা আছে। শুধু কথায় নহে, প্রতীচ্যবাসিগণের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি কার্য্যে, সমাজের প্রতি স্তরে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অণু-পরমাণুতে ইহা এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে যে, যে দিকেই দৃষ্টি-পাত করা যায়, এই ভাবটি অতি উজ্জ্বল ভাবে চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে ইহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র উপলব্ধ করাইয়া দেয়।

প্রধানতঃ পশুজগতেই আমরা এই প্রাধান্যনীতির দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাই। সিংহ মৃগশূকরাদি প্রাণী ধরিয়া আহার করে, যূথপতি প্রতিদ্বন্দীর ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকে। ডারউইনের মতে বানর আত্মরক্ষার্থ অনন্যোপায় হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদানকৌশল শিক্ষা করিয়াছে; বাজ, চিল প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীর নিষ্ঠুর আক্রমণে অনেক প্রাণীকেই অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। "শক্তিই আমার স্বত্ব" এই নীতির বিষময় ফল বুঝিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত ইতর প্রাণীরা নিজ নিজ প্রকৃতিজাত ব্যবহার সংযত করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবগণ এই অনিষ্টকর নীতির দোষগুণ অবগত হইয়াও কি আপনাদের কার্য্যকলাপে অপেক্ষাকৃত উদার নীতি অবলম্বন করিতে পারিয়াছে? শুধু জীবন ধারণের জন্য নহে, নিকৃষ্ট আমোদপ্রমোদের প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়াও, আমরা যে সব নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি, তাহা ভাবিলে অনেক সময় আমাদের সভ্যতায় ধিক্কার আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য প্রাণী হইতে মানবই "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির শ্রেষ্ঠ উপাসক! কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের সহিত ব্যবহারে মানব যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, স্বকীয় মঙ্গলার্থ তাহাকে সমাজে থাকিয়া অনেক সময়েই সংযত হইয়া চলিতে হয়। সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন প্রকার নৈতিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পৃথক পৃথক জাতিকে স্ব স্ব সুবিধানুরূপ নিজ নিজ সমাজে ন্যায়ের বিধান বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এক দিকে চলিয়াছেন, আর আমরা প্রাচ্যদেশবাসী ভিন্ন পন্থা অবলম্বন

করিয়াছি। এই দুই পন্থার বিশেষত্ব প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির উপরেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ও পারিবারিক জীবন গঠিত। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে এই তিনটির আলোচনা করিব। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় জীবন। য়ুরোপ আজকাল শক্তিশালী, সসাগরা পৃথিবী তাহার পদানত। কিন্তু য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় জীবন কোন্ রীতি অবলম্বনে চলিতেছে ? য়ুরোপ আমেরিকা অধিকৃত করিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তথাকার আদি অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধিত হইল। আফ্রিকার অনেক প্রদেশে সেই সেই প্রদেশের লোকদিগের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। পাশ্চাত্য দেশে "কালা আদমির" প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। এই সব কিসের অভিব্যক্তি ? "শক্তিই আমার স্বত্ব," "তুমি অশক্ত অতএব তোমাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে" য়ুরোপ এই নীতির বিজয় ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

তাহার পর সামাজিক জীবন। য়ুরোপে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান না থাকিলেও স্ব স্ব অবলম্বিত বৃত্তি অনুযায়ী লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে হইয়াছে ; যথা তন্তুবায় সম্প্রদায়, কর্ম্মকার সম্প্রদায় প্রভৃতি। কিন্তু এই সব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের বৃত্তির স্থিরতা আছে কি ? আজ যদি কোন দেশে বর্ত্তমান বয়ন প্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর কোন প্রথা আবিষ্কৃত হয়, তবে ম্যান্‌চেষ্টারের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধিত হইবে। ঐ সম্প্রদায়ের কাহার কি হইল, কয়জন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিবে কি ? অর্থাৎ আমি শক্তিশালী, অতএব আমাকে প্রাধান্য করিতে দাও তুমি যে দিন সমর্থ হইবে, আমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিও—সমাজ ইহাই ঘোষণা করে।

শেষ পারিবারিক জীবন। আমরা ভাই, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একত্র প্রতিপালিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যদি দৈবগতিতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে না পার, তাহাতে আমার কিছুই ভাবিবার নাই। আমি সুখ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিব, তোমার জন্য আমি কিছু করিতে বাধ্য নহি। পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবন এইরূপ ভাব লইয়া গঠিত।

প্রত্যেক কার্য্যেই দোষগুণ উভয়ই আছে ; এই "প্রাধান্য নীতিতে"ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে এই নীতি অবলম্বন

করাতেই য়ুরোপ আজ পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছে। সামাজিক জীবনে এই নীতি অবলম্বন করাতে, প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠতর কিছু অবিষ্কার করিয়া অন্যের উপর প্রাধান্য-লাভের চেষ্টা করিতেছে; ইহাতেই শ্রমশিল্পে য়ুরোপ বর্ত্তমান যুগে প্রধান। আর পারিবারিক জীবনে এই নীতি অবলম্বিত হওয়াতে প্রত্যেকেই স্বীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে সমগ্র জাতিটা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কোন জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি লইয়া আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন্ জাতি কতটা উদার ভাব পোষণ করে এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে কাহার কতটুকু দিবার আছে, তাহা প্রদর্শিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এখন আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা দিয়া যখন এ দেশে প্রবেশ করেন, তখন দ্রাবিড়, ভীল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে বাস করিত। আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইল; আর্য্যগণ তাহাদিগের পরিত্যক্ত দেশগু'ল অধিকার করিয়া বসিলেন; অসভ্যগণ একটু দক্ষিণে সরিয়া নির্ব্বিবাদে বসবাস করিতে লাগিল। এইরূপে সরস্বতীতীরে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু আর্য্যগণ তখন কি করিয়াছিলেন? ঘোর কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগের মধ্যেও যাহারা তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাঁহারা তাহাদিগকে আপনাদিগের সমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা অসভ্যদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেন; কিন্তু "শক্তিশালীর প্রাধান্য" তাঁহাদের মূলমন্ত্র না হইয়া "দুর্ব্বলের রক্ষাই" তাঁহাদের নীতি বাক্য হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ আজ পর্য্যন্ত সেই নীতি বাক্যকে আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছে।

আর্য্যদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। সরস্বতীতীরে যখন তাঁহাদের বংশ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তথায় আর তাঁহাদের স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা আবার দেশজয়ে বহির্গত হইলেন। কিন্তু যতটুকু স্থান তাঁহাদের প্রয়োজন, কেবল ততটুকু অধিকার করিয়াই—তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন; অধিকন্তু অপরের জন্যও আপন সমাজে উপযুক্ত স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপে আপনাদিগের আবশ্যক বোধে বহু শতাব্দীর অভিযানের ফলে তাঁহারা দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে বিন্ধ্যাচলের

পরপারে রাখিয়া আসিলেন; কিন্তু আর অগ্রসর হইলেন না। "বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে আর্য্য যাইবেন না" এইরূপ একটা নিষেধবাক্য রচনা করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যত বংশধরগণকেও দক্ষিণাভিমুখী হ'তে নিষেধ করিয়া দিলেন। বোধ হয় তখন তাঁহারা ভবিয়াছিলেন, "আর লোকপীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই, এই বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।" যদি "শক্তিই আমার স্বত্ব" ইহাই আর্য্যদিগের অবলম্বিত নীতি হইত, তবে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহাদের এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত না। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, আর্য্যগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন; যেন নিতান্ত প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে অভিযান করিতে হইয়াছিল। আবার তাঁহারা বিজিতদিগকে আপনাদিগের সমাজে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—আর্য্যদিগের সামাজিক জীবন। জাতিবিভাগ আজকাল একটা মহা অনর্থের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আর্য্যবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক ব্যবসায়ে অধিকার জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিলে, যাহারা অশক্ত তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান হয় না; পাছে নিতান্ত অক্ষম, দুর্ব্বল ব্যক্তিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া উপায়হীন হইয়া পড়ে, এই জন্য আর্য্যগণ সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিয়ম হইল যে, কেহই জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। সমাজের অতি হেয় ব্যক্তির জন্যও এত সতর্কতা শুধু এই রক্ষণশীল সমাজেই সম্ভবপর। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত এই জাতি কিরূপ নির্ব্বিবাদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইহার ফলে বৃত্তিবিকাশে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল।

আর্য্যদিগের পারিবারিক জীবনের আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক পরিবারে বহু ব্যক্তিকে লইয়া একত্র বাস করা আমাদের প্রচলিত প্রথা। রক্ষণশীল নীতি হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বচ্ছলতায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইব, আর আমার আত্মীয় অক্ষম বিধায় লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিবে, ইহা আমাদের নিকট ঘৃণ্য।

তাই আমরা সক্ষম, অক্ষম সকলে একীভূত হইয়া একই পরিবারে আসিয়া আশ্রয়স্থান খুঁজিয়া লই। হিন্দুসমাজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি সঙ্গতিপন্ন হইলে দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের ত কথাই নাই, পাড়াপ্রতিবেশীও আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এই উদারতার যেমন গুণ আছে তেমনই দোষও আছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে "শক্তিই আমার স্বত্ব" এই নীতি অবলম্বন না করাতে ভারতবর্ষ কখনও এক রাজার অধীনে দৃঢ়রূপে গঠিত পারে নাই। রামায়ণমহাভারতে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রায় শতাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজগণ যে, অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারলালসার অভাবই বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাজা অন্যান্য রাজ্যগুলি স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া রাজহত্যা ও লোকপীড়ন পূর্ব্বক নিজ অদমনীয় রাজ্যপিপাসার শান্তি করিতেন, এবং বিজিত রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতেন, তবেই আমরা এ দেশে দীর্ঘকালস্থায়ী রাজবংশ সকলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম। মহারাজ অশোক প্রথমজীবনে এই কার্য্য কিছু করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উত্তরকালে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি পথান্তর গ্রহণ করেন।

আর্য্যদিগের সামাজিক জীবন "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির উপর গঠিত না হওয়ায় সমাজের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধে এ দেশে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল; ভারতের তৎ-পরবর্ত্তী ইতিহাস বড়ই অপরিস্ফুট। আর্য্য বীরত্ব প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পরে পুনরায় রাজপুতানার ইতিহাসে দেখিতে পাই। এইরূপে যদি কোন প্রকারে কোন সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধিত হয়, তবে জাতিভেদ প্রথায় গঠিত সমগ্র সমাজটা তাহার অভাবে অনেকটা নামিয়া পড়ে। তাহার পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তদন্তর্গত লোকগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে ইসপের গল্পের খরগোসের মত ঘুমাইবার অনেকটা অবসর পাইয়াছিল। তাহাতেই আমাদের দেশে শ্রমশিল্প আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়াতে তাহা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

অবশেষে আর্য্যদিগের পরিবারগঠন। রক্ষণনীতির প্রবর্ত্তন হওয়াতে

পরিবারে অনেক নিশ্চেষ্ট পুরুষের স্থান হইয়াছে। ইহা জাতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

কিন্তু এই সকল দোষ সত্বেও হিন্দুগণ তিন চারি সহস্র বৎসর কিরূপে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমাদের পক্ষে এখন আর সে স্থান অধিকার করিয়া থাকা সম্ভব নহে কেন? পরিবর্ত্তন আমাদের শিক্ষার ও দীক্ষার।

কিন্তু আজও হিন্দু সমাজের একপ্রাণতা শিখিবার জিনিষ। এত বড় একটা প্রকাণ্ড মহাসঙ্ঘ, কত শত সহস্র লোকের মিলনক্ষেত্র, অথচ ইহার অন্তর্ভুক্ত অতি দুর্ব্বল প্রাণীর সুখের জন্যও সমাজ যেরূপ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই মহান্ এবং বিস্ময়কর। যাহার হৃদয় আছে, সে-ই ইহার উদারতা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

বিদায়।

জননী চাহিয়া আছে দূর নভো-পানে,
প্রবাসী পুত্রের তরে, আকুল পরাণ।
মনে পড়ে, বিদায়ের সকরুণ ছবি,
মনে পড়ে, সেই দুটি কাতর নয়ান,
অশ্রুভার সমাকুল। ম্লানমুখে আসি'
নীরবে নমিলা যবে চরণের তল;
ফুটিল না কোন কথা, চাহি' মুখপানে,
স্নেহভরা দুটি আঁখি করে ছল ছল।

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু।

কর্ণেল স্কিনার।

—:০:—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া ভারতের সম্রাট হইবার বাসনায় নানা দিকে নানাজন নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন প্রধানতঃ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণই দিল্লীর মোগল সম্রাটকে "সাক্ষীগোপাল" করিয়া প্রথমে তাঁহার নামে রাজ্য-শাসন করিয়া পরে—ক্রমশঃ ভারতসাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ বিষয়ে মাধোজী সিন্ধিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের নামে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ও ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপনের সুযোগ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। চারি দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চলিতেছিল। য়ুরোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তাহাদিগের মত সুশিক্ষিত সৈন্য না পাইলে তাহাদিগের সমকক্ষ হওয়া দুষ্কর। তাই ভারতবাসী স্বাধীন রাজারা য়ুরোপীয় যোদ্ধ্‌গণের আদর করিতেন। আর লাভের আশায় অনেক য়ুরোপীয় তাঁহাদিগের সেনাদলে কার্য্য করিয়া অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়—ইংরাজ মুসলমানের নিকট হইতে ভারত জয় করেন নাই ; ভারতে সাম্রাজ্যসংস্থাপনে তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ মাহারাষ্ট্রীয় ও শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সে সময় ইংরাজ না আসিলে ভারতবর্ষ আবার হিন্দুর শাসনাধীন হইত। যে সকল য়ুরোপীয় অর্থলোভে ভারতীয় সেনাদলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, স্কিনার তাঁহাদিগের অন্যতম।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে জেমস্ স্কিনারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তখন কোম্পানীর সেনাদলে এনসাইন। স্কটল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। চেৎসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি মৃজাপুর অঞ্চলের কোন রাজপুত ভূম্যধিকারীর দুহিতাকে বন্দী করিয়া স্বীয় প্রণয়িনী করেন। এই রাজপুত রমণীর গর্ভে স্কিনারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাত্রয়ের সহিত কোম্পানীর তিন জন ভদ্র কর্ম্মচারীর বিবাহ হইয়াছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডেভিড জাহাজে কায করিতেন এবং মধ্যম জেমস্ ও কনিষ্ঠ রবার্ট যুদ্ধব্যবসায়ী

ছিলেন। শিক্ষার্থ দুহিতাদিগের বিদ্যালয়বাসের প্রস্তাব হইলে তাঁহাদিগের জননী অবরোধ প্রথার বিলোপে সম্ভ্রমনাশের আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। মাতৃহীন জেমস্ ও রবার্ট কোন দাতব্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েন। তাঁহাদিগের পিতা তখনও সামান্য বেতনভোগী লেফটেনাণ্ট—এতগুলি সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভারবহনে অক্ষম। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হইলে পুত্রদ্বয়ের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে বাসের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে প্রত্যেকের জন্য মাসিক ত্রিংশ মুদ্রা ব্যয়িত হইত।

দুই বৎসর পরে সাত বৎসরের জন্য চুক্তি করিয়া জেমস্‌কে কোন মুদ্রাকরের নিকট কায শিখিতে দেওয়া হয়। তিন দিন কায করিয়াই তিনি বিরক্ত হইয়া পলায়ন করেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠের মত জাহাজে যাইতে উদ্যত—সম্বল ছয় আনা। এই ছয় আনায় ছয় দিন আহার নির্ব্বাহ করিয়া তিনি রিক্তহস্তে কোন দিন বা মোট বহিয়া—কোন দিন বা দৈনিক তিন আনা মজুরীতে সূত্রধরের কার্য্যে সহকারিতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কয়দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কোন পরিচারক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর নিকট লইয়া যায়। ভৎর্সিত বালক দলিল পত্র নকলের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিন মাস পরে তাঁহার Godfather কর্ণেল বার্ণ কলিকাতায় উপনীত হয়েন এবং জেমস্‌কে সৈনিককার্য্য গ্রহণ-প্রয়াসী দেখিয়া তাঁহাকে তিন শত টাকা দিয়া তাঁহার পিতৃসমীপে প্রেরণ করেন। পিতা তখন সৈন্যদলসহ কানপুরে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেমস্ তথায় উপনীত হয়েন। তাহার এক পক্ষকাল পরে কর্ণেল বার্ণ তথায় উপনীত হইয়া সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষ দুবোয়াঁকে একখানি পত্র দিয়া জেমস্‌কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি জেমস্‌কে মথুরায় কাপ্তেন পলম্যানের (Pohlman) অধীনে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে এনসাইন নিযুক্ত করেন।

দুবোয়াঁ অল্প দিন পরেই (১০৯৫ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টমাস দিন) কার্য্য ত্যাগ করিলে দ্বিতীয় সেনাদলের সেনাপতি সাদারল্যাণ্ড সিন্ধিয়ার অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েন। জেমস্ স্কিনার তাঁহার অধীনে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। সাদারল্যাণ্ড ও লাকাদাদা তখন বুন্দেলখণ্ডে কতিপয় অবাধ্য রাজার ও সর্দ্দারের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত। জেমস্ তাঁহাদিগের অধীনে দুইটি যুদ্ধে ও পাঁচ ছয়টি দুর্গ আক্রমণে ও অধিকারে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহাতে তাঁহার যুদ্ধাসক্তি বর্দ্ধিত হয় ও তিনি ভারতীয় যুদ্ধপ্রথা অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

পরবৎসর পেরং সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলে জেমস্ ক্যাপ্টেন বাটারফিল্ডের অধীনে বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হয়েন। প্রথম যুদ্ধে চাঁদঘোরীতে মার্হাট্টা অশ্বারোহী সৈন্যদল দলত্যাগ করিলে বাটারফিল্ডের পরাজয় হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্কিনার বিশেষ সাহস ও কৌশলের সহিত সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিলে সেনাপতি তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করেন ও প্রধান সেনাপতি তাঁহার বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করেন।

ইহার পর সাদারল্যাণ্ডের পদে পলম্যান অধিষ্ঠিত হইলে যুবক স্কিনার তাঁহার অধীনে নানা যুদ্ধে ও অবরোধে ব্রতী হইয়াছিলেন। মালপুরার যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসে শত্রুর কামান দখল করেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষ সময় রাঠোরগণের পলায়নকালে তিনি আক্রান্ত হইলে তাঁহার অশ্ব নিহত হয় ও তিনি একটি কামানের নিম্নে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধের পর তিনিই প্রথম শত্রুশিবির পরিদর্শন করেন ও নানা মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে জয়পুরের রাজার প্রধান রাজচিহ্ন মহিমার্ত্তব* আনিয়া স্বীয় মার্হাট্টা সেনাপতিকে দেন। সেনাপতি তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ও তাঁহাকে একটি মূল্যবান খেলাত দেন।

ইহার পর পেরং সেনাদলসহ স্কিনারকে একজন রাজপুত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে তিনিই কর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ফলে কেরোলীর রাজা তাঁহার প্রতিবেশী উনিয়ারার রাজার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি ছয় দল পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও বিংশতি কামান সহ রাজার সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়েন। তখন বিদেশীয় সেনাপতিগণ অর্থসাহায্য লইয়া সচরাচর এরূপ পক্ষাবলম্বন করিতেন। ইহা তাঁহাদিগের আয়ের উপায় ছিল। স্কিনার কিন্তু বিপন্ন হইলেন। কেরোলীর রাজা প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইলে অর্থাভাবে স্কিনারের সেনাদল অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সেনাপতি পলম্যানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সে সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই উনিয়ারার রাজার ষড়যন্ত্রে অর্থলোভে সিন্ধিয়ার ও কেরোলীর

* এই মৎস্যচিহ্ন মোগলবাদশাহদিগের বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন ছিল।

সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শত্রুদলে যোগ দিল। বিপন্ন স্কিনার তিন ক্রোশ দূরস্থিত টঙ্কে আশ্রয়গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। বিপক্ষদলও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি প্রথম আক্রমণে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার পাঁচটি কামান শত্রুর হস্তগত ও তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। বিপক্ষদল পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পশ্চাদগমন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি সৈন্যদলকে বলিলেন—এক বার ব্যতীত কেহ দুই বার মরে না—অতএব যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। উৎসাহিত সেনাদল শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। শত্রুসেনার সম্মুখভাগ পশ্চাদ্‌পদ হইল ও তাহাদের কামানগুলি স্কিনারের হস্তগত হইল সত্য; কিন্তু তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি পিছু হটিয়া নিকটবর্ত্তী গিরিশঙ্কটে আশ্রয়গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে শত্রুদলের সাহস বাড়িয়া গেল; তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কামানগুলি অধিকার করিল। তিনি অবশিষ্ট তিন শত মাত্র সৈনিক লইয়া "মরিয়া হইয়া" তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি স্বয়ং—আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ও তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইল।

তখন অপরাহ্ন। যখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন প্রভাত হইয়াছে। তাঁহার পরিধেয় ইজার ব্যতীত আর সবই অপহৃত। চারি দিকে মৃত ও আহত সৈনিক; তাহাদের মধ্যে একজন সুবাদার—তাহার একখানি পদ গোলায় উড়িয়া গিয়াছে—আর একজন জমাদার—বর্শার আঘাতে কাতর। সকলেই তৃষ্ণায় পীড়িত। রৌদ্র যত প্রখর হইতে লাগিল তৃষ্ণা ততই প্রবল হইতে লাগিল। অথচ পিপাসা নিবারণের উপায় নাই। দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল; কিন্তু মৃত্যু বা সাহায্য কিছুতেই আহতদিগের যন্ত্রণানিবারণের উপায় হইল না। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল—জ্যোৎস্নালোকে রণক্ষেত্র প্রেতলীলাভূমির মত বোধ হইতে লাগিল। চারিদিকে নৈশ নিরবতা ভেদ করিয়া আহতের আর্ত্তনাদ—পিপাসা-কাতরের জলপ্রার্থনা। শিবাদল শব ভক্ষণ করিতে করিতে জীবিতদিগের সন্নিকটে আসিতে লাগিল; তাহারা দুর্ব্বল হস্তে উপলখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিয়া শবাহারীদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। দিবাভাগে ভীষণ রৌদ্রের পর নিশীথের শীতল বাতাসে অবসন্নদেহ আহতগণ কম্পিত হইতে লাগিল। স্কিনার সঙ্কল্প করিলেন,

এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে আর কখন যুদ্ধ করিবেন না, আর সারিয়া উঠিলে খৃষ্টান পিতার উপাস্য দেবতার উদ্দেশে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন।

পরদিন প্রভাতে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা একটি ঝুড়িতে রুটি ও একটি কলসে পানীয় জল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং আহতদিগকে এক এক টুকরা রুটি ও জল দিতে লাগিল। রুটি খাইয়া ও জল পান করিয়া স্কিনার একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা চামার জানিয়া উচ্চবর্ণ রাজপুত সুবাদার আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন—যন্ত্রণার অবসানের অধিক বিলম্ব নাই—যন্ত্রণার সামান্য তারতম্য অকিঞ্চিৎকর; যন্ত্রণালাঘব করিবার জন্য জাতিধর্ম্মনাশ কখনই অভিপ্রেত নহে। এই সময় উনিয়ারার রাজার লোক মৃতের সৎকার করিতে ও আহতদিগকে শিবিরে লইতে আসিল। সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুবাদার তাহাদিগের প্রদত্ত জল পান করিলেন এবং স্কিনার ও অন্যান্য আহতদিগের সহিত শিবিরে প্রেরিত হইলেন।

এক মাস পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্কিনার স্বাধীনতালাভোদ্দেশে বিদায় লইয়া কলিকাতায় ভগিনীর নিকট আসিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে জলদাতৃকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়া বলিয়া পাঠান যে, তিনি তাহাকে মাতৃসম জ্ঞান করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণ যন্ত্রণায় স্কিনার সঙ্কল্প করেন যে, রক্ষা পাইলে তিনি আর যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না এবং সুস্থ হইলে গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনি শেষ সঙ্কল্প রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রথম সঙ্কল্প সংরক্ষিত হয় নাই।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্কিনার সুস্থ হইয়া কার্য্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও মে মাসে সৌণ্ডা আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধিয়ার তৃতীয় সেনাদলের সহিত প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে স্কিনারের সেনাদলের তিনজন সেনাধ্যক্ষ হত ও প্রায় একসহস্র সৈনিক হতাহত হইলেও* তিনি শত্রুসেনাপতি লাকাদাদার কামানগুলি অধিকার করেন। ইহার পর স্কিনার সেনাদলসহ আলিগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

* কম্পটনের মতে এই সকল ঘটনার বিবরণ একটু অতিরঞ্জিত। কারণ, ইহা স্কিনারের আত্মজীবনী হইতে গৃহীত এবং স্কিনার এ সকল বিষয়ে একটু অতিরঞ্জনপ্রিয় ছিলেন।

দুই মাস পরে তিনি "হরিয়ানার রাজা" নামে খ্যাত বিখ্যাত জর্জ্জ টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হয়েন। স্কিনারের মতে জর্জ্জগড়ের যুদ্ধের মত আর কোন ভীষণ যুদ্ধে তিনি যোগ দেন নাই। জর্জ্জগড়ে পরাজিত টমাস্ হানসিতে আসিলে আবার যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ রবার্ট জেমস্ স্কিনারের সহকর্ম্মী ছিলেন। টমাসের বিক্রমে রবার্টকে পশ্চাদ্‌পদ হইতে হয়। এমন সময় জেমস্ আসিয়া টমাস্‌কে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে রবার্ট ও টমাস্ পরস্পরের এত নিকটে আসিয়াছিলেন যে, বরার্ট টমাসের অঙ্গে তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন—বর্ম্মাবৃত থাকায় টমাস্ রক্ষা পাইয়াছিলেন। উদারহৃদয় টমাস্ শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণের পর রবার্টের বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করেন ও স্বীয় দেহে তাঁহার অস্ত্রাঘাতচিহ্ন দেখান। স্কিনার যেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহাতে টমাস্ আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। এ ক্ষেত্রে স্কিনারের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে স্কিনার পেরংএর সহিত দৌলত রাও সিন্ধিয়ার প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাধোজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র দৌলত রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি তরুণবয়স্ক, হীনচরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশুর সূর্য্যরাও ঘাট্‌কের পরামর্শে পেরং ও তাঁহার পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনানায়কগণকে দরবারে আহ্বান করিয়া নিহত বা বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কর্ণেল সাদারল্যাণ্ড ও মেজর ব্রাউনরিগ এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন। কিন্তু প্রধান মার্হাট্টা সেনাপতি গোপাল রাও ভাউ পেরংকে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া দেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া সিন্ধিয়ার ব্যবহারে সন্দিহান পেরং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দরবারে যাওয়ায় সিন্ধিয়ার দুরভিসন্ধি পণ্ড হয়। স্কিনার বলেন, দরবার শেষ হইলে পেরং স্বীয় তরবারি সিন্ধিয়ার পদতলে সংস্থাপিত করিয়া বলেন—বৃদ্ধ বয়সে তিনি কোনরূপ অপমান সহ্য করিতে অসমর্থ—তিনি কার্য্য ত্যাগ করিতেছেন। অতঃপর তিনি অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে বলেন, তাঁহারা আর তাঁহার অধীন নহেন—এখন হইতে সিন্ধিয়ার নির্দ্দেশমত কার্য্য করিবেন। তিনি সিন্ধিয়াকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিয়া বলেন,—সূর্য্যরাও কর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার এই কথায় প্রবীণ মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ যোগ দেন ও স্পষ্ট করিয়া এই কথা বলার জন্য পেরংকে সাধুবাদ করেন। কিন্তু স্মিথ বলেন,

স্বীয় ক্ষমতাহ্রাসাশঙ্কায় পেরং দৌলতরাওকে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দিয়া তুষ্ট করেন। ঐতিহাসিক কম্পটন এই কথাই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দৌলতরাও যেরূপ চরিত্রহীন, হীনবৃত্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে একজন বিশস্ত কর্ম্মচারীর দুঃখে বিচলিত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু পেরংএর অর্থ পাইয়া তুষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। পেরংএর ক্ষুণ্ণ সম্মানজ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার প্রদত্ত অর্থই দৌলতরাওকে সঙ্কল্পচ্যুত করা অধিক সম্ভব।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধঘোষণা হইলে গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মার্হাট্টা বেতনভোগী ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় ও পদোচিত পেনসন লইবার জন্য এক ইস্তাহার প্রচার করেন। অনেক ইংরাজ এই আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়েন। কার্ণেসী ও ষ্টুয়ার্ট নামক দুইজন ক্যাপ্টেন পেরংকে পদত্যাগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া অবিলম্বে মার্হাট্টারাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। তাঁহার সহিত ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং তাঁহার এই অবিশ্বাসে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই পদচ্যুত কর্ম্মাচারিগণের মধ্যে স্কিনার ও ষ্টুয়ার্ট য়ুরেশীয়। ছয়জন পদচ্যুত কর্ম্মচারী পরিজনগণের বাসভূমি আগ্রা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে পথে আড্ডা লইয়া বিশ্রামলাভের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, মার্হাট্টা অশ্বারোহী সেনাদল যুদ্ধে পরাভূত সেনার মত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পলায়ন করিতেছে। তাঁহারা আলিগড়ে লেকের সহিত যুদ্ধে পেরংএর পরাজয়ের এই প্রথম আভাস পাইলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই পেরং বিশ্রস্তবেশে সেই পথে উপস্থিত হইলেন।

স্কিনার ইংরাজের অনুরক্ত থাকা দূরে থাকুক স্বীয় জননীর প্রতি পিতার ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিরক্তই ছিলেন। তিনি ইংরাজের অধীনে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক ছিলেন না—সেই জন্য অগ্রসর হইয়া পেরংএর নিকট তাঁহার পদচ্যুতির প্রতিবাদ করিয়া পুনরায় তাঁহার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পেরং বলিলেন, মর্হাট্টা অশ্বারোহীরা পলায়ন করায় জয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, সুতরাং স্কিনারের পক্ষে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। স্কিনার পুনরায় বলিলেন, তখনও জয়ের আশা শেষ হয় নাই—তিনি স্বয়ং সেনাদলসহ ইংরাজদিগকে পরাজিত করিতে প্রস্তুত। তদুত্তরে পেরং ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে

বলিলেন—"বিশ্বাস করিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন স্কিনার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, কয়েকজন অবিশ্বাসী সেনানায়কের ব্যবহারে সমস্ত বিশ্বাসী সেনানায়ককে পদচ্যুত করিয়া ও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন-পর হইয়া তিনিই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা সিন্ধিয়াকে এ কথা জানাইবেন। পেরং আর কিছু না বলিয়া বিদায় অভিনন্দন করিয়া হাতরাসগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্কিনার চীৎকার করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর স্কিনার ও তাঁহার সহযাত্রীরা সংশয়াকুল চিত্তে লর্ড লেকের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। লেক তাঁহাদিগকে আশস্ত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্কিনার বহুদিন সিন্ধিয়ার বেতন ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। লর্ড লেক যুবক স্কিনারের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কান-পুরের পথে শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্কিনার একদল অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ ও গঠন করিয়া পেরংএর একটি পূর্ব্বসেনাবাসে আড্ডা করিয়া চারি দিকে ব্যাপ্ত অশান্তির ও অরাজকতার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় তাঁহাকে অদূরে মার্হাট্টা দস্যু মধুরাওয়ের বিরুদ্ধে ও দূরে পাঠান আমীর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হয়। উভয় অভি-যানেই তিনি জয়ী হয়েন।

এই সময়ে যশোবন্তরাও হোলকারের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। হোলকার সিন্ধিয়ার চিরশত্রু। সুতরাং স্কিনার সানন্দে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পেরংএর পূর্ব্বসেনাদল হইতে দুই সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিয়া এক সেনাদল সংগঠিত করিলেন। লর্ড লেক ইহাদিগকে অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলে একবাক্যে "সিকন্দর সাহেবকে" অধ্যক্ষ পদে বৃত করিতে বলে। এই সেনাদল এখনও Skinner's Horse নামে পরিচিত। ইহারা পীতাভবর্ণ উর্দ্দী পরিত বলিয়া এখনও Yellow Boys বলিয়া বর্ণিত।

পিণ্ডারী আমীর খাঁ ও হোলকার এই অভিযানে পরাভূত হইলেন। হোলকার যোধপুরে আশ্রয় লইলেন ও পরবৎসর পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজ্যগঠনে নিযুক্ত পঞ্জাবকেশরী রণজিতের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন-চেষ্টায় পঞ্চনদাভিমুখে চলিলেন। তিনি লাহোরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই লেক তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য করিলেন।

ইহার পর দশ বৎসর স্কিনার যোদ্ধৃবৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষকার্য্যে মনোযোগ দিলেন। যে হারিয়ানায় তিনি জর্জ্জ টমাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্কিনার সেই হরিয়ানায় থাকিয়া সে অঞ্চল সুশাসিত করিলেন ও হান্‌সি অঞ্চলে ৬৭টি বিস্তৃত সম্পত্তি পুরস্কার পাইলেন। বুলন্দসহর জিলায় বিলাসপুরেও তাঁহার সম্পত্তি ছিল। এখনও তথায় তাঁহারা উত্তরাধিকারীদিগের উদ্যান ও উদ্যানগৃহ আছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্কিনার পিণ্ডারীদমনে স্বীয় সেনাদলসহ লর্ড ময়রাকে সাহায্য করিয়া গভর্ণর জেনারল, প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পুনায় আরববিদ্রোহদমনে সাহায্য করিয়াও তিনি ঐরূপ ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন। ইহার পর তিনি আর একবার যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন।

এই সময় স্কিনারের সৈন্যসংখ্যা তিন সহস্র। যুদ্ধসম্ভবনা নাই দেখিয়া তিনি সহস্র সৈনিককে বিদায় দিলেন। সহস্র সৈনিক তাঁহার ভ্রাতা রবার্টের অধীনে নিমচে রক্ষিত হইল। অবশিষ্ট সৈনিকগণ তাঁহার অধীনে হান্‌সিতে রহিল। জেনারল ম্যালকমের সহিত তাঁহার বহুদিনের সৌহার্দ্দ ছিল; এবং প্রধানতঃ এই বন্ধুর চেষ্টায় স্কিনার হান্‌সির সম্পত্তি চিরস্থায়ী জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে ইহা তাঁহার সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাধ্যক্ষ দুবোয়াঁ ও বেগম সমরুও সেনাব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর পাইয়াছিলেন। বেগমের মৃত্যুর পর তাহা বাজেয়াপ্ত করা হয়।* বুলন্দসহরের সম্পত্তি তাঁহার নিজস্বই ছিল।

এককালে কলিকাতায় তিনি ছাপাখানার কায করিতে যাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৮২২খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তিনি বিশেষ সমাদৃত হয়েন। এই সময় রাজনৈতিক গগণে আবার ঘনঘটা দেখা দিল। তখন গভর্ণর জেনারল লর্ড অ্যামহার্ষ্ট ব্রহ্ম অভিযানের উদ্যোগ করিতেছেন—রাজপুতানায় ও মহারাষ্ট্রদেশে অশান্তির সূচনা সপ্রকাশ। অথচ ইংরাজপক্ষে বিচক্ষণ সেনানায়কের ও বিশ্বস্ত ভারতীয় সেনাদলের একান্ত অভাব। স্কিনার পুনরায় সেনাদল সংগঠিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের দুর্গ অধিকারে সেনাদলসহ স্কিনার লর্ড কম্বারমিয়ারকে বিশেষ সাহায্য করেন। ইহাই তাঁহার শেষ যুদ্ধ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি

* 'সমরু বেগম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—'আর্য্যাবর্ত্ত'—আষাঢ়, ১৩১৭।

হান্‌সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন দেন। এই সময় তিনি ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া ও কম্প্যানিয়ান অব দি অর্ডার অব বাথ উপাধি লাভ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হয়েন। বহুদিন সসম্মানে হান্‌সিতে বাস করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তিনি তনুত্যাগ করেন।

পারিবারিক আচারব্যবহারে স্কিনার মুসলমানের মত ছিলেন। তাঁহার পত্নীসংখ্যা অন্ততঃ চতুর্দ্দশ ছিল। শেষ বয়সে—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার পর হইতে নিষ্ঠাবান খৃষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও সদাচারের অনুষ্ঠানে অনন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েন। শেষ বয়সে তিনি ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেন এবং ইংরাজী ভালরূপ বলিতে পারিতেন। কিন্তু দীর্ঘ রচনায় তিনি পার্শিই ব্যবহার করিতেন। বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী ডাইস সম্বার য়ুরোপগমনোদ্যত হইলে তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য পার্শিতে এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। * তাঁহার আত্মজীবনীও পার্শিতে রচিত—ফ্রেজার কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংলণ্ডে শিক্ষিত হইয়া প্রধানতঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় সেনাদলে লেফটেনাণ্টের পদ পাইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। তিনি লর্ড লেক, সার জন ম্যালকম, লর্ড মেটকাফ, লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রা, লর্ড কম্বারমিয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিতেন।

উনিয়ারার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তদনুসারে তিনি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিল্লীতে সেণ্ট জেমস্ চার্চ্চ নামক গির্জ্জা নির্ম্মিত করান। তিনি বিশেষ বিনয়ী ও শিষ্ট ছিলেন। গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও চরিতকার ফ্রেজারের ভ্রাতার নিকট গির্জ্জার দ্বারদেশে সমাহিত হইবার বাসনা ব্যক্ত করেন—তাহা হইলে উপাসকবৃন্দ তাঁহার পাপ দেহের উপর দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোজন-পাত্রের নিকট তাঁহার প্রথমজীবনের দারিদ্র্যস্মারক কাষ্ঠের চামচ রক্ষিত হইত।

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—ভাদ্র, ১৩১৮।

প্রথমে তাঁহার শব হাঁসিতে সমাহিত করা হয়। কিন্তু সমাহিত হইবার সময়ে তাঁহার ইচ্ছানুসারে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ শব মহাসমারোহে তাঁহার সেনাদলবেষ্টিত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে নীত ও সসম্মানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জার বারান্দায় সমাহিত হয়।

জেমসের কনিষ্ঠ রবার্ট ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সিন্ধিয়ার সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রাতার অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তরুণবয়স্ক ভ্রাতার সুবুদ্ধিতে সন্দিহান হইয়া জেমস স্বীয় সেনাদলকে সমবেত করিয়া বলেন,—"এই আমার ভ্রাতা। তোমরা সকলে ইহার রক্ষক হইবে।" চম্বল নদীর নিকট যুদ্ধে রবার্ট আহত হইয়াছিলেন। উনিয়ারার যুদ্ধের পর রবার্ট পুনরায় ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়া লেফটেনান্ট পদে উন্নীত হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দুই ভ্রাতাই অর্জ্জগড়ের টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। দুই ভ্রাতা দুই পার্শ্বে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধান্তে পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া হতাহতপূর্ণ রণক্ষেত্রে ভ্রাতার শবান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। অন্ধকারে বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে স্ব স্ব সেনাদলের সংবাদের জন্য উভয়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। দুইজন দুই পথে শিবিরে প্রবেশ করেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ অধ্যক্ষগণ সিন্ধিয়ার সেনাদল হইতে পদচ্যুত হইলে তিনি প্রসিদ্ধ বেগম সমরুর সেনাদলে প্রবেশ করেন। বেগম যখন লর্ড লেকের নিকট ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন তখন রবার্টই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর রবার্ট পুনরায় জ্যেষ্ঠের অধীনে সেনাদলে লেফটেনান্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বতন্ত্র সেনাদলে ভ্রাতার উন্নতির সমধিক সম্ভাবনা বুঝিয়া ভ্রাতৃবৎসল জেমস্ স্বীয় সেনাদল বিচ্ছিন্ন করিয়া ভ্রাতার অধীনে এক নূতন সেনাদল সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। গবর্ণর জেনারল এই প্রস্তাবের অনুমোদন না করায় রবার্ট ভ্রাতার সেনাদলেই স্থানীয় মেজর পদে উন্নীত হয়েন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আলিগড় জিলায় একটি বৃহৎ জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন উহা ভোগ করিতে পারেন নাই—১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩২১।

মধুপুর-জঙ্গল ও ব্রহ্মপুত্র নদ।

বাঙ্গালা দেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদ ডিব্রুগড় হইতে হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমে আসিয়া ধুবড়ির নিকট হইতে দক্ষিণে আসিয়াছে। ফুলছড়ির নিকট হইতে এই নদ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—প্রধান শাখা যমুনা বেশ পরিপুষ্ট ও বরাবর দক্ষিণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিশিয়াছে; অপর শাখা ব্রহ্মপুত্র অনেকটা পূর্ব্বে ঘুরিয়া ঢাকা জিলার উত্তরে মধুপুর-জঙ্গল নামে যে উচ্চ বনভূমি আছে তাহার পূর্ব্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া মেঘনার সহিত মিশিয়াছে। এই শেষোক্ত শাখা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমির আকার ধারণ করে। এই জন্য অনেক আধুনিক স্কুলপাঠ্য মানচিত্রে (যথা, The Royal Indian World Atlas) যমুনা নদীই ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক, যে স্থানে একটি নদীর দুই শাখা দেখা যায়, সে স্থানে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিপুষ্ট, তাহাকে নদীটির নামে অভিহিত করা হয়, ও অপরটির নূতন নামকরণ হয়। এই স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল কেন, দেখা যাউক।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এরূপ ছিল না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রেনেল (Major Rennell) যখন ঢাকা জিলার পরিমাপ জরিপ করেন, তখন যমুনা নদী ক্ষুদ্র প্রশাখা মাত্র ছিল ও ব্রহ্মপুত্র নদের অপর শাখাই সবিশেষ পরিপুষ্ট ছিল। সে সময়ে এই শাখা মধুপুর জঙ্গলের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়া, শ্রীহট্টের নিকট যে কতকগুলি ঝিল বা জলাভূমি আছে সেগুলি পলিতে পূর্ণ করিত ও মেঘনা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িত।

ব্রহ্মপুত্রের এই গতিপরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে যে দুইটি মত প্রচলিত আছে তাহাই আমি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

পৃথিবীর অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ভূমি বহু বৎসর ধরিয়া অল্পে অল্পে উত্থিত হইতেছে। ইটালীতে এমন দুই একটি সহর আছে যাহা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রোমসাম্রাজ্যের সময়ে বন্দর ছিল, কিন্তু এখন সমুদ্রপ্রান্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র নরওয়ে ও সুইডেন সমুদ্রগর্ভ হইতে এখনও উঠিতেছে।

ফারগুসন্ (Fergusson) বলেন যে, মধুপুর জঙ্গল পূর্ব্বে এত উচ্চ

ছিল না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রমশঃ উত্থিত হওয়াতে ব্রহ্মপুত্র নদ এই জঙ্গলের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। *

পূর্ব্বে এই মতই পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল। অনেক পুস্তকে, বিশেষতঃ স্যুস্ নামক অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত-লিখিত "পৃথিবীর আনন" নামক বিখ্যাত পুস্তকেও এই মত উল্লিখিত আছে।†

দুই বৎসর হইল, মিষ্টার লাটুশ্ এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ‡ তাহাতে তিনি বলেন যে, ফারগুসনের মত অনুসারে যদি মধুপুর জঙ্গল সত্য সত্যই উত্থিত হইত তবে ব্রহ্মপুত্র নদ আরও পূর্ব্বে সরিয়া যাইতে পারিত; উহা একেবারে পশ্চিমে চলিয়া আসিল কেন? বিশেষতঃ নিকটস্থ আর কোনও স্থান উত্তোলিত না হইয়া কেবলমাত্র মধুপুর জঙ্গল উত্তোলিত হইবে, ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক। তিনি এইরূপে ফারগুসনের ভ্রমনির্দ্দেশ করিয়া মধুপুর জঙ্গলের উচ্চতা ও ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপরিবর্ত্তনের কারণ অভিনব প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ববিদ্মাত্রেই জানেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে, পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাবের প্রায় সমসাময়িক কালে, কোনও অজ্ঞাত কারণে, পৃথিবীর বহিরাবরণ স্বরূপ যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহার তাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। সেইজন্য যে তুষারনদ সকল (Glacier) এখন অতি উচ্চ পর্ব্বতে বা মেরুদ্বয়ের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল এই সময়ে অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে, উত্তরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ন্যায় তুষারনদসমূহে আবৃত ছিল। হিমালয়েও তুষারনদ সকল অনেক নিম্ন পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। এইজন্য, ভূতত্ত্বে এই সময়ের নাম হিমযুগ বা Glacial Epoch।

* Fergusson—Recent Changes in the Delta of the Ganges—Quart. Journal—Geol. Soc. Vol XIX. (1863).

2. Hiouen Thsang's Journey from Patna to Bullair—Journal Royal Asiatic Soc. New Series VI (1873) &c. &c.

† Suess 'Das Antlitz der Erde.'

‡ Lecture on 'the Ice Age in India' by T. D. La Touche, Feb. 10, 1910.

পর্য্যবেক্ষণশালী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন যে, বৃষ্টির জলে পর্ব্বতের প্রস্তর ক্ষয় হইয়া নদীসমূহে পলির সৃষ্টি হয়। নদীর বেগ যতই অধিক হয়, তাহার পলিবহন করিবার শক্তিও ততই অধিক হয়। অতএব পার্ব্বত্য নদী অতিশয় বেগবতী হওয়াতে পর্ব্বতের পাদদেশে যে পরিমাণ পলি বহিয়া লইয়া আইসে, অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে আসিয়া আর তত পলি সরাইতে পারে না। সেইজন্য পর্ব্বতের পাদদেশে সর্ব্বত্রই অনেক পলি জমিতে থাকে।

আর এক কথা—জল প্রস্তর ক্ষয় করিয়া পলি সংগ্রহ করিয়া আনে, কিন্তু পর্ব্বতের গাত্র যদি বৃক্ষলতাসঙ্কুল হয় তবে, জলের প্রস্তর ক্ষয় করিবার শক্তি ও পলিবহন করিয়া আনিবার ক্ষমতা উভয়ই কমিয়া যায়।

হিমালয়ে আপাততঃ প্রায় ১৮০০০ ফুট উচ্চে পর্য্যন্ত লতাগুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু তুষার নদের সময়ে নিশ্চয়ই এত উপরে বৃক্ষ বা লতা জন্মিতে পারিত না। অতএব সে সময়ে বৃষ্টির জল ও গলিত তুষারের জল এখন অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রস্তর ক্ষয় করিতে পারিত এবং অনেক অধিক পরিমাণ পলি হিমালয়ের পাদদেশে জমিত। লাটুশ্ বলেন, মধুপুর জঙ্গল সেই পুরাতন পলির অবশিষ্টাংশ। "তুষার নদের" সময়ের" অবসানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল এই পলি ধুইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইতে লাগিল। মধুপুর জঙ্গলের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ইহাদেরই অন্যতম ছিল। তৎকালে ব্রহ্মপুত্র স্বল্পায়তন ক্ষুদ্র নদ মাত্র ছিল। পাঠকবর্গ বাঙ্গালাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদের কুলছড়ির নিকট হইতে বরাবর দক্ষিণে আসিয়া সমুদ্রে পড়াই স্বাভাবিক। পূর্ব্বকালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটার কারণ এই যে, সেই ক্ষুদ্র-স্রোত স্রোতস্বতী পদ্মার রাশীকৃত পলির চাপের বাধা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে আসিতে পারিত না।

ব্রহ্মপুত্র নদের আয়তন এক্ষণে কিরূপে বিস্তৃতি লাভ করিল তাহা বুঝাইতে হইলে একটু বিশদ বর্ণনা আবশ্যক।

মনে করুন, দুইটি নদী একটি উচ্চ ভূমিভাগের দুই দিকে প্রায় সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। একটি নদী অপরটি হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। এখন, যদি উভয় নদীর

* Imperial Gazetteer of India Vol 1. Art. Botany. Page 167.

শাখাদ্বারা মধ্যস্থ উচ্চভূমিভাগ ক্ষয় হইয়া একটি প্রণালীর দ্বারা উভয় নদীর সংযোগ হয়, তবে যে নদীটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সমস্ত জল অপর নদীটিতে চলিয়া আসিবে। ভূতত্ত্বে এই ঘটনার নাম প্রথমোক্ত নদীটির "মস্তকচ্ছেদন" বা Beheading।*

লাটুশ্ বলেন, তিব্বতের সান্‌পো নদী পুরাকালে পশ্চিম তিব্বতের একটি নদীর প্রশাখা ছিল। (এই শেষোক্ত নদীটি এখন তিব্বতের মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়াছে।) ডিহং নদী এই সান্‌পো নদীর "মস্তকচ্ছেদন" করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মপুত্রের আয়তন বেশ বড় হইয়া উঠে। তৎপরে তিস্তা নদীও পদ্মার কিয়দংশ পলি ধৌত করিয়া যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইল, তখন ব্রহ্মপুত্র পদ্মার পলিকে অগ্রাহ্য করিয়া মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিমপ্রান্তে নূতন পথ কাটিয়া লইয়া বরাবর দক্ষিণে আসিয়া সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। এই নূতন পথই কোন কোন মানচিত্রে যমুনা নদী নামে, কোন কোন বিলাতী মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কাশী।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা—উত্তর-বাহিনী ;
তীরে স্তরে স্তরে ঘাট, অসংখ্য দেউল,—
বিজড়িত কত স্মৃতি—কতই কাহিনী—
উদ্বেল ভক্তির স্রোত নাহি তা'র কূল।
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুস্থান—কাশী হৃদি তা'র—
স্পন্দিত ভারতভূমি তোমার স্পন্দনে।
কত রাজা, কত ধর্ম্ম বক্ষে তোমার
আঁকিতে আপন চিহ্ন অজস্র যতনে
করিয়াছে প্রাণপণ! আজি তা'রা সব
বিস্মৃতির অন্ধ গর্ভে লভেছে বিলয়;
তুমি স্থির—অচঞ্চল। নিস্পন্দ নীরব
ইতিহাস পদে তব মাগিছে আশ্রয়।
ভক্তের আশ্রয় তুমি— মুক্তির আগার,
বিরাজিত বিশ্বেশ্বর হৃদয়ে তোমার।

---

* Russell's 'River Development'.

অদৃষ্ট-চক্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদেশে।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। শেষে রাত্রি পোহাইল। বিনিদ্র ধরণীধর দেখিলেন, তিনি বঙ্গের শ্যাম প্রান্তর ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, জীবনে আর কখন বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ অঙ্কে ফিরিতে পারিবেন কি? এই বিদায় শেষ বিদায়! তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ট্রেণ বারাণসীর নিম্নে সেতুর নিকটবর্ত্তী হইল। বারাণসীর বর বপু নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জহ্নুকণ্যার পূত প্রবাহ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বারাণসীকে ঘিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কূলে ঘাটের পর ঘাট—মন্দিরের পর মন্দির—হর্ম্ম্যের পর হর্ম্ম্য। ঘাট স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীতে পূর্ণ। ঘাটের জনতায় ভারতের সকল স্থানের অধিবাসীর সমাবেশ। বারাণসীর পুণ্য ভূমিতে তনু ত্যাগ করিয়া মণি-কর্ণিকার মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হইবার বাসনায় নানা দিগ্দেশ হইতে হিন্দুরা আসিয়া বারাণসীতে বাস করেন। মোক্ষকামীর এই মহাস্বর্গ ভারতের সর্ব্বস্থানের হিন্দুদিগের মহা সম্মিলনস্থান। বারাণসী হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র—হিন্দুধর্ম্মের হৃদপিণ্ড এই বারাণসীতে অবস্থিত। ইতিহাস ইহার আরম্ভসন্ধানে বিফলমনোরথ, কল্পনা ইহার প্রারম্ভকালের ধারণা করিতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কত নূতন নগরের উত্থানপতন হইয়াছে, বারাণসীর গৌরবশ্রী অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ, সে গৌরব রাজৈশ্বর্য্যের সহচর নহে—পরন্ত ভক্তের ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাহা রাজার দান নহে, পরন্ত রাজরাজেশ্বরের বিভূতি। নির্ব্বাণকামী শাক্য রাজকুমার হইতে ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার চৈতন্য হইতে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক দয়ানন্দ পর্য্যন্ত যিনি যখন

হিন্দুধর্ম্মের নূতন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তিনিই তখন স্বীয় মতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বারাণসীতে গমন করিয়াছেন। যে মত বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই হিন্দু সমাজে সে মত স্থায়ী হয় নাই। যিনি বারাণসীতে স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন হিন্দু ধর্ম্মের বিরাট ইতিহাসে তাঁহারই নাম লিখিত হইয়াছে। আর কতজন বারাণসীতে স্ব স্ব মতের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার বিফল চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাহাদের চেষ্টা গঙ্গাবক্ষোত্থিত এক একটি তরঙ্গের মত মিলাইয়া গিয়াছে; তাহাদের নাম বিস্মৃতির অতলতলে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইতিহাস অসাফল্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাহে না। বারাণসী-হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র, তাই বৌদ্ধগণ বারাণসীর উপকণ্ঠে, ধর্ম্মপ্রচারকেন্দ্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।—তাই বৈরীনির্য্যাতিত বারাণসীর রক্তসিক্ত বক্ষে ইস্‌লামের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি আরঙ্গজেব অশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কালের ভেষজে সে ক্ষতচিহ্ন আজও মিলায় নাই। বারাণসী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ট্রেণ হইতে বারাণসীর জয়ধ্বনিতে তীর্থযাত্রিগণের অসীম উল্লাস আত্মপ্রকাশ করিল। যাত্রিদল যে আশায় দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়াছে, সে আশা ফলবতী হইয়াছে। কত দরিদ্র কষ্টলব্ধ সামান্য সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল—আশা, বারাণসী দর্শন করিবে; কত বিধবা বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরদর্শনে পরকালের উন্নতির আশায় ইহকালের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নষ্ট করিয়াছে; কত বৃদ্ধ বারাণসী-দর্শনের উৎসাহে শারীরিক দৌর্ব্বল্য জয় করিয়াছে; কত খঞ্জ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ পরের দয়ায় ও বিশ্বেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ তাহারা সফলসাধন। আজ তাহাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। বারাণসীর বর বপু তাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত। তাই তাহারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে। ভারতের কাশীকথা ধরণীধরের মনে পড়িল।

"পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি,
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাম কেবল কৈবল্য ধাম,
শিবের ত্রিশূলপরি স্থিত॥

* * * *

বাহে জীব ত্যজি জীব সেইক্ষণে হয় শিব
পুনঃ নহে জঠর-যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা॥”

ধরণীধর পূর্ব্বে একাধিকবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ যেন বারাণসীর কমকান্তি তাঁহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। বারাণসী ত্যাগীর স্বর্গ—মায়ামুগ্ধ মায়াবদ্ধ মানবের মনে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। পূর্ব্বে যখন তিনি বারাণসীতে আসিয়াছেন তখন তিনি সংসারী—সংসারের সুখ তাঁহার অভীপ্সিত। আজ তাঁহার সে স্বপ্ন শেষ হইয়াছে,—আজ অদৃষ্ট নির্ম্মম হস্তে তাঁহার সে আশার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে—তাঁহাতে মুক্তি দিয়াছে। আজ তিনি মায়া হইতে মুক্তি পাইয়া মহামুক্তির সন্ধানে সচেষ্ট; তাই আজ বারাণসী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অনুভূতপূর্ব্ব ভক্তির রসে স্নিগ্ধ ও সরস হইল।

ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে স্থির হইল। পূর্ণ যান শূন্য করিয়া শত শত যাত্রী কাশীর পুণ্য ভূমিতে অবতরণ করিল। আবার বারাণসীর জয়-ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। ধরণীধর সেই জনসঙ্ঘে মিশিয়া চলিলেন।

কাশীতে কয়দিন থাকিয়াই ধরণীধর বুঝিলেন, তিনি মুক্তির সন্ধানে আসিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি হৃদয় হইতে সংসারের মায়া দূর করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারা হৃদয় সময় সময় দূরস্থিত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়—তাঁহার কল্পনা সেই দূর পল্লীভবনে ফিরিয়া যায়। ফলে হৃদয় কেবল হতাশার বেদনায় পীড়িত হয়।

তিনি ইহার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, নদীর প্রবাহমুখে বাধা সংস্থাপিত করিয়া তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য; কিন্তু অন্য পথ প্রস্তুত করিয়া প্রবাহকে সেই পথে প্রবাহিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি সেই চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কাশীতে শাস্ত্রানুশীলনের সুবিধাও যথেষ্ট। তত্ত্বজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে কাশীর মত উপযোগী স্থান আর নাই। ধরণীধর বিষয়বাসনাবদ্ধ চিত্তকে বাসনাবন্ধনমুক্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই জ্ঞানের তৃষ্ণা একবার হৃদয়ে দেখা দিলে হৃদয়ে আর কোন আশার—আর কোন তৃষ্ণার স্থান থাকে না—জ্ঞানান্বেষী ইহারই মোহে মুগ্ধ হইয়া আর সব ভুলিয়া যায়। সংসারে সম্পদ, স্নেহ, প্রেম সব ত্যাগ করিয়া এই জ্ঞানতৃষ্ণাতুর ইহারই জন্য ব্যাকুল হয়। ধরণীধরেরও তাহাই হইল। তিনি অন্য চিন্তা ভুলিবার চেষ্টায় যাহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল—তিনি ক্রমে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের সম্বল পরাবিদ্যার চর্চ্চায় তন্ময় হইয়া আর সব ভুলিলেন। তাঁহার মায়াবন্ধন যত শিথিল হইতে লাগিল—শানগরের সেই পল্লীভবন তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্র হইতে তত দূরে পরিধিরেখায় অস্পষ্টদৃষ্ট বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল।

হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে ধরণীধর জয়ী হইলেন। কিন্তু সংগ্রাম সর্ব্বদা—সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য। যখন রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিয়া উঠে, তখন লোক ফলাফলের প্রতীক্ষা করে ও জয়ীর সাফল্যে তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু তাহারা যে গৌরবে মুগ্ধ হয়—সে জয়গৌরব কত দুর্ম্মূল্য তাহা জয়ী ব্যতীত আর কেহ জানে না; সে জয় হয় ত জয়ীর সর্ব্বস্ব দিয়া ক্রীত—তাহার সর্ব্বনাশে হয় ত সে জয়ের পরিণতি। হৃদয়ের সহিত সংগ্রামও সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য—কুত্রাপি সুলভ নহে। ধরণীধর আপনার স্বাস্থ্য—আয়ু ব্যয় করিয়া জয় লাভ করিলেন। তাঁহার বলসমুন্নত দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—স্বাস্থ্যসম্পদহেতু জরা এত দিন যে দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, এখন সে দেহে তাহার ক্ষয়চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসার।

যে বারি উর্ব্বর ক্ষেত্রে বর্ষিত হইলে শস্যসম্পদ উৎপাদিত করে, তাহাই পঙ্কসার পল্বলে পড়িলে মৃত্যুবাষ্পমাত্র উৎপন্ন করে। যে কথায় শিষ্টের ত্রুটি সংশোধিত হয়—তাহাতে অনেক সময় দুষ্টের দোষ বর্দ্ধিত হয়। বৈবাহিকের নিকট ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঞ্ছাচরণের ব্যবহারে যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বাঞ্ছাচরণ লজ্জিত হইল না,

এবং তাহাতে তাহার স্বার্থপর ব্যবহারের স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়া পড়িল। এতদিন যে সঙ্কোচ—যে লোকনিন্দাভয়—যে পিতৃরোষাশঙ্কা তাহার স্বার্থপর ব্যবহার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল এখন তাহা দূর হইল—তাহার ব্যবহারও সঙ্কোচসীমা অবাধে অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল।

তারাচরণ কখন কলিকাতায়—কখন গৃহে থাকিত। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, তাহাকে বিদ্যালয়ে দেওয়া আবশ্যক। তিনি তাহাকে শিক্ষালাভার্থ গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। বামাচরণ তাহাতে আপত্তি করিল—গ্রামের বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক নাই; সে পুত্রকে কলিকাতায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইতে চাহিল; উদ্দেশু, তাহা হইলে সে সপরিবারে কলিকাতায় স্থায়ী হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন; বলিলেন, "ভাল, তাহাই হউক।" কিন্তু এ ব্যবস্থায় পরিবারের আর সকলে কিছু বিস্মিত হইল। পার্ব্বতীচরণের পত্নী বড়বধূকে বলিলেন, "দিদি, এ সময় তারাকে লইয়া যাওয়া কি ভাল হইবে? ঠাকুর এই এত বড় শোক পাইয়াছেন, তারা কাছে থাকিলে তিনি ভাল থাকেন।" বড়বধূ বলিলেন, 'আখেরের' ভাবনা ভাবিতে হয়। তখন যে আদর গোবর হইবে? তখন ছেলেই আমাদের দোষ দিবে। এখন কি আর মূর্খ হইয়া কেবল দক্ষিণার কড়িতে সংসার চালান যায়? আর কি দুই দশ হাজার আছে যে, বসিয়া খাইবে?" কথাটাতে উপার্জ্জনবিরত পার্ব্বতীচরণের প্রতি যে একটু শ্লেষ ছিল না—এমন বোধ হয় না। মধ্যমা বুঝিলেন, তর্ক করা বৃথা। এসব পূর্ব্বেই 'পড়াপিটা' হইয়া আছে। পার্ব্বতীচরণ স্বয়ং পিতাকে বলিল, "তারার এখন কলিকাতায় যাইয়া কায নাই। আপনার বড় কষ্ট হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্লান হাসি হাসিলেন, "কষ্ট! জীবনে অনেক পাইয়াছি—অদৃষ্টে আরও কত কষ্ট আছে, জানি না। আমার দিন কাটিয়াছে। এখন তোমাদের সুখী দেখিয়া মরিতে পারিলে তাহাই পরম ভাগ্য মনে করিব। তোমাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। এখন আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে।"

বামাচরণ আসিয়া পত্নীপুত্রকন্যা লইয়া গেল।

বামাচরণ পরীক্ষা দিল না—সে বুঝিয়াছিল, পরীক্ষায় তাহার সাফল্য-

সম্ভাবনা নাই। তাহার পর সে পশ্চিমে একটি চাকরীর সংবাদ পাইয়া দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সে কথা জানাইল। সে যে তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া বিত্তালয় ত্যাগ করিয়াছে ও বিদেশে চাকরী গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—ইহা জানিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যথিত হইলেন। শেষে যখন তিনি জানিলেন, সে পত্নীকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে তখন তিনি তাহাতেও সম্মতি দিলেন; কেবল বলিলেন, "বধূমাতা কখনও স্বতন্ত্র সংসার করেন নাই, যদি ভাল বিবেচনা কর তোমার পিসীমা'কে কিছু দিনের জন্ম সঙ্গে লইয়া যাও। তুমি সংসার পাতাইয়া বসিলে তিনি চলিয়া আসিতে পারিবেন।" কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার বিদেশে চাকরী গ্রহণে আগ্রহের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রূপসী পত্নীর রূপজ মোহমুগ্ধ যুবক গুরুজনবিরহিত গৃহে পত্নীকে একান্ত আপনার রূপে পাইবার প্রবল বাসনায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিতেছিল—তাই সে বিদেশে চাকরী লইয়াছিল। নহিলে—সে জানিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্যদিগের চেষ্টায় কলিকাতাতেই তাহার চাকরী জুটিতে পারিত। আর সেইজন্যই সে উন্মাদরোগগ্রস্তা জননীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহে নাই। সে তাহার চাকরী করিবার কথা তাহার ভগিনীপতিকে লিখিয়াছিল। তিনি তাহাকে পুনরায় পড়িতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। শৈলজা ভ্রাতাকে লিখিয়াছিল, "তুমি যাহাই কর জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ না লইয়া করিও না। তিনি যে তোমার বিদেশে চাকরী করার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এমন বোধ হয় না। তিনি তোমাকে দূরে রাখিতে চাহেন না। তাঁহার স্নেহে আমরা পিতার অভাব কখনও বুঝিতে পারি নাই। দেখিও, যেন তোমার কাযে তিনি কষ্ট না পায়েন।" রাধাচরণ সে সব কথা কাণে তুলে নাই। সে পিসীমা'কে লইয়া যাইবার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কায করিতে পারিল না বটে; কিন্তু স্থির করিল, কর্ম্মস্থানে যাইয়া সংসার পাতাইয়াই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

পিসীমা'র রাধাচরণের সঙ্গে যাইবার ব্যবস্থায় বামাচরণ বিরক্ত হইল। কারণ, তিনি সংসারে থাকিলে সংসারের সব বখাটই তাঁহার।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল যেন, দারুণ ভূমিকম্পে তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর তাহারই মধ্যে তিনি বিপন্ন—ব্যথিত—শঙ্কাকুল

হৃদয়ে আপনার প্রিয়জনদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কি? এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তির শেষ সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল।

তিনি অকালজলদোদয়ে ম্লান কমলের মত বিধবা দুহিতাকে লইয়া যে দিন গৃহে ফিরিয়াছিলেন—সেই দিন বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার শেষ জীবনে অভীপ্সিত শান্তি লাভ ঘটিবে না। তিনি যাহার আশায় আশান্বিত ছিলেন সেই শান্তিলাভ তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাহার পর সরোজার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুই দুহিতার জন্ত দুশ্চিন্তা দুই বিষধরের মত দংশনজালায় তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতেছিল। অদৃষ্টের এই অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত আঘাতে তিনি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। কেবল দুহিতৃদ্বয়ের প্রতি—পরিজনগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াই তিনি বক্ষে বল বাঁধিতেন—ভাবিতেন, —কর্ম্মেই যাহার অধিকার সে ফলাফল কেন চিন্তা করিবে? কর্ম্ম করাই তাহার নিয়তি; নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পথে তাহাকে যাইতেই হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন—হৃদয়ে বল বাঁধিয়া সান্ত্বনালাভের প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু তিনি যখনই বিরজার ও সরোজার মলিন মুখ দেখিতেন তখনই তাঁহার পিতৃহৃদয় বিষম বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিত—সেই চাঞ্চল্য তাঁহার বহু আয়াসলব্ধ ধৈর্য্য নষ্ট করিয়া দিত।

বিরজা অপত্যস্নেহস্বাদবঞ্চিতা হিন্দুবিধবার অবলম্বন ধর্ম্মকেই জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সে ব্রতাদির আচরণে শরীরকে ক্লিষ্ট ও চিত্তকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তজয় সহজসাধ্য নহে। গম্ভীরবুদ্ধি জ্ঞানবান পুরুষের পক্ষে যাহা কষ্টসাধ্য—কোমলপ্রবৃত্তিপরায়ণা জ্ঞানহীনা রমণীর পক্ষে তাহা কত দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই নরচরিত্রাভিজ্ঞ হিন্দু শাস্ত্রকারগণ রমণীর পক্ষে স্বামীকে দেবতা করিয়া দেবতারাধনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। রমণীর পক্ষে মনুর ব্যবস্থা—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

যে কেবল পতি-দেবতায় চিত্তার্পণ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরলাভের উপায় করা;

সীমাবদ্ধ হৃদয়ে সহসা অসীমের ধারণা করা দুঃসাধ্য, তাই সসীম হইতে অসীমকে লাভ করিবার ব্যবস্থা। বিরজা স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার পূর্ব্বেই—তাহার মুকুলিত যৌবনের প্রেমপিপাসাতুর হৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণার তৃপ্তির পূর্ব্বেই—স্বামীকে হারাইয়াছিল। তাই এখন সে দেবতার ধ্যান করিতে বসিলে স্বামীর দিব্যমূর্ত্তি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিত; তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিত। সে দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলে তাহার মনে হইত, সে যেন পতিপদে প্রণতা হইত। দেবপূজা শেষ করিয়া সে যখন পতির চিত্রকে প্রণাম করিত তখন তাহার মনে হইত, দেবতা তাহাকে সেই পরিচিত রূপে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সে পতি-দেবতায় ও ইষ্টদেবতায় মিশাইয়া ফেলিত। হায় রমণী হৃদয়!

আর সরোজা? তাহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় অতর্কিত বিষম আঘাতে ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার? প্রসন্নসলিলা প্রবাহিনীর কূলে দাঁড়াইয়া যে তৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নিম্নে তপ্ত বালুর ও উপরে দীপ্ত সূর্য্যের উত্তাপে পীড়িত হয় অথচ সলিল স্পর্শ করিতে পায় না, তাহার দুঃখের সীমা আছে কি? সে শ্বশুরের স্নেহে যে অনাবিল সুখ পাইয়াছিল সে সুখভোগ যে তাহার অদৃষ্টে নাই তাহা সে বুঝিয়াছে, বুঝিয়া কাঁদিয়াছে। যতীশচন্দ্রের পিতামহীর আদরে সে মাতৃহারা কন্যা আবার যেন জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে কতদিন সে আদর হইতে বঞ্চিতা! যে গৃহ তাহার সে গৃহে সে আর যাইতে পায় না।

সর্ব্বোপরি স্বামীর কথা। তিনি কোন্ দোষে তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করেন? আবার সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে চেষ্টা করিত, তাঁহার দোষ কি? তিনি ত তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন! তিনি কেন সব বুঝেন নাই? যাহাকে অন্য সকলে ঘৃণা করে সেও একেবারে গুণশূন্য নহে। তাহার সে গুণ অন্যে দেখিতে না পাইলেও তাহা তাহার প্রেমপরায়ণা পত্নীর দৃষ্টি অতিক্রম করে না। তাই যে অন্যের নিকট একান্ত ঘৃণ্য, সেও স্বীয় গৃহে পত্নীর প্রেমে স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। সরোজার নিকট যতীশচন্দ্রের অপরাধ ক্রমে একান্ত মার্জ্জনীয় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার প্রেম যাহার উদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছিল সে কি তাহার দোষ দেখিতে পায়? তাই সে স্বামীর দোষ দেখিত না; বরং সময় সময় আপনাকেই অপরাধী মনে করিত। কিন্তু সে কি করিবে?

এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? সে ভাবিত, ভাবিত আর কাঁদিত তাহার মনে সুখ ছিল না; অধরে হাসি ছিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে কেবল দুঃখ।

—•—

নীরব কবি।

কর্ম্ম-সিন্ধু-উপকণ্ঠে বিশ্বাস অচলে
পবিত্রতা-তপোবনে সাধনা-কুটীর,
ভকতির প্রবাহিণী পুষ্পিত কুন্তলে
যতনে মুছায় তা'র চরণ রুচির।
অঙ্গ বেয়ে ঝরে কিবা রস-নির্ঝরিণী,
মন্দ মন্দ শান্তি-বায়ু বহে নিরমল;
রোষ-সিংহ নিদ্রাতুর, কাম-কুরঙ্গিণী
অঙ্কে তা'র রহে সুখে নিদ্রায় বিহ্বল।
সে কুটীরে ধ্যান-মগ্ন স্তিমিত-অন্তর
বিরাজে নীরব কবি নিশ্চল নয়ন,
খসিয়া পড়েছে দূরে ছাড়ি' কলেবর
মলিন বসন সম দেহের চেতন।
চিত্তে বহে ভাব-স্রোত মহান্ উদার,—
অজ্ঞাতে করিছে পান বিশ্ব সুধা তার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

———

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

(পঞ্চম অধ্যায়।)

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমিতি সর্ব্বজনসমক্ষে রাজাজ্ঞা অবহেলা করিলেও ফরাসীরাজ শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলনে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। গার্ড ডি ফ্রান্স এবং অপরাপর সৈনিকদিগের বিদ্রোহিতা নিবন্ধন, তাঁহার সমিতির ইচ্ছানুসরণ ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে অকস্মাৎ দুর্ভাগ্যের নিম্নতম প্রদেশে নিপাতিত হইয়া সংসারে কোন ব্যক্তিই সুস্থির চিত্তে কালযাপন করিতে পারে না। যিনি এ যাবৎ কোটি কোটি মানবের অধীশ্বর রূপে বিরাজমান থাকিয়া বিশাল ফরাসীরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, অদ্য তিনি সহসা সর্ব্বশক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া অদৃষ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সেই জন্য তিনি উদ্যম, অধ্যবসায় ও স্বীয় পুরুষকারের সাহায্যে অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত তিনি মার্সাল ডি ব্রগ্লীকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ধনজনবিহীন নিঃসহায় রাজা অদ্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী। রাজসৈন্যগণ বিদ্রোহভাবাপন্ন; সুতরাং আপনার আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই। যাহারা চতুর্দ্দিক হইতে রাজসিংহাসনের প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে আপনি যদি শোণিত-প্রবাহে ধরাধাম কলঙ্কিত না করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" মার্সাল জনৈক রণবিশারদ কৃতকর্ম্মা বীরপুরুষ। য়ুরোপ-খণ্ডে এ যাবৎ তিনি শৌর্য্য বীর্য্য ও রণনিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে জাতীয় ভাবের অভ্যুদয়ে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ সমগ্র ফ্রান্স অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি তাঁহার চিত্তে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সেই জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই। সুতরাং তাঁহার রাজভক্তি অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তিনি রাজভক্ত ও রণবিশারদ হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থাবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সমগ্র ফরাসীজাতি যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজশক্তির সহিত শক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান তাহা

[illegible] সর্বে [illegible] যায়। [illegible] তিনি সভাগণকে [illegible] না করিয়াই [illegible] গ্রহণ করিলেন। তিনি যদি উপস্থিত [illegible] করিতে পারিতেন, তাহা হইলে [illegible] ব্যাপারে [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible] সৈনিকগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেও, [illegible] কৃষিপ্রবাহে [illegible] করিতে [illegible] মনে। তিনি মনে করিলেন যে, [illegible] প্রদর্শন পূর্ব্বক [illegible] দ্বারে ভীতি উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি স্বয়ং পাশব শক্তি প্রয়োগের বিরোধী হইলেও [illegible] সম্প্রদায়ের সভ্যগণের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তাঁহারা [illegible] [illegible] বলিলেন, "জাতীয় সমিতির সভ্যগণ এযাবৎ আমাদিগকে [illegible] মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিহিংসার সময় উপস্থিত। [illegible] অভ্যর্থনার নিমিত্ত আমাদের কৃপাণ শাণিত হইয়াছে।" কেহ [illegible] হৃদয়ের আবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া সভ্যগণকে [illegible] নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। সার্গান [illegible] সেনাপতিপদে [illegible] অগভ্যতাবশতঃ এই মত প্রকাশ করিলেন, "পঞ্চাশ [illegible] সাহায্যে আমি অবলীলাক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিব।" [illegible] এতাদৃশ অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণের হঠকারিতাই রাজশক্তির [illegible] প্রধান কারণ। [illegible] সেকার সময় নীতির পৃষ্ঠপোষক [illegible] কিন্তু [illegible] তাঁহার প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি [illegible] গূঢ় রহস্য বিন্দুবিসর্গ অবগত ছিলেন না। তাহার [illegible] কোন্ স্থান হইতে কি উদ্দেশ্যে সৈন্যগণ সমবেত হইতেছে, তিনি [illegible] প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে [illegible] নাই। কিন্তু এ দিকে সেনাপতিপ্রবর [illegible] [illegible] কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। [illegible] [illegible] দলে দলে বিদেশীয় সৈন্যগণ আগমন করত [illegible] [illegible] সমবেত হইতে লাগিল। [illegible] [illegible] [illegible]

মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিংশতি সহস্র সৈন্যের উপযোগী সেনানিবাস নির্ম্মিত হইতে লাগিল। প্যারিসের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে সৈন্য সংস্থাপিত হইল। ফরাসীরাজ ধনজনবিহীন নিঃসহায় হইলেও মার্সাল ব্রলীর কার্য্য-কুশলতা নিবন্ধন, তাঁহার যুদ্ধায়োজনে কোন ত্রুটি হইল না।

কিন্তু এ দিকে ফরাসীরাজের সমরসজ্জায় বিশেষতঃ বিদেশীয় সৈনিক গণের আগমনে প্যারিস নগরী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। নিরক্ষর ইতর সাধারণ উন্মত্ত হইয়া দলে দলে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনশনক্লিষ্ট সংখ্যাতীত ব্যক্তি প্রতি গ্রাম ও নগর হইতে সমাগত হইয়া রাজধানীর উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণের সহিত সম্মিলিত হইল। রাজসৈন্যদল বিদেশীয় সৈনিকগণের আগমন দর্শনে রাজদ্রোহী হইয়া রাজদ্রোহী জনসাধারণের সহিত যোগদান করিল। সাধারণতন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষকগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাজসিংহাসন উৎপাটনকল্পে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা পথে ঘাটে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকারে রাজা ও মন্ত্রিবর্গের যদৃচ্ছাচার প্রতিপাদন করিতে লাগিল। সুতরাং অচিরে প্যারিস নগরীতে হুলস্থুল কাণ্ড আরম্ভ হইল।

জাতীয় সমিতির সভ্যগণের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদারনীতি-পরায়ণ নেকার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ফরাসীরাজ কুমন্ত্রণাদাতাদিগের যুক্তির অনুসরণে ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মন্ত্রিবরের সর্ব্বশক্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং দলে দলে বিদেশীয় সৈন্য আসিয়া জাতীয় স্বাধীনতায় হস্তার্পণের নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ করিতেছে, তখন তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন না। তাঁহারা বাগ্মীকুলতিলক মহামতি মিরাবোর প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মর্ম্মে রাজ-সকাশে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন :—

"চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যসম্মিলন, চতুর্দ্দিকে শিবিরনির্ম্মাণ এবং রাজধানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—ফরাসীজাতি কি রাজার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে? নতুবা এ রণসজ্জার কারণ কি? রাজার শত্রু কোথায়? কাহাকে দমন করিতে হইবে? বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারী কাহারা? প্রজাবাৎসল্যবশতঃ আপনি ফরাসী জাতিকে যে মহার্ঘ্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা

আপনার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ। সুতরাং কুমন্ত্রণাদাতাদিগের যুক্তি অনুসরণ না করিলে আপনার কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। কুমন্ত্রণাদাতৃগণ আপনার চিত্তে কি প্রকার সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে জানি না। আপনি কি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন যে, তজ্জন্য প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হইবেন? আপনি কি প্রজাশোণিতে ফরাসী-ভূমি প্লাবিত করিয়াছেন? আপনি কি ফরাসীজাতির প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন? প্রজাগণ কি কখনও আপমাকে তাহাদের দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে? তাহারা কি আপনার শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে? তবে এ বৃথা সমরসজ্জার কারণ কি?

"কিন্তু এস্থলে একটি কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ফরাসীদেশে প্রেমমার্গ অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোন নীতি অবলম্বনে রাজ্যশাসন সম্ভবপর নহে। আপনি স্বয়ং যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ফরাসীজাতি আপনাকে তাহা ত্যাগ করিয়া পন্থান্তরে গমন করিতে কোন ক্রমে দিবে না। আমরা সৈন্যসমাগমে সমূহ বিপদ দৃষ্টি করিতেছি। রাজা ফরাসীজাতির স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রদেশবাসিগণ একবার ধৈর্য্যচ্যুত হইলে তাহাদিগকে নিরস্ত করা সহজ ব্যাপার হইবে না। দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান হেতু তাহারা রাজধানীর প্রত্যেক ঘটনা বৃহদাকারে দৃষ্টি করিবে, সুতরাং বিপদের পরিসীমা থাকিবে না। প্যারিসবাসিগণও সৈন্য-সমাগম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবে না। কারণ, তাহারা দুর্ভিক্ষসমাগমে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহাতে যদি সৈন্যদল আসিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাজধানীতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে খাদ্যসামগ্রী এককালে দুর্ম্ম্ল্য হইবে, সুতরাং তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। আবার ভাবিয়া দেখুন, সৈন্যগণের আগমনে সর্ব্বসাধারণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শান্তিরক্ষার নিমিত্ত কোন স্থলে বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে, ঘোরতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের সন্নিকট সৈন্যগণের অবস্থিতি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, ফরাসী সৈন্যগণ ফরাসী জাতি হইতে বিভিন্ন নহে। আবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে

রাজধানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিলে আমরাও স্বাধীন ভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইব না। সুতরাং আমরা সৈন্য-সম্মিলনে অশেষ প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতেছি। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কারণ হইতে জগতে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র কারণ হইতে মহা প্রলয়ের উৎপত্তি হইয়া রাজা প্রজা উভয়ের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা ফরাসী জাতিকে অবহেলার সামগ্রী মনে করেন, আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ— আপনি সৈন্যগণকে অচিরে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। তাহারা রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করুক। আর বিদেশীয় সৈন্যগণকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করুন। দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রাজভক্ত ফরাসী যে রাজার প্রজা তাঁহার বিদেশীর সাহায্যের প্রয়োজন কি?"

ফরাসীরাজ এই প্রাজ্ঞ আবেদনের উত্তরে বলিলেন :—

"সংপ্রতি প্যারিস নগরে যে সমস্ত কুৎসিত নাট্যের অভিনয় হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই জন্য রাজধানী ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে শান্তি-সংরক্ষণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, শান্তি-সংরক্ষণই রাজার প্রধান কার্য্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমি প্যারিস নগরের চতুর্দ্দিকে সৈন্যসংস্থাপন করিয়াছি। রাজধানীর শান্তিরক্ষণ ও সমিতির সভ্যগণের স্বাধীনতা রক্ষা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। খলপ্রকৃতি ব্যক্তি ভিন্ন কেহই আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না। তবে যদি সৈন্য-সমাগম দৃষ্টি করিয়া সভ্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, আমি স্থানান্তরে সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

রাজপ্রদত্ত উত্তর সমিতিগৃহে আলোচিত হইল। জনৈক সভ্য বলিলেন, "রাজা বলিয়াছেন, রাজধানীর শান্তি রক্ষার নিমিত্ত সৈন্য সমবেত হইয়াছে। সমিতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য; কারণ, সম্রান্ত ব্যক্তির বাক্যই যথেষ্ট।"

মহামতি মিরাবো বলিলেন :—

"রাজা বলিয়াছেন যে, তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি নাই। এ কথা

আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু মন্ত্রীদিগের কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব? মন্ত্রী বারম্বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। দূরদর্শিতার অভাবপ্রযুক্ত রাজা পরবুদ্ধিচালিত হইয়া আমাদিগকে বারম্বার সঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন,—ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যদি চিরদাসত্ব পরিহারের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা একবার চক্ষুরুন্মীলন করুন। রাজা প্রকারান্তরে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সৈন্যগণকে স্থানান্তরে প্রেরণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমরা স্থানান্তরিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি নাই। সৈন্যগণ রাজধানীসন্নিধানে উপস্থিত থাকিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সমিতি স্থানান্তরিত হইলে সেই বিপদের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কবি।

সদা ভাবে ভোলা মন,
কিবা পর, কি আপন,
সে চাহে না কোন দিন, কারো পরিচয়।
নাহি জানে কোন ভেদ,
নাহি মানে কোন খেদ,
প্রেম-যমুনার ধারা হৃদে সদা বয়।
তরু লতিকার সনে
কথা তা'র নিরজনে,
পুষ্পগুচ্ছ বুকে ধরে সোহাগে—আদরে;
দলিতে দূর্ব্বার দল
আঁখি তা'র ছল ছল,
করুণার উৎস যেন উথলে অন্তরে।
চাঁদ দেখি' ভরে বুক,
মনে ভাবে চাঁদমুখ,
মেঘে এলোকেশ দেখে, চপলায় হাসি।

কুলু-কুলু নদী ধায়,
তা'রি সনে গীত গায়,
কত কথা বলে তারে, ফুটে ভাবরাশি।
তার যে প্রাণের বীণা,
বাজে সে বিরামহীনা,
শুনে কেহ, নাহি শুনে—মিশে সন্ধ্যাকাশে।
কোন্ সে আরাধ্যা লাগি',
সারা রাতি রহে জাগি',
যদি তা'র শুভ স্পর্শ একবার আশে।
হোক্ সে ধরার প্রাণী,
নাহি তা'র জানাজানি,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে স্তুতি-নিন্দা-যশ;
গর্ব্ব তা'র—দীনতায়,
ঘৃণা তা'র—হীনতায়,
বসুধা কুটুম্ব তা'র, সর্ব্বভূত বশ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।



স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

জন্ম—
১৫ই চৈত্র, ১২৪৪ সাল।
1st. April 1838.

মৃত্যু—
৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল
21st October, 1912.

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

গত ৫ই কার্ত্তিক পরিণত বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বকথা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ জীবন শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তিন পুরুষ বাঙ্গালী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে। আর তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালীর এই বিশেষত্ব ছিল যে, তাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক যখন বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিল তখন শিক্ষকরূপে কৃষ্ণ বাবুর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে—তখন তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি Phrases and Idioms "বঙ্গে যথা তথা।" তখন ছেলেকে হেয়ার স্কুলে কি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে সে কথা উঠিলে লোক বলিত, "যদি ছেলেকে ইংরাজী শিখাইতে চাহ, তবে হেয়ার স্কুলে দাও,--কেষ্ট বাবু আছেন।" বাস্তবিক কৃষ্ণ বাবুর শিক্ষাদানপদ্ধতি অতি বিস্ময়কর ছিল। তিনি খুঁটিনাটি লইয়াই হয় ত ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন—উচ্চারণের জন্য তিনি হয় ত ঘণ্টায় তিন চারি ছত্রের অধিক পড়াইতে পারিলেন না। শব্দ যাহাতে সুপ্রযুক্ত হয় সে জন্য তিনি সকল ছাত্রকে Webster's Dictionary হইতে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিতেন; এ বিষয়ে কোনরূপ ওজর আপত্তি শুনিতেন না, এমন কি একবার একজন ছাত্র আর্থিক অভাব প্রযুক্ত ঐ অভিধান কিনিতে অক্ষমতা জানাইলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলে, "এবিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না—Buy, beg or borrow—ঐ অভিধান সংগ্রহ কর।" এক দিন একটি ছাত্র প্রশ্নের উত্তরে একটি কথার যে অর্থ বলিয়াছিল তাহা সঙ্গত, কিন্তু সে প্রতিশব্দটি ওয়েবষ্টারে নাই। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "এ প্রতিশব্দ তুমি কোথায় পাইলে?" বালকটি বলিল, তাহার গৃহ-শিক্ষক বলিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "তোমার গৃহ-শিক্ষক আছেন! তুমি যদি আর কখনও অভিধান দেখিয়া স্বয়ং প্রতিশব্দ সংগ্রহ কর না দেখিতে পাই, তবে তোমাকে যে শাস্তি দিব তাহা কখনও ভুলিবে না।"

মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যখন হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিলাম তখন কৃষ্ণ বাবুকে দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল হইল। কারণ, "মাইনর"

(মিড্‌ল্ ইংলিস) পরীক্ষার তাঁহার Middle Class Reader ও ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম। দেখিলাম—গৌরবর্ণ প্রৌঢ় মূর্ত্তি—আননে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা সপ্রকাশ। এই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যহেতু ছাত্রদল তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিত; অলস বা বিলাসী ছাত্রদল হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলেই স্কুল ছাড়িয়া যাইত। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র কখনও ছাত্রদিগের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহার শাণিত বিদ্রূপই ছাত্রশাসনের পথে যথেষ্ট ছিল। একবার প্রশ্নোত্তরে একটি ছাত্র whether বানান করিয়াছিল wheather কৃষ্ণ বাবু ক্লাসে তাহাকে ঐ শব্দটি বানান করিতে বলিলেন। সে উত্তর করিল wheather; কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "e ও a বলিলে—i, o, u তিনটি বাদ দিলে কেন?" বেচারা আর যাহাই করুক আর কখন ও whether বানান ভুল করে নাই।

কৃষ্ণ বাবু যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। হেষ্টিংসের চক্রান্তে যে নন্দকুমারের ফাঁসী হয়—যাঁহার বিচারকে কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক Judicial Murder বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, কৃষ্ণচন্দ্র সেই নন্দকুমারের দৌহিত্রের পৌত্র। মহারাজা নন্দকুমারের এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্র রাজা গুরুদাস অপুত্রক থাকিয়া লোকলীলা সম্বরণ করেন; কন্যা আনন্দময়ীরও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। কন্যা সোনামণির সহিত জগৎচন্দ্রের ও কিণুমণির সহিত রাধাচরণের বিবাহ হয়। জগৎচন্দ্রের বংশধরগণ কুঞ্জঘাটার "রাজা" বলিয়া পরিচিত, কৃষ্ণচন্দ্র রাধাচরণের প্রপৌত্র।

নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার তখন রাধাচরণ মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠস্থিত সৈদাবাদ হইতে আসিয়া ভট্টপল্লীতে বাস করেন। তাঁহারই গৃহের মর্ম্মরাবৃত বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে মহারাজ নন্দকুমারের দরবার বসিত। রাধাচরণ নবাব মবারকউদ্দৌলার উকীল ছিলেন এবং সেইজন্য পুরুষানুক্রমে "বাবু" ও "রায় রাঞা" বলিয়া অভিহিত হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তখন "বাবু"—বর্ত্তমান সময়ের "বাবু" হইতে অনেক ভিন্ন প্রকারের সম্মান ছিল। ভট্টপল্লীতে তাঁহার জমীদারী "বাবুর আনি," তাঁহার বাজার "বাবুর বাজার," তাঁহার বাসপল্লী "বাবুর পাড়া" নামে এবং তমলুকে তাঁহার জমীদারী দোরো পরগণা "রায় রাঞা চক" নামে প্রসিদ্ধ।

রাধাচরণের পৌত্র তারকনাথ স্বধর্ম্মপরায়ণ ও অথিতিবৎসল লোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রবাহে দাঁড়াইয়া পূজা করিতেন। তিনি পুত্রদিগের শিক্ষা শেষ না হইলে তাঁহাদিগের বিবাহ দেন নাই; এবং বহু আত্মীয়স্বজনের আপত্তি সত্বেও পুত্র গোপালচন্দ্রকে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ডেপুটীগভর্ণর ম্যাডক ও লিট্লার, সার অ্যাসলি ইডেন, বোর্ড অব রেভিনিউর আর্থার গ্রোট প্রভৃতি য়ুরোপীয়ের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। সন ১২৮০ সালে ১৫ই ভাদ্র তারিখে হাওড়ায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র ও তৃতীয় সন্তান। সন ১২৪৪ সালে ১৫ই চৈত্র তারিখে মাতুলালয় খাসবাটী—হালিসহরে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের সাড়ে সাত মাস পরেই কৃষ্ণচন্দ্র মাতৃহীন হয়েন। প্রতিবেশিনী কায়স্থ মহিলা ব্রহ্মময়ী মাতৃহীন ব্রাহ্মণসন্তানকে লালন পালন করেন।

সাত বৎসর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র চুঁচুড়ায় হরচন্দ্র রায়ের ইংরাজী স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি যখন এই স্কুলের ছাত্র, সেই সময় এক দিন (১৮ই মে, ১৮৪৯) মিষ্টার লজ স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে ও রসিকলাল নিয়োগীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি বালক কৃষ্ণচন্দ্রের আবৃত্তিতে বিশেষ প্রীত হয়েন ও তাঁহাকে হুগলী কলেজে বিনা বেতনে পাঠের অধিকার দেন। এই কলেজে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মাসিক ৮৲ টাকা "জুনিয়ার" বৃত্তি লাভ করেন। হুগলী কলেজে তিনি মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী ও কার, থয়েটস, লজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শিক্ষকের ছাত্র ছিলেন। শ্রীনাথ বাবু ছাত্রদিগকে অভিধান ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন। ঈশান বাবুর গ্রের Elegy ও Eton College পড়াইতে ছয় মাস লাগিয়াছিল। মিষ্টার কার এক বৎসরে Vanity of Human Wishes শেষ করিয়াছিলেন। সব গুলিই ক্ষুদ্রায়তন কবিতা। অতএব দেখা যাইতেছে খুঁটিনাটি লইয়া সময় কাটাইয়া শিক্ষা স্থায়ী ফলপ্রদ করিবার অভ্যাস কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুদত্ত সম্পদ। তখন বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক ছিল—নীলমণি বসাকের 'নবনারী'। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন

এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্থাপিত হইলে তথায় আইসেন। কবি হেমচন্দ্র ও সুধী শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সতীর্থ। কলিকাতায় তখন "রেতে মশা, দিনে মাছি।" এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠ ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ শর্ষা স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হয়েন ও অল্পদিন পরেই বারাসতে আসিয়া সার অ্যাসলি ইডেনের স্কুল সংস্থাপিত করেন। ইহার পর তিনি পুলিশ দারোগা হয়েন, কিন্তু সে কার্য্য ভাল না লাগায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পুরী জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যায়েন। তখন পথের অবস্থা এরূপ ছিল যে, ভট্টপল্লী হইতে পুরী যাইতে তাঁহার দেড় মাস লাগিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুরে বদলী হয়েন। তখন সাঁইতিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক মাসে তিনি পুরী হইতে বহরমপুরে পৌছেন। বহরমপুরে তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা ও জিলার জজের অনুবাদকের কায করিতে হইত। অথচ এই দুই কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচিত হয় (১৮৬০)। বরিশাল জিলা স্কুলের হেড মাষ্টারের কায করিতে অস্বীকৃত হইয়া তিনি রামপুর বোয়ালিয়ার স্কুলে বদলী হয়েন। তখন মিষ্টার মারে স্কুলের পরিদর্শক। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্যনিপুণতায় বিশেষ প্রীত হয়েন। তাহার পর তাঁহাকে আরায় যাইতে হয়। তখন অভিধানপ্রণেতা ডাক্তার ফ্যালন তথায় ইন্‌স্‌পেক্টর। তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় কৃষ্ণচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করেন। কিন্তু ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসান্স মিষ্টার আটকিসন তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করাইয়া আবার বহরমপুরে বদলী করেন। ইহার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সাবরেজিষ্টার হইয়া বালেশ্বরে যাইতে হয়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বহু সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় কায বাকি পড়িয়া গিয়াছিল। সেই কায শেষ করিয়া দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় বহরমপুরে আইসেন। অসুস্থ হইয়া তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে আইসেন। তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু স্কুলের ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার শরীর বহুদিন হইতেই অসুস্থ ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার রক্তামাশায় হইত। গত মহাপঞ্চমীর দিন তাঁহার রক্তামাশয় দেখা দেয় এবং সেই রোগেই একাদশীর দিন তাঁহার জীবনান্ত হয়। তাঁহার সাধ্বী পত্নী পতির সাত বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন।

শিক্ষাদানেই কৃষ্ণ বাবুর কৃতিত্ব; শিক্ষালাভেই তাঁহার আনন্দ ছিল। শেষ ব্যাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃকাল ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। ইহার মধ্যে কেবল প্রত্যুষে ভ্রমণে এক ঘণ্টা ব্যয়িত হইত। আবার অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন চলিত। এ অধ্যয়ন কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য—জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে। তিনি যে পুস্তকই পাঠ করিতেন তাহা বিশেষ যত্নসহকারে করিতেন—পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ রেখায় সে অধ্যয়নচিহ্ন থাকিত। আবার যখন যাহা পড়িতেন তাহার আবশ্যক অংশ—সুপ্রযুক্ত শব্দাদির ব্যবহার-নিদর্শন খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। তিনি সমস্ত জীবন এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর ছয় দিন পূর্ব্বে লেখনী ত্যাগ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন—সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা। তাঁহার Phrases and Idiomsএর পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। উহার প্রকাশের পর ঐ প্রকারের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই উহার সমকক্ষ নহে। Middle Class Readerএর সংগ্রহে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা হইতে আদর্শচরিত্রকথা বাছিয়া এই সংগ্রহ, অথচ রচনাপ্রণালীতে বৈষম্য অত্যধিক নহে। এ সংগ্রহে যে নিপুণতার পরিচয় আছে তাহা বাঙ্গালীর কেন, বহু ইংরাজের কৃত সংগ্রহেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এতদ্ভিন্ন Higher Class Reader উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত' সরল ভাষায় লিখিত। যখন একখানি পাঠ্য পুস্তকে "পর্ব্বতকটকে লৌহকীলক প্রোত করিয়া আরোহণ করিলেন" পাঠ করিতাম, তখন কৃষ্ণবাবুর ভাষা এত ভাল লাগিত যে তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

তিনি Lord Curzon's Work in India পুস্তকে লর্ড কার্জ্জনের কৃত কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন কমিশনের সময় তিনি যে দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন সেই

দুইখানিতে অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্মদর্শনের প্রমাণ এত অধিক যে, কমিশন দুইখানি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ষ্টেটস্ম্যান পত্রে Fraser Junior ছদ্মনামে লিখিত তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধের ফলে শিক্ষা বিভাগে বেতনের বিভাগের (grading) ব্যবস্থা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র হুগলী কলেজে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য একটি ও নদীয়া জিলার ন্যায় পরীক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্ত একটি মেডল দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমটি তাঁহার পিতা তারকনাথ রায়ের নামে ও দ্বিতীয়টি তাঁহার পত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর নামে প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি আহারে, ব্যবহারে, বেশে আড়ম্বরশূন্য ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছন্নতা ও উদ্ভিদপ্রিয়তা অসাধারণ ছিল। তিনি স্বহস্তে বৃক্ষলতাদি রোপণ করিতেন ও সময় সময় গৃহসম্মুখস্থ রাজপথের ফুটপাতেও ঘাস বসাইয়া জল দিতেন। এমন কি তিনি গৃহসম্মুখস্থ ফুটপাথ স্বয়ংই ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতেন।

তাঁহার মত জ্ঞানান্বেষণপ্রয়াসী বাঙ্গালী অধিক নাই। তিনি Plain living and high thinkingএর যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাহা অনুকৃত হইলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম হইবে।

তাঁহার কৃতী ছাত্রের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার ছাত্রগণ কি তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন আয়োজন করিবেন না?

কবি।

দার্শনিক চাহে শুধু নীরস প্রমাণ;
বৈজ্ঞানিক মরে খুঁজে কারণ কেবল,
তবুও সন্তোষ হীন; সরস মহান—
কবি যাহা দেখে তাই—নবীন সরল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাক্ষসী না দেবী?

(১)

সুরেন্দ্রের ভাবী শ্বশুর শ্যামলাল বাবু যখন তাঁহার কন্যা নিরুপমার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হয়েন তখন সুরেন্দ্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তৎপূর্ব্বেও বহুলোক সুরেন্দ্রকে জামাতৃত্বে বরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাপতি তাঁহাদের কাহারও কন্যার সহিতই তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন নাই। শ্যামলাল বাবুর সহিত সুরেন্দ্রের পিতার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল; কাযেই বংশপরিচয়াদি জানিবার আর প্রয়োজন হইল না। সেই প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র প্রজাপতির অদৃষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেতে সুরেন্দ্রের পিতা শ্যামলাল বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিতে সম্মতি দান করিলেন, তবে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া পাকা জবাব দিতে পারেন না এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে চারিজন ভদ্র লোকের সম্মুখে দেনা পাওনার মীমাংসা হইয়া কথাবার্ত্তা স্থির হওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া পুনরায় শ্যামলাল বাবুকে চতুর্থ দিবসে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি আসিবার সময় শ্যামলাল বাবুকে তাঁহার কন্যার জন্ম-পত্রিকাখানি আনিতে বলিয়া দিলেন; কিন্তু শ্যামলাল বাবু তাঁহার কন্যার জন্ম-পত্রিকা নাই বলাতে অগত্যা সুরেন্দ্রের পিতা তাঁহাকে কন্যার জন্মের বৎসর, মাস, বার ও সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন।

(২)

সুরেন্দ্রের পিতা পরদিন গ্রাম্য আচার্য্য মহাশয়কে ডাকাইয়া পুত্রের কোষ্ঠীখানি দেখাইলেন, এবং যে কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক তাহার কোনও জন্মপত্র নাই সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য জানিতে চাহিলেন। গ্রহাচার্য্য মহাশয় সুরেন্দ্রের কোষ্ঠীখানি দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। মহাশয়, তিনি পূর্ব্বেই পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ স্থির করিয়া রাখেন, কন্যার জন্মকোষ্ঠী যদি না থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই। পাত্রের লগ্ন প্রভৃতি দেখিয়াই শুভদিন ঠিক করিয়া দিব।" তৎপরে আচার্য্যপ্রবর সুরেন্দ্রের পিতাকে কাণে কাণে বলিলেন, "সুরেন্দ্রের

রাক্ষস গণ, সুতরাং কোষ্ঠীবিচার লইয়া গোলযোগে কোনও লাভ নাই। কন্যার যদি রাক্ষসগণ হয় সে ত উত্তম। আমার ত বিশ্বাস কন্যার রাক্ষস গণ, তাই কন্যার পিতা কোষ্ঠী গোপন করিতেছেন। আর দেখুন, যদি কন্যার দেব গণ হয় তাহা হইলেও কোনও ক্ষতি নাই; আর যদি নর গণ হয় তাহাতেও আপনার পুত্রের ত কোনও অনিষ্ট হইবে না। তবে আমার বিশ্বাস, কন্যাটির রাক্ষস গণ। যাহাই হউক, যদি আপনি তথায় বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন স্বচ্ছন্দে মত দিতে পারেন। তাহার পর এক দিন শুভদিন স্থির করিয়া দিব।" এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইলে আচার্য্য মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৩)

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও সুরেন্দ্রের কতিপয় আত্মীয় সন্ধ্যাকালে পাত্রপক্ষের বাটীতে মজলিস করিয়া কন্যার পিতা শ্যামলাল বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং ঘন ঘন তাম্রকূট ধূমোদ্গীরণ করিয়া নানারূপ হাস্যপরিহাসে স্থানটিকে আনন্দ-কোলাহলমুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, এমন সময় শ্যামলাল বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ সাদরে শ্যামলাল বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই চারিটি অবান্তর কথার পর বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বিধাতাপুরুষ পূর্ব্বেই যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহা স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। উভয় পক্ষের দেনা পাওনার কথাবার্ত্তা সমাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে স্থিরীকৃত হইল। বিবাহের দিন পরে স্থির করা যাইবে, উভয় বৈবাহিকই এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তবে বিবাহসম্বন্ধে আর কাহারও কোনও অমত রহিল না। যথা-সময়ে সভাভঙ্গ হইল। সুরেন্দ্রের পিতার আগ্রহাতিশয়ে সকলেই একটু একটু 'মিষ্টমুখ' করিলেন। শ্যামলাল বাবু প্রথমতঃ কন্যার বাটীতে দৌহিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত আহার নিষিদ্ধ এই মত উত্থাপিত করিয়া জলযোগে দারুণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না,—সকলেই বলিলেন. "বিবাহ হউক, তাহার পর সে কথা। আসুন একটু 'মিষ্টমুখ' করিয়া এই শুভকার্য্যের প্রারম্ভকে মধুর করিয়া দিউন।" অগত্যা শ্যামলালবাবুকে সম্মতিদান করিতে হইল। জলযোগের পর সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

প্রথম যে দিন শ্যামলাল বাবু আসিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সেই দিনই বুঝিয়াছিল, বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইবে। সে নিতান্ত 'ছেলেমানুষ' ছিল না, বিশেষতঃ এই উপন্যাসপ্লাবিত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেও নানা পাঠ্য অপাঠ্য উপন্যাস পাঠ করিয়া তাহার জীবনসঙ্গিনীর সম্বন্ধে একটা আদর্শ ইতঃপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হইবামাত্র সে কন্যাটি দেখিতে কেমন, তাহার বয়স কত, সে লিখাপড়া জানে কি না ইত্যাদি তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। পাশ্চাত্যশিক্ষালোকপ্রাপ্ত তরুণ যুবা সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনসঙ্গিনীকে কেমনটি চাহে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সাধারণতঃ যুবকগণ বিবাহের পূর্ব্বে কল্পনারাজ্যে বিচরণকালে যেমন আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে সুরেন্দ্রনাথও তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রের আশা পূর্ণ হইবে কি? গোপনে তথ্যসংগ্রহ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ অবগত হইল যে, পাত্রীটি গৌরাঙ্গীও নহে লিখাপড়াও জানে না। বলিকার মুখ চক্ষু দেখিতে 'চলনসই' রকমের। কিন্তু সে অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা মাত্র। সুরেন্দ্রনাথ এতদিন হৃদয়ে যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, জানি না কাহার তুলিকাপাতে আজ তাহা সহসা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে অহরহঃ দুর্ব্বিষহ জ্বালায় পীড়িত করিতে লাগিল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া পিতার নিকট বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিল না। শিষ্ট শান্ত বলিয়া সুরেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। প্রকৃত পক্ষেও সে শিষ্ট শান্ত ছিল। হায় বিধাতা তোমার এ কি বিচার? তোমার রাজ্যে যে যেমনটি চাহে সে তেমনটি পায় না কেন? সুরেন্দ্রনাথ গোপনে হৃদয়ের এই অনুযোগ বিধাতার চরণে উপস্থিত করিল। জানি না, বিধাতা সুরেন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন কি না। সুরেন্দ্র কল্পনানয়নে যতই তাহার ভাবী গৃহিণীকে দেখিতে চেষ্টা করে, তাহার মনে ততই দুশ্চিন্তায় দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে হতাশ হইয়া সুরেন্দ্র ভাবনা ত্যাগ করিল; স্থির করিল, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহার উপর কাহারও হাত নাই। তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। জীবনে যদি সুখলাভ থাকিত অবশ্যই সে মনোমত গৃহিণী লাভ করিয়া সুখী হইত। সে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহারাই নির্দ্দিষ্ট পথে

জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবে ইহাই সঙ্কল্প করিল। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া সুরেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? তাই আশা ও নিরাশার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার হৃদয় নিরন্তর বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

(৫)

এদিকে সময়স্রোত পূর্ব্বেরই মত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিনের পর রাত্রি আবার রাত্রির পর দিন নিরঙ্কুশ গতিতে গতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বাদ্যকোলাহলের মধ্যে সুরেন্দ্র আশা ও নিরাশার আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে হইতে যথা-সময়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হইল। পাত্র সভাস্থ হইয়াছে। বিবাহ-বাটী আন-ন্দের কলকোলাহলে মুখরিত। পাত্রকে অপ্রতিভ করিবার জন্য কয়েকটি বালক ও যুবক নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত। সুরেন্দ্রের মন তখন নানা দুর্ভাবনায় পীড়িত।

"কন্যা পাত্রস্থ করিবার লগ্নকাল উপস্থিত, আর বিলম্ব করা হইবে না" বলিয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় পাত্রকে বিবাহ-মণ্ডপে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নাপিত পাত্রকে বিবাহ-মণ্ডপে আনয়ন করিল। সুরেন্দ্রের বক্ষঃ অজানিত আশঙ্কায় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল!

কন্যার পিতা শ্যামলাল বাবু কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। কন্যার আপাদমস্তক রক্তাম্বরে আবৃত। চিত্রপুত্তলীর মত সুরেন্দ্র মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। ক্রমে 'শুভ দৃষ্টির' সময় উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রের বক্ষঃ আরও বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। 'শুভ দৃষ্টি' হইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, একখানি সরল শান্ত মুখ; বালিকা যেন সংসারের কিছুই জানে না। সে যেন সংসারের সব ছাড়িয়া একটি মাত্র আশ্রয়ে আপনাকে ন্যস্ত করিয়া রাখিতে চাহে। সে মুখে বাহ্য সৌন্দর্য্যের আতিশয্য নাই; যাহাতে লোক বিমোহিত হয় এমন সৌষ্ঠব নাই। তবুও সুরেন্দ্র সে রূপে বিমোহিত হইল। বিধাতা বুঝি সুরেন্দ্রের সে দিনের কাতর প্রার্থণায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তাই আজ সুরেন্দ্রের নয়নে এই বালিকাকে সারল্যের ও শান্তির আদর্শ-স্বরূপিণী প্রতিভাত করিয়া দিলেন।

(৬)

বিবাহের পরও কয়েক দিন নানা উৎসবে কাটিয়া গেল। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ সহসা জ্বরে আক্রান্ত হইল। দুই দিন ভাল থাকে, আবার জ্বর হয়; এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রতিবেশিনীর দল কন্যাকে নিতান্ত কুলক্ষণা স্থির করিলেন; এবং সুরেন্দ্রের পিতা কন্যার কোষ্ঠী না দেখিয়া বিবাহে সম্মতিদান করিয়া ভাল কায করেন নাই বলিয়া তাঁহার দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে অতিশয় সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রের পীড়া কিছুতেই সারে না। জ্বর যায়; আবার জ্বর হয়। সে পিতামাতার একমাত্র জীবিত পুত্র, পিতামাতা তাহার পীড়ায় যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রোগের শেষ গেল না। পরন্তু ক্রমশঃ রোগ প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন সে জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রের পিতা ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার আসিয়া মুখ বিষণ্ণ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, অবস্থা ভাল নহে। ডাক্তার বলিলেন "প্রবল জ্বর; এক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার। রোগ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।" বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতিবেশিনীরা সুরেন্দ্রের পত্নীর উদ্দেশে নানারূপ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সকলেই এক-বাক্যে বলিলেন, "এমন 'অলক্ষণা'কনে ঘরে আনিয়াই এরূপ হইল। ও 'রাক্ষুসে' মেয়ে নিশ্চয় বাছাকে খাইতে আসিয়াছে।" নিরুপমা এই তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া অপরাধীর ন্যায় এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখনও বা নির্জ্জন কক্ষে নীরব অশ্রু-পাতে হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। বালিকার মর্ম্মব্যথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই, তাহার মনঃ-কষ্ট দূর করিবে কে ?

(৭)

সুরেন্দ্রের জ্বর প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। রোগীর অবস্থা নিতান্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। চিকিৎসক বলিলেন, "অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; আর সামান্য উৎকট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আজিকার দিনটা যদি ভালয় ভালয় কাটিয়া যায়, তবে জীবনের আশা করিলেও করা যাইতে পারে।" সমগ্র ভবন বিষাদে অন্ধকার

হইল। মহিলাকুল নিরুপমার উদ্দেশে অজস্র নিন্দাবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হতভাগিনী সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে যাহা লাভ করিতে লাগিল তাহাতে তাহার মর্ম্মব্যথা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অবশেষে বালিকা আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সে দিন মধ্যাহ্নে সে তাহার ননন্দাকে একাকী পাইয়া তাহার হাত দুই-খানি ধরিয়া অবিরাম অশ্রুজলে তাহার হস্তদ্বয় প্লাবিত করিতে লাগিল। সে অশ্রু বাধা মানে না। ননন্দার শত প্রবোধবাণীও সে প্রবাহকে বন্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে বহু কষ্টে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সে কহিল,—"ভাই আমা হইতেই এই অমঙ্গল। আমার যদি বিবাহ না হইত"—বলিতে বলিতে বালিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। অশ্রুপাতে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া এত দিন সে যাহা রক্ষা করিয়াছে আজ আর তাহা কোনও মতেই রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার ননন্দা বালিকার অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "কি করিবে, বৌ দিদি, আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তোমার দোষ কি, ভাই? দাদা যে বাঁচিবেন সে ভরসা নাই; পাঁচজন তোমার দোষ দিতেছে। কিন্তু কি করিবে? এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, দাদা যেন তোমার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় রাখিতে বাঁচিয়া উঠেন।"

ননন্দার কথায় নিরুপমা কতকটা আশ্বস্ত হইল। বিবাহের পর আজ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত বালিকার ভাল করিয়া আলাপ পর্য্যন্ত হয় নাই। তথাপি কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে স্বামীর রোগযন্ত্রণায় ব্যাকুল অন্তঃকরণে দিবানিশি দেবতার নিকট স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে। শান্ত সন্ধ্যায় সাঁঝের প্রদীপ হস্তে তুলসীমঞ্চের মূলে উপস্থিত হইয়া বালিকা তথায় প্রদীপ দান করিয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা করে, "হে দেবতা, আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও; এ অভাগিনীর জীবন লইয়া, যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে লইয়া তাঁহার জীবন দান কর।" সুরেন্দ্রের প্রার্থনায় ভগবান এক দিন কর্ণপাত করিয়াছিলেন; জানি না নিরুপমার প্রার্থনা ভগবান্ কর্ণপাত করিলেন কি না।

কিন্তু সুরেন্দ্রের আর কোনও উৎকট লক্ষণ উপস্থিত হইল না। ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইয়াছে।—এক দিন—

সুরেন্দ্রের বিধবা ভ্রাতৃবধূ তাহাকে বলিলেন, "নিরুকে কি পাঠাইয়া দিব ?" সুরেন্দ্রনাথ বলিল, "কেন ?" "কেন আবার, একটু বাতাস দিবে।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর মূর্ত্তিখানি বহু দিন পরে আবার সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় ও আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এ দিকে সুরেন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী নিরুপমাকে লইয়া উপস্থিত। তাহাকে বসিতে বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুরেন্দ্র ক্ষণকাল পত্নীর দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "নিরুপমা, দাঁড়াইয়া কেন ?" নিরুপমা তাহার দীর্ঘাবগুণ্ঠন সম্মুখের দিকে আরও একটু টানিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত সুরেন্দ্রের শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুরেন্দ্রনাথ বলিল "কাছে আইস, নিরু। অত দূরে কেন ?" নিরুপমা অবগুণ্ঠনটি সম্মুখের দিকে আরও একটু টানিয়া দিয়া একটু পিছাইয়া গেল। সুরেন্দ্র বলিল "বেশ, মন্দ নহে। এই বুঝি কাছে আসা !" এই বলিয়া সে আপনার ক্ষীণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বালিকার বাহু ধারণ করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলে নিরুপমা নির্জ্জীব পুত্তলিকার ন্যায় সুরেন্দ্রের নিকটবর্ত্তিনী হইল। তখন সুরেন্দ্র তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া কহিলে, "নিরুপমা, আমার যখন অসুখ তখন তুমি কি করিতে ?" বালিকা কি একটা অস্ফুট কথা বলিয়া লজ্জিত হইয়া পুনরায় অবগুণ্ঠনটি টানিয়া দিল। সুরেন্দ্র বলিল, "ছি ! ও কি, নিরু ? আমার এই অসুস্থ শরীর এখন তোমার অত লজ্জা ভাল দেখায় না। বল, তখন তুমি কি করিতে ?" তখন নিরুপমা অতি মৃদু স্বরে বলিল "কাঁদিতাম।" সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতে কেন ? আর কেহ কি দেখিতে পাইত ?" নিরুপমা বলিল, "ঠাকুরঝি দেখিয়াছিল।" সুরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতে কেন ?" বালিকা আর কোন ও উত্তর দিতে পারিল না।

তখন সুরেন্দ্র পুনরায় তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে যাইয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। সুরেন্দ্রবলিল, "এ কি ! তুমি কাঁদিতেছ ! আবার ক্রন্দন কেন, নিরু ? আমার অসুখ ত সারিয়া গিয়াছে।" বালিকা এবার ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে তুমি সারিয়া উঠিবে ? তোমার অসুখ না হইয়া আমার হইল না কেন ?" বালিকার নয়নাশ্রু দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্র স্বীয় ক্ষীণ হস্তে তাহার চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "কাঁদিও না, নিরু, ছি! তোমার ক্রন্দন দেখিয়া আমার কষ্ট হয়। আর কাঁদিও না।" সে মনে মনে কহিল, ভগবান্, কি সুকৃতিবলে এই অমূল্য রত্ন আমায় দিয়াছেন? সেই দিন সুরেন্দ্রের স্বচ্ছ হৃদয়ে নিরুপমার যে মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল সে তাহাতে তন্ময় হইয়া গেল।

(৮)

এদিকে সুরেন্দ্র দিন দিন যেমন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল প্রতিবেশিনী মহলেও তেমনই নিরুপমার সুখ্যাতির কথা ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত জানিই নিরুপমার মত সতী লক্ষ্মীর সিঁথির সিন্দূর ভগবান কখনই মুছিতে দিবেন না।" কেহ বা বলিলেন "আর তাহাও বলি, বধূর সিঁথির সিন্দূরের বলেই সুরেন্দ্রের মাতা এ যাত্রায় সুরেন্দ্রকে ফিরাইয়া পাইলেন।" অপর এক জন কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "যে দিন বৌ আসিয়া এ বাটীতে পা দিল সেই দিনই আমি বৌ দেখিয়া বলিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ সাবিত্রী। আহা বাঁচিয়া থাকুক; উহার দৌলতে সুরেনের আমার মাথার চুলের সমান পরমায়ু হউক।" ফলতঃ এক দিন যে বধূটি পিশাচিনী, ভর্ত্তার পরমায়ুহন্ত্রী বলিয়া প্রতিবেশিনীমণ্ডলীর নিকট অবজ্ঞাত হইয়াছিল আজ সে অমর মহিমার উজ্জ্বলালোকে মণ্ডিত হইয়া দেবীর আসনে স্থান পাইবার যোগ্যা স্থির হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

—:০:—

মানব-প্রহেলিকা।

(৩)

জড়বাদ ও আত্মবাদ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্ব প্রাণীর আদি বীজ একই প্রকারের। রাসায়ণিক বিশ্লেষণদ্বারা উহার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ উহাদের উপাদানগত কোন প্রভেদই নাই। বর্ত্তমান সময়ের জীববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়াছেন যে, ডিম্বকোষের ও শুক্রবীজের মধ্যে যে জৈব-উপাদান থাকে, তাহা সম্পূর্ণ তরল নহে,—অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি বিন্দু বৃহত্তর। ঐ বৃহত্তর বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর কোষস্থ প্রধান বিন্দুর আঁশগুলির সংখ্যাও বিভিন্ন। এই তথ্য নবাবিষ্কৃত ; ইহার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। মানবের কোষস্থ বৃহৎ বিন্দুর মধ্যে কতগুলি আঁশ আছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মানবীয় বৈজিক বিন্দুতে ষোলটি আঁশ বর্ত্তমান ; কেহ বলেন, চৌদ্দটি ; আবার কেহ তের-টির অধিক গণিয়া পায়েন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, সকল মানবের কৌষিক বৃহত্তর বিন্দুস্থিত অংশুসংখ্যা সমান নহে, অথবা একই ব্যক্তির সকল কৌষিক মূল বিন্দুর অংশুসংখ্যা সমান নহে। অন্যান্য জীবের কৌষিক মূল বিন্দুস্থিত আঁশের সংখ্যা সম্বন্ধেও ঐরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোষস্থিত অন্যান্য বিন্দুগুলি বায়ুপূর্ণ থাকে। সেই জন্য ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন যে, উক্ত কৌষিক প্রধান বিন্দুর মধ্যস্থিত আঁশগুলির সংখ্যার উপরই বিভিন্ন জাতীয় জীবের জাতীয়ত্ব এবং উহার বিন্যাসের বিশেষত্বের উপরই উক্ত জাতীয় জীবের বিশেষত্ব নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র ;—বৈজ্ঞানিক তথ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সেরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ এই মূল বিন্দুস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুবৎ পদার্থসংখ্যা জীবভেদে বিভিন্ন হইলেও উহাতে উপাদানগত পার্থক্য নাই। সুতরাং একই উপাদান হইতে যে বিভিন্ন জীব আবির্ভূত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, একই উপাদান হইতে টিকটিকি, গিরগিটি হইতে রাম, শ্যাম, এমন কি শঙ্কর, চৈতন্য পর্য্যন্ত বিভিন্ন জীবসৃষ্টি হইল কি রূপে? সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন যে, জড় উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়াবিকৃতিপ্রভাবে জীবের আবির্ভাব হয় না, জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চৈতন্য-শক্তির দ্বারা জীবদেহ গঠিত হইয়া থাকে। জড় উপাদান ভিন্ন জীবে 'আত্মা' আছে। এ বিশ্বাস সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন। অবশ্য কোন কোন দেশীয় লোকের ধারণা যে, কেবল মানবেরই আত্মা আছে, তীর্য্যক প্রাণি-গণের আত্মা নাই। এ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্ব জীবেরই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাবে মানসিক ব্যাপারসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকে। সংজ্ঞার (Consciousness) অনুভূতির ন্যায় আত্মানুভূতি অন্তর্ম্মুখী। এ স্থলে জ্ঞাতা (Subject) ও জ্ঞেয় (Object) একই। যাহা-দের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, তাহারা অন্তর্ম্মুখী অনুভূতির দ্বারা যাহার উপলব্ধি করে, তাঁহা বড় জোর তাহাদের স্বজাতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে পারে। সেই জন্য তাহারা মানবের আত্মার অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করে; তীর্য্যক প্রাণিগণের আত্মা স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তবে ইহার দ্বারা এই টুকু মাত্র সপ্রমাণ হয় যে, সর্ব্ব যুগে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পক্ষে মানবের জড়েতর সত্তাস্বীকার স্বাভাবিক। অন্ততঃ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত। কেহ কেহ এই সর্ব্বজনীন বিশ্বাসের হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস প্রমাণের ভিত্তি হইতে পারে না। মানবের বিশ্বাস বহুস্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হই-য়াছে। সেই জন্য উক্ত যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির ও প্রমাণের প্রয়োজন।

কি প্রকারে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, ইহাই গুরুতর সমস্যা। অনেকে জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে চাহেন। জড় বিজ্ঞানের প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে সম্মত নহেন। যাঁহারা জড়বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদের নিকট আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস নিতান্তই নিষ্ফল। জড়বিজ্ঞান কস্মিন কালেও আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ

করিতে সমর্থ হইবে না—হইতে পারে না। আত্মা জড় পদার্থ নহে। সুতরাং উহা কখনই জড়বিজ্ঞানের আমলে আসিতে পারে না। বাহ্য বস্তুর পরিবীক্ষণের ও পরীক্ষণের উপরই জড়বিজ্ঞান দণ্ডায়মান। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, প্রাণিবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, এমন কি মনোবিজ্ঞানও বাহ্য বস্তুর পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষণদ্বারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। আত্মার এরূপ বাহ্য পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষণ সম্ভবে না। সুতরাং উহা ঐরূপ বিজ্ঞানের আমলে আসিবে কি করিয়া তাহা আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। যাঁহারা আত্মবাদী তাঁহারা জড়বিজ্ঞানে নিয়মানুসারে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে যাঁহারা জড়বাদী যাঁহারা জড় ও আত্মা অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনীর তথ্য সন্ধান স্বাভাবিক। জড়বাদীরা আত্মার জড়ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই নিস্ফল হইয়া গিয়াছে। গত ৪ঠা সেপ্‌টেম্বর তারিখে ডাণ্ডি সহরের বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনে ডাক্তার সেফার (Dr. Schafer) জীবনীর বনিয়াদ (Origin of Life) শীর্ষক এক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, জড় পদার্থ হইতে জৈব উপাদান সৃষ্টি সম্ভবে। অনতিদূরবর্ত্তী কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জড় পদার্থের সম্মিলনে জৈব পদার্থের উদ্ভব করা যাইবে। তিনি বলেন, অনুকূল অবস্থায় আবশ্যক উপাদানের সংযোগফলে এই বিশ্বে মধ্যে মধ্যে জড় হইতে জৈব উপাদান উদ্ভূত হইতেছে,—মানব এখনও পর্য্যন্ত সেই রহস্য জানিয়া লইতে পারে নাই; সেই জন্য তাহারা জড় হইতে জীবের উৎপত্তি সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বর্ত্তমান সন্দর্ভে অধ্যাপক সেফারের সমস্ত উক্তির আলোচনা সম্ভবে না। আপাততঃ আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জৈব উপাদান প্রস্তুত হইলেই যে অধ্যাত্মতত্ত্বের সকল সমস্যারই সমাধান হইবে এরূপ অনুমান করা নিতান্তই ভ্রম। জৈব উপাদান, protoplasm, bioplasm, pschycoplasm, প্রভৃতি যে নামেই ঐ পদার্থকে অভিহিত করা যাউক না কেন, উহা যে আত্মা এ কথা কোনও দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিকই বলিতে সমর্থ নহেন। জীবদেহ জড়পিণ্ড বলিয়াই অভিহিত। সেই দেহেরই অংশবিশেষও জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং জড়পদার্থসংযোগে তাহার সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। তবে জৈব উপাদান হয়ত আত্মিক শক্তি স্ফুরণের সহায়তা করে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জৈব

উপাদান সৃষ্ট হইলে জড় হইতে আত্মার উদ্ভব করা হইবে, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না।

হিন্দুর মতে, এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্রই আত্মা জড়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে স্থানে তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল,—সেই স্থানেই জাড্য,—তাহাই জড়। প্রকৃতির ক্রোড়ে মায়া উপহত আত্মা বুদ্বুদের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। আত্মাশক্তি যত বিকশিত হইয়া উঠে, জড়ের শক্তি,—প্রকৃতির বা মায়ার শক্তি ততই কুষ্ঠিত হইয়া যায়। জৈব উপাদান জড়ই, কিন্তু জড়পদার্থ ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে চৈতন্যশক্তিস্ফুরণের সহায়তা করে। অর্থাৎ উহা চৈতন্য শক্তির,—বা জীবনীশক্তির অনুকূল আশ্রয়মাত্র—উহা জীবনীশক্তি বা চৈতন্যশক্তি নহে। অধ্যাপক সেফার হিন্দুর একটি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আত্মা (Soul) ও প্রাণ (Life) এক নহে,—উহা স্বতন্ত্র; তাহার ঐ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখাই কর্ত্তব্য *। আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে ঐ কথাই বলিয়াছি। অধ্যাপক সেফার যাহা বলিয়াছেন, হিন্দু তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। কিন্তু যদি বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জৈব উপাদান প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আত্মসম্পর্কিত সমস্যার যে সমাধান হইবে। এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। ইহা কেবল আমাদেরই কথা নহে। ডাক্তার সেফারের বক্তৃতা পাঠ করিয়া বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক অলিভার লজও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন।†

---

* Not infrequenly they found the terms 'life' and 'soul' erroneously employed as if identical, but unless the use of the latter expression was extended to a degree which would deprive it of all special significance, the distinction between these terms must be strictly maintained.

† "It does not follow that the nature of life will be much better understood even when living protoplasm has been artificially put together ; the thing which by its interaction with matter confers on it what we know as 'vitality' will still in all probability elude us. It does not appear to be a form of energy but it certainly is a guiding principle utilising forces known to chemistry and physics and all the ordinary laws of nature for ends which appear to be outside the known laws of the physical world."

সার জেম্‌স ক্রাইটন-ব্রাউন ডাক্তার সেকারের বক্তৃতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জড়বাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছে। লোক আধ্যাত্মিক ভাবে বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে অগ্রসর হইতেছে; আমি জড় হইতে জীবোৎপত্তিবাদে বিশ্বাস করি না। ডাক্তার সেফার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাহা অপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি ভিন্ন আমি আমার মত পরিবর্ত্তিত করিতে পারিব না।• অধ্যাপক মেচনিকফ বলেন,—কৃত্রিম উপায়ে জীবোৎপত্তি বর্ত্তমান যুগের রসায়ণ শাস্ত্রের সাধ্যাতীত (not within the present range of practical chemistry)। ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড়বাদিগণ এখনও আত্মবাদিগণের মত খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

সুতরাং আভাসে বুঝা যাইতেছে যে, জড়বাদদ্বারা অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। উহা কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে? মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এই বিষয়ের আভাস মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। মন ও মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইলেও আত্মার শক্তি মনের ভিতর দিয়া কার্য্য করে। যে সময় আত্মার শক্তি মনের ভিতর দিয়া কার্য্য করে, অথবা অনুভূতি মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মনের নিকট উপনীত হয়, সেই সময় মস্তিষ্কের আণবিক চাঞ্চল্য (molecular movement) জন্মে। সেই জন্ম জড়বাদীরা উক্ত চাঞ্চল্যকে সংজ্ঞা বা চৈতন্য বোধের (Consciousness) কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। বিখ্যাত নাস্তিক হাক্সলিও বলিয়াছেন,—"I know nothing and never hope to know anything of the steps by which the passage from the molecular movement to states of consciousness is

• "Anything that Dr. Schafer says must be listened to with very great respect and deference, but at the same time I must say that the swing of the pendulum has been in a direction entirely opposite to that in which his views lead us. It has returned from the materialistic to a more spiritual conception of the universe. Do I believe in the theory of spontaneous origin of life? Certainly not, and it would need a very powerful argument to lead me to change my views."

effected." ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আণবিক চাঞ্চল্য হইতে সংজ্ঞার উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা আমি জানিও না, জানিতে পারিব বলিয়া আশাও করি না। বিখ্যাত নাস্তিক আর্ণেষ্ট হেকেল কিন্তু আণবিক চাঞ্চল্যকে সংজ্ঞার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতও বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে।* সংজ্ঞা হইতেই আত্মার স্বাতন্ত্র্যের আভাস পাওয়া যায়। জড় পদার্থই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। ইহা ভিন্ন Telepathy, Hypnotism, Clairovoyanc, Mediumistice phenomena, প্রভৃতির সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ সংজ্ঞা (Consciousness) ভিন্ন মানবের আর একটি অস্ফুট সংজ্ঞা আছে। ইংরেজী ভাষায় উহাকে Subliminal consciousness বলে। বর্ত্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জড়বাদীরা ইহার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে সমর্থ হইলাম না। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এইরূপ জটিল বিষয়ের আলোচনা করিলেও উহা প্রকাণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়। অথচ এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা সহজ নহে।

আমার মতে আত্মা সম্বন্ধীয় ব্যাপার জানিতে হইলে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পাঠ করাই কর্ত্তব্য। পুরাকালে আমাদের দেশে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের দেশে এখন যে সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যার গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অনাবশ্যক বিতণ্ডা নাই। সে সকলে উক্ত হইয়াছে, যোগদ্বারাই আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এখন অনেক অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এই কথা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, স্মৃতি, অনুভূতি, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা আমাদের চৈতন্যবোধ নিরন্তর অনুরঞ্জিত হইতেছে। মানবের মানসমুকুরে স্মৃতি, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির রাগ সর্ব্বদা প্রতিফলিত থাকে বলিয়া মানব আত্মার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকারের পথ সুগম হয়। সেই জন্য যোগিগণ যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া থাকেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"—যোগ চিত্ত বৃত্তির

* Vide the 'Coming Science' pp. 114-179.

নিরোধ। যোগিগণ যোগদ্বারা দেহকে ও দেহসম্ভব ইন্দ্রিয়দিগকে সম্পূর্ণ অসাড় ও নিস্পন্দ করিয়া মানস-মুকুরকে রাগশূন্য করিয়া ফেলেন। তখন ক্রমশঃ তাঁহার বহিঃসংজ্ঞা ও অন্তরস্থ অস্ফুট সংজ্ঞা একীভূত হইয়া যায়—সংজ্ঞা (Consciousness) বিষয়ান্তরব্যাবৃত হইতে পারে না,—সুতরাং অন্তরস্থ অব্যক্ত সংজ্ঞার (Subliminal consciousness) সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পায়। এই উভয় সংজ্ঞাই যখন একই ভাবে ভাবিত হয়, তখন আর তাহাদের দ্বৈধভাব থাকে না;—দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। হিন্দুর এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের—এই সাধন-পদ্ধতির সত্যতা এখন কোন কোন পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিদ্ পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এই সনাতন সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য আধ্যাত্মিক পন্থার অভিনব পন্থী পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধৃত করিতে হইল। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভবে কি না, তাহা অবগত নহেন; তবে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে নির্ম্মল মানস-মুকুরে প্রকৃত জ্ঞান প্রতিফলিত হইতে পারে, ইহার আভাসমাত্রই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন।

---

* এ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক Edward MacNutty—Phenomena of Consciousness নামক সন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই:—

Above all, he (man) must disentangle himself from the intricate embraces of sensualism, the sleepless and all-pervading power which marches triumphantly over the prostrate forms of its myriad victims with its retinue of a thousand illusions. The accumulated refuse of unwholesome thoughts; the hunger for wealth, power, fame, hatred and pleasure must not only be abandoned but destroyed. Hitherto, he has known himself as a bundle of memories, sensations and habits. Divested of these he has nothing to recognise himself by, save a name which is a mere label, that must also be thrown aside. He now stands alone—conscious but uninfluenced by the world without or that within—a stranger to himself. From this close pre-occupation with secret springs of being arises the phenomenon of double consciousness, the sensation of being two persons in one body. For him who is resolved to develop, there is no escape from this unpleasant and dangerous condi-

য়ুরোপেও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিদ্যা এখনও তথায় পরিপক্বতা লাভ করে নাই। উহা Occult Science নামে অভিহিত। যে সকল মনস্বী এই অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধুনাতন জড় বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণে সহসা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের এখনও শৈশবাবস্থা। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু ইতোমধ্যেই এই বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

আধুনা অনেক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে আস্থাস্থাপন করিতে চাহেন না, উহা অলৌকিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা জড় বিজ্ঞানের বাক্যগুলি আপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধানে জড় বিজ্ঞান একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদীরা জীবনীকে শক্তিবিশেষ (Vital force or energy) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহা নিতান্তই "গোঁজামিল"। *কারণ, শক্তি কি,

---

tion. * * * * * * Into this arcanum of profound suspense and silence, doubt must not enter nor impurity of thought. There is no guiding light. Having parted from the phrases and knowledge which directed him in the world of men, he is alone with the unknown. Freedom arrives. As globules of mercury coalesce, so the two personalities merge into one, never again to be divided." Vide the 'Occult Review' July, 1912. pages 32-33. এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, উক্ত মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যোগসম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেন নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যেরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক, তাহারই কথা বলিয়াছেন। যোগসম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যায়। অন্যান্য দার্শনিকদিগের এইরূপ মতও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

* The actual nature of force—the thing in itself—is unknown to us. Our knowledge of force is confined to the conditions under which it is manifested and the effects which flow from it. We observe the changes brought about in the condition of matter under the influence of heat, electrecity etc. It is seen that given like conditions similar changes are invariably produced under such influeness. Of the intrinsic nature of the agent that brings about the change we are ignorant—Alfred Hook.

উহার প্রযোক্তা কে,—তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। তাঁহারা কেবল সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে শক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়া শক্তি-বিজ্ঞান রচনা করিতেছেন। যে সমস্যার সমাধানে জড়বাদ বারংবার আপনার সামর্থহীনতা প্রকাশ করিতেছে,—তাহার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে; বরং আত্মবাদীদিগের প্রমাণের উপর কতকটা নির্ভর করা চলে। কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত তথ্য সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার hypothetical হইতে পারে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানেও এইরূপ hypothetical ব্যাপার বহুস্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং মানব-প্রহেলিকার আলোচনায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সংগ্রহ।

—:•:—

ইতিহাস।

—:•:—

প্রাচীন কলিকাতা।

—:○•‿:—

ইংলণ্ডের ভারত সত্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই স্থানান্তরের রাজনীতিক কারণ যাহাই হউক কেন না ইহা যে সকলের প্রীতিপ্রদ হয় নাই তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। দিল্লীর প্রান্তরে বহুবার ভারতের রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছে। মহাভারত-বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিকযুগে ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এই স্থানেই ময়দানবগঠিত মণিময় সভায় অভিমানী দুর্য্যোধনের জলে স্থলভ্রমে যে বিষোদ্গার হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়। তাহার পর মুসলমানগণ বহুবার দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দিল্লীতে সাতটি নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। দিল্লীর সহিত ইংরাজের রাজ্যস্থাপনের ইতিহাস বিশেষভাবে বিজড়িত নহে। কিন্তু কলিকাতার সহিত এদেশে ইংরাজাধিকারের স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। ইংরাজ যখন মুসলমানের কৃপায় নির্ভর করিয়া বাণিজ্যবিস্তারবাসনায় এ দেশে আসিয়াছিলেন তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজের সকল স্মৃতি কলিকাতার সহিত বিজড়িত। যব চার্ণক এই কলিকাতার জলা ভূমিতে মুষ্টিমেয় ইংরাজ লইয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই কলিকাতায় ইংরাজের লাঞ্ছনার ও বীরত্বের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত। ক্লাইব হেষ্টিংস, বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতির স্মৃতি এই কলিকাতার সহিতই বিজড়িত।

সংপ্রতি কলিকাতার সম্বন্ধে কয়খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাষ্টিড প্রথম কলিকাতার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তৎপূর্ব্বে মিষ্টার লং 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কলিকাতার কথা বিবৃত করেন। তাহার পর হাইড, কটন, ফার্মিঞ্জার, কুমারী ব্লিচেনডেল, ম্যাজ প্রভৃতির চেষ্টায় কলিকাতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার প্রভৃতি ফরাসী লেখকদিগের রচনায় ভারতের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ডিভিল নামক একজন ফরাসী নৌকাধ্যক্ষ "গঙ্গাতীর' হইতে ৩৩খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সকল পত্রে চিনির ব্যবসা হইতে সতীদাহ পর্য্যন্ত নানা বিষয় লিখিত হয়। লেখকের রচনা দেখিয়া মনে হয়, তিনি বুদ্ধিমান ও পর্য্যবেক্ষণশক্তিশালী ছিলেন। পত্রগুলি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

সেগুলিতে কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটস্থ বহু স্থানের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাকপুর। যে সময় পত্রগুলি লিখিত হয় সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বারাকপুরের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বারাকপুর হইতে ঘনচ্ছায় বৃক্ষবীথি,মধ্যবর্ত্তী সুগঠিত পথ কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সহরে অনেকগুলি সুন্দর 'বাঙ্গলো' বিদ্যমান। বড় লাটের প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার নিকটেই পশুশালা। এই পশুশালা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাণ্টের সুপ্রসিদ্ধ Rural Life in Bengal পুস্তকেও ইহার উল্লেখ আছে। ডিভিল বলেন, বারাক-পুরের প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য ও এই ছায়াবহুল স্থানের বাতাসের সুখদ ভাবহেতু ইহা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষ রমণীয় ও বাঞ্ছনীয়।

ডেনিস সহর শ্রীরামপুরকেও ডিভিল সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋণদায়ে

শ্রীরামপুর। বিব্রত হইলে লোক পলাইয়া শ্রীরামপুরে যাইত। ইহাতে ডিভিল অত্যন্ত বিস্মিত হয়েন। ডিভিল চন্দননগরের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমারদিগের এই সকল ক্ষুদ্র গ্রাম ও উপনিবেশ কেবল ইংরাজের প্রাধান্যের কথাই ভারতবাসীর চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

তিনি বলেন, সে কালের কলিকাতার বণিকরা আফিস হইতে যাইয়া সন্ধ্যায় গাড়ীতে

কলিকাতার সমাজ। সস্ত্রীক ভ্রমণে বাহির হইতেন। কেল্লা হইতে সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথেই তাঁহাদের ভ্রমণ নিষ্পন্ন হইত। তবে তাঁহাদের ভ্রমণ নাকি নিরানন্দ ব্যাপার ছিল—শববাহক দিগের শকটশ্রেণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। গৃহে ফিরিয়া ইঁহারা আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ভোজনটাও কিছু অতিরিক্ত হইত। মধ্যরাত্রিতে তাঁহারা মত্ত অবস্থায় বাহির হইতেন। প্রায়ই ভৃত্যগণ প্রভুদিগকে গৃহে লইয়া আসিত, আর প্রভুরা তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেন। কলিকাতার বণিকদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব নহে।

তখন রাত্রিদিন তরবারিধারী শাস্ত্রীগণ সহর পাহারা দিত। তাহাদিগকে চৌকিদার

পুলিশ। বলা হইত। কোন স্থানে শান্তিভঙ্গ হইলে তাহারা নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিত; ঘণ্টায় ঘণ্টায় "সব আচ্ছা হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিত। চৌকিদাররা য়ুরোপীয় নাবিকদিগকে লইয়া বড় বিব্রত হইত। জাহাজ ভিড়িলেই এই নাবিকগণ সহরের নিকৃষ্টাংশে ছড়াইয়া পড়িত ও মারামারি করিত। ডিভিল বলেন, ধরা পড়িলে তাহারা প্রায়ই অব্যাহতি পাইত। বাঙ্গালীকে হত্যা না করিলে তাহাদের বড় শাস্তি হইত না; এ অপরাধেও সামান্য অর্থদণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। এ কথা, বোধ হয়, অতিরঞ্জিত। ডিভিল বলেন, কোন ভারতবাসীই কোন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না।

গোবসন্ত।

(২)

সময়ে সময়ে রোগাক্রান্ত পশুর উরুদেশে, পাজরায়, গলকম্বলের ত্বকে বসন্তের ন্যায় স্ফোটক দৃষ্ট হয়। ইহা কিন্তু সকল সময়ই দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মকালে আক্রান্ত হইলে এই লক্ষণটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হইবার একটি প্রধান চিহ্ন। এই স্ফোটক নির্গত হইলে ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়। এ জন্য সাধারণ লোকে এই রোগকে বসন্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া "মাতা" বলিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি গোবসন্ত ভ্রম হইতে পারে।

১। গবাদির সংক্রামক শ্লৈষ্মিক জ্বর (malignant catarrhal fever of the ox).

২। এঁসো (Foot and mouth disease).

৩। রক্ত আমাশয় (Dysentry).

৪। তড়কা (Arthrax).

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি উত্তম প্রণিধান করিলে ভ্রম কম হইবার সম্ভাবনা।

পশুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে মুখের অভ্যন্তরে, চতুর্থ পাকস্থলীতে, ক্ষুদ্র অন্ত্রে, গুহ্যদ্বারে এই ব্যাধির প্রধান ও মূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ পাকস্থলী শ্লৈষ্মিক প্রদাহ জনিত রক্তবর্ণ হইতে নীলাভ ধারণ করে, স্থানে স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয়। Pylorus নামক ছিদ্রে এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সময় সময় অত্যধিক প্রদাহজনিত রস নির্গত হইয়া এই সকল ক্ষত বিশেষের উপর একপ্রকার কৃত্রিম আবরণ পড়ে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রদাহহেতু রক্তাধিক্য এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষতসকল দৃষ্ট হয়। Peycis patches নামক গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে। বৃহৎ অন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন অল্প পরিমানে বর্ত্তমান থাকে। গুহ্যদ্বারে ঝিল্লি অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় এবং প্রায়ই তাহাতে রক্তবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ পড়ে। প্লীহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যকৃৎ অত্যন্ত নরম হয় একটু জোর দিলে গলিয়া যায়। কিন্তু কোষের ঝিল্লি-প্রদাহ ও স্থানে স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয়। ফুসফুসে রক্তাধিক্য হয় এবং বায়ুকোষে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করতঃ ফুসফুসকে নিষ্কাষিত করে।

কোন স্থানে গোবসন্তের আবির্ভাব হইলে, গরুগুলিকে আক্রান্ত, সন্দেহযুক্ত ও সুস্থ এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া, স্বতন্ত্র করিবে; এবং পীড়িত বা সন্দেহযুক্ত শুশ্রূষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকের বন্দোবস্ত করিবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহাদের সহিত যেন নিরোগ গরুর সংস্রব না থাকে। যদি স্বতন্ত্র লোক রাখিবার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে রোগীর গোশালা হইতে নির্গত হইলে, গোবর মাটী বা ফিনাইল মিশ্রিত জলে হাত পা ধুয়াইবে, ও পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। যথাযথ চিকিৎসা করাইলে অনেক গরু আরোগ্যলাভ করিতে পারে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে, এই ব্যাধি য়ুরোপের ন্যায় মারাত্মক নহে। পল্লীগ্রামে বিলাতি ঔষধ না পাইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য দেশীয় ঔষধের কথা বলিব। রোগের প্রথম অবস্থায় যখন জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় তখন প্রত্যহ সকাল বিকাল দেড় হইতে তিন আউন্স পর্য্যন্ত লবণ বা Epsom Salt কিছু গরম ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে। প্রত্যহ এক হইতে দুই ড্রাম পর্য্যন্ত কুইনাইন ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে। জলীয় ভাতের মাড় দিবে। ইহাতে পিপাসা নিবারণ ও শরীরে বলবর্দ্ধন হইবে। মল পাতলা হইতে আরম্ভ হইলে, যত দিন না মল শক্ত হয় ততদিন নিম্ন লিখিত ঔষধটি দিনে চারিবার খাওয়াইবে।

খড়মাটীর গুঁড়া	½ ছটাক
খদির	এক কাঁচ্চা
শুট্‌	১ কাঁচ্চা
আফিং	৩ দোয়ানি।
দেশীমদ	১ ছটাক।
ভাতের বা তিসির মাড়	যথেষ্ট পরিমাণে

রোগীর ঠাণ্ডা লাগিতে দিবে না। তাহাকে কম্বলদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। গোয়াল সাধ্যমত পরিষ্কার রাখিবে এবং সন্ধ্যাবেলা গন্ধকের ধূম দিবে। আবর্জ্জনা সকল নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পোড়াইয়া ফেলিবে। পশু একটু আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে কচি কচি দুর্ব্বা ঘাস অল্প পরিমাণ খাইতে দিবে। ভাতের মড় যত বেশী খাইতে পারে দিবে। কিছুদিন কোন প্রকার কঠিন খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে না, কারণ মুখের ক্ষত জন্য খাইতে পারিবে না; এবং কিছু খাইলে অজীর্ণ হইবে।

সন্দেহযুক্ত ও সুস্থ গরুদিগকে প্রত্যহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। সন্দেহযুক্তের মধ্যে যদি কাহারও কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং কেহ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে রোগাক্রান্ত গরুর গোহালে সরাইয়া দিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিকিৎসা করিবে। প্রত্যহ সুস্থ পশুগুলির তাপ পরীক্ষা করিবে। জ্বর হইলে তাহাকে সন্দেহযুক্তের পালে পাঠাইয়া দিবে। সুস্থ পশুদিগের জন্য যত শীঘ্র পার টীকা দিবার আয়োজন করিবে। কলিকাতা বঙ্গদেশের পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে তিনি ইহার বন্দোবস্ত করাইয়া দেন। মফঃস্বলে স্থানীয় পশু চিকিৎসক, পুলিশ ইন্‌সপেক্টর, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কিম্বা বঙ্গদেশের পশুচিকিৎসা বিভাগের তত্বাবধায়কের নিকট আবেদন করিতে হয়।

টীকা নানাপ্রকারের; আমাদের দেশের যে টীকার প্রচলন হইয়াছে তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রোগরস লইয়া টীকা দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগসর এক প্রকার সূক্ষ্ম পিচকারির দ্বারা প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদিগের কোনও অসুবিধা হয় না। জ্বর কিম্বা টীকার স্থানে কিছুই হয় না। গরুসকল নিয়মিত কায করে, দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা নাই। কোনও জন্তু মরিলে, তাহাকে ফেলিয়া দিবে না; দূরবর্ত্তী কোন স্থানে পুতিয়া ফেলিবে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুর দ্বারা এই ব্যাধি বিস্তারিত হইতে পারে। আর একটি কথা, কোনও নূতন গাভী কিনিলে তাহাকে অন্ততঃ ১৫ দিনের জন্য স্বতন্ত্র রাখিবে, কারণ, নূতন গরুতে গো বসন্তের বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারে। কোনক্রমে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গোবসন্তের আবির্ভাব হইলে এক মাঠে, পালে গরু চরিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী গরু চরিয়া যাইলে, তথায় সুস্থ গরু চরিলে ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।



বিদেশিনী

Tri-colour Blocks by G. N. Mukherji, Prop. Mohila Press. Mohila Press, Calcutta

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১৩)

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩১৯।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথার উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহারা তারকের এই দানে বিস্মিত হইবে না।

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স সেই সময় হইতেই তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। বোধ হয় তারক আমার অপেক্ষা বছর খানেকের ছোট হইবেন। তিনি পড়িতেন হিন্দু কলেজে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে, আমি পড়িতাম সংস্কৃত কলেজে; আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা ত বড় কিছু ছিল না, কি গতিকে যে হইল তাহা আমার স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে গতিকেই হউক আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্পবয়সে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম, অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিদ্যাসাগর কখনও কখনও লাইব্রেরীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় রত থাকিয়া ইংরাজীতে পারিপাট্য লাভ করিবার অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্পবয়সে তারক, যেরূপ ইংরাজী কহিতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

"সে আজ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময়

অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য জন্মে নাই। আমরা 'সখা' শব্দের অর্থ মোটামুটি সহচর বা বন্ধু বুঝিয়া থাকি; কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ স্থলবিশেষে সখা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথা হইতে একটা শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়াছেন 'এক প্রাণঃ সখা প্রোক্তঃ' অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে মিল হইলে সখা হয়। তাহার মানে এই যে, তুমি ও সেক্সপীয়র ভালবাস আমিও সেক্সপীয়র ভালবাসি, তোমারও যাহাতে হাসি পায় আমারও তাহাতে হাসি পায়, তুমিও যাহা ঘৃণা কর আমিও তাহা ঘৃণা করি, এইরূপ নানা প্রকার মিল থাকিলে দুইজনে পরস্পর সখা হয়। তারকের সঙ্গে আমার সেইরূপ অনেক বিষয়ে মিল আছে; বিশেষতঃ হাসির কথা সম্বন্ধে। আমরা উভয়েই এক্ষণে রুগ্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি; দেখা সাক্ষাৎ বড় কম; তথাপি এখন পর্য্যন্ত একলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে যদি কোন হাসির কথা আমার মনে আইসে তৎক্ষণাৎ তারককে মনে হয়; ভাবি যে, সে এ কথাটা শুনিলে খুবই হাসিত।

"তারকের মত বিমলবুদ্ধি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। অল্পবয়স হইতেই তাহার ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তৎকালে স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টন নূতন চলন হইয়াছিল, তারক তাঁহার গ্রন্থ খুব পাঠ করিতেন ও তাঁহার খুব ভক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে সে মিল ও স্পেন্সরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদিও দর্শন শাস্ত্র কতক কতক পড়িতাম বটে, কিন্তু তারকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভূতপূর্ব্ব চক্ষুরুন্মীলন হইয়াছে। একটা বিষয় অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে; আমার একটি বিশেষ অসুস্থতা আছে, সে অসুস্থতাটির বাহিক কোনও লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আমি নিজের ভিতরে ভিতরে দুরন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করি। এক দিন তারকের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিলাম যে, অনেকে ইহা imaginary (কাল্পনিক) বলিয়া আমাকে উপহাস করেন; তারক কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে বলিলেন, the imaginary is not the less real। এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, এবং তদবধি আমার মানসক্ষেত্রে উহা উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

"ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না; তারকের ইংরাজী গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট আমার

কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজী গদ্য-পদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative, চীৎকার, হাতপা নাড়া, ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়েরই বহির্ভূত; ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধ হয় তাহাকে serene বলা যাইতে পারে।

"তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ আর আমি কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছুমাত্র নাই। এতকালের সংসর্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। এক দিনের কথা মনে পড়ে। চা বাগানের এক 'সাহেব' একজন কুলিরমণীর প্রতি এরূপ পাশব বলপ্রয়োগ করে যে, উহাতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। সে সময়ে সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রু-জলে পারপ্লুত হইল। Impulseএর বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি অল্পেই চটিয়া উঠেন। ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। সেরূপ মেজাজ গরম না হইলে বোধ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধেও আরও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের দোষই বল আর গুণই বল, কোন রূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; অন্যায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া যায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ দায়ে পড়িলে, পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া

তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক একবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

"বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতার একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান তারকেশ্বরের নিকট অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসত বাটী নির্ম্মান করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন You are the architect of many a man's fortune in town। কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার প্রধান বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺ কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

"কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমাদের রিপণ কলেজের পুরাতন বাড়ীটির ঠিক পশ্চিম অংশে তারকের মাতামহপ্রদত্ত একখানি একতলা বাড়ী ছিল। কতদিন সেই বাড়ীতে তারকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি; তাহার বসিবার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কত নিভৃত বিশ্রব্ধ আলাপ, কত ভবিষ্যতের আশার কথা, দুইটি অশান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত ব্যাকুল স্পন্দন!

"তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই স্বোপার্জ্জিত এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহাকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিশ্রমের ধন অম্লান-বদনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহানুভবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

"কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তারক যে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমেই ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্যমে একবার মুৎসুদ্দিগিরির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে স্যর মর্ডণ্ট ওয়েল্‌স্ নামক দুর্দ্ধর্ষ জজের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজী বলিবার পারিপাট্য, straightforwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ

এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহার পর তাঁহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চার বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কার্য্যাভিনিবেশ, অনন্যমনস্কতা, ও অক্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

"তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালাভাষার একজন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তিনি বলিলেন—

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন; 'অধিকার' শব্দটা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ State function; সেই অর্থ ধরিতে সর্ব্বাধিকারী বলিতে a state functionary who looked after all the departments of a state এইরূপে বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ড রাজ্যের Prime Minister বলিতে যদিও ঠিক তাহা বুঝায় না, তথাপি তিনি প্রধান অমাত্য এই অংশে সর্ব্বাধিকারী পদের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

"প্রসন্ন বাবু বসু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন,

তদবধি তাঁহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে। যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, হাবড়ার সন্নিহিত শিবপুর সহরে একটি মুসলমান বংশ আছে, তাহারা অদ্যাপি 'কাজী' নামে অভিহিত হয় যদি চ এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাজীপদস্থ নহেন।

"প্রসন্ন বাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামটি হুগলি জিলার অন্তর্গত, এবং এক সময়ে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের অপরাপর অনেক স্থানের মত ম্যালেরিয়া দোষে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ন বাবুদিগের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বোধ হয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকাকড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাত্রিতে পাঠ করিবার জন্য প্রদীপের তৈল পর্য্যন্ত জুটিত না। তিনি রাস্তার লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। আমার মনে আছে, ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রের একটি উত্তর প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন; তাহা আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। সেবার সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট নামক নাটক পরীক্ষার পুস্তক ছিল, প্রসন্ন বাবু তাহারই উত্তর লিখিয়াছিলেন; এবং তৎসম্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটিগণিত ও বীজগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটিগণিত প্রসন্ন বাবুর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মফঃস্বলপ্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতির জন্য ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর

প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন,—আন্দাজ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ,—সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নূতন গ্রন্থ শিশুদিগের পাঠোপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। পাটিগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্ন বাবু গ্রহণ করিলেন। এই গুরুতর কার্য্য তিনি কি প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটিগণিত শাস্ত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটিগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অদ্যাবধি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই; কারণ, বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদিগের দেশে সকল কার্য্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাঁহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে,

তোর শিল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া,—

প্রসন্ন বাবুর পাটিগণিতের পদচ্যুতি ইহারই একটি দৃষ্টান্তস্থল! বাঙ্গালা পাটিগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রসন্ন বাবুকে সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে দুই খণ্ড বহুবিস্তৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহার কারণ, বাঙ্গালাতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন বীজ-গণিত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং সেই দুই খণ্ড এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে ভাষার প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম "আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, পাটিগণিত রচনা করিবাব সময় প্রসন্ন বাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটিগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যা-

পনার প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যা-সাগর ইঁহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে, তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল।

> কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূরৌ
> নাথুরামো প্রাজ্ঞ বর্দ্ধেপ্যনল্পং।
> যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
> টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায়॥

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথ প্রকাশিত করেন।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—"কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কল কব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।"

এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে জজ পণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, ঘুষ লইত।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।



সদ্যস্নাতা।

বুদ্ধ গয়া।

—:০:—

(২)

বুদ্ধ গয়া কত দিন পূর্ব্বে প্রথম হিন্দুর অধিকারে আসিয়াছিল, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে পুরাবস্তুর সাক্ষ্যে মনে হয়, বুদ্ধ গয়ার প্রাধান্য-লোপ গয়ার প্রাধান্য-লাভের কারণ।

বায়ু পুরাণান্তর্গত 'গয়া মাহাত্ম্যে' গয়ার উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত আছে।—বিষ্ণুর নাভিপদ্মসম্ভূত ব্রহ্মা বিষ্ণুর অনুমতি অনুসারে জীবসৃষ্টি করেন—সুরাসুর তাঁহারই সৃষ্ট। অসুরদলমধ্যে গয়া মহাবল ও পরাক্রমশালী ছিল। সে ১২৫ যোজন দীর্ঘ ও ৬০ যোজন বিস্তৃত ছিল; সেই বৈষ্ণব কোলাহল গিরিশিরে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া বহু সহস্র বৎসর সুদারুণ তপ করিয়াছিল। তাহার তপশ্চারণে ভীত দেবদল ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থী হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কৈলাশশিখরাসীন মহেশ্বরের নিকট গমন করেন। মহেশ্বর উপায়নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া দেবগণসহ ক্ষীরাব্ধি-শয়নে শয়ান বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিপ্রায়বিজ্ঞাপন করেন। বিষ্ণু স্বয়ং পশ্চাদ্গামী হইবেন বলিয়া অন্য দেবতাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তখন কেশব গরুড়-পৃষ্ঠে ও অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া গয়াসুর-সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন আর তপশ্চারণ করিতেছ? আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি বর চাহ, বল; আমরা তাহাই দিব।" শুনিয়া গয়া বলিল, "যদি আমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করেন তবে আমার দেহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দেহাপেক্ষা—দেব, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, তীর্থ হইতেও পবিত্র করুন।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলে জীবগণ গয়ার দেহ স্পর্শ বা দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিল; যমালয় শূন্য হইল। তখন পুরন্দরাদি-সহায় যম বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু গয়ার দেহোপরি যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দেবগণকে উপদেশ দিলেন। গয়া সমাগত দেবগণকে সম্মুখে দেখিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। তখন ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ তাহার দেহ প্রার্থনা করিলে গয়া সানন্দে নিজ দেহ প্রদান করিল। সে নৈঋতে হেলিয়া কোলাহল গিরিতে পতিত হইল; তাহার

মস্তক উত্তর দিকে রহিল ও পদ দক্ষিণে প্রসারিত হইল। তখন ব্রহ্মা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞশেষে দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, গয়াসুর যজ্ঞ-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে! তখন ব্রহ্মা যমকে বলিলেন, "তোমার গৃহ হইতে ধর্ম্মশিলা আনয়ন করিয়া উহার মস্তকোপরি সংস্থাপিত কর।" এই ধর্ম্মশিলা সমাগত ব্রহ্মার পূজার উদ্দেশ্যে স্বামীর পদসেবাবিরতা কোন ব্রাহ্মণীর পাষাণ দেহ। মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপিত হইলে ও দেবগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেও যখন গয়ার গতিরোধ হইল না, তখন ব্রহ্মা আবার বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু দেহোদ্ভূত মূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিলেন। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায় বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া আদি গদাধর রূপে গদাঘাতে গয়াসুরকে নিশ্চল করিয়া সকল দেবদেবীসহ ধর্ম্মশিলায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন গয়াসুর বলিল, "আমি নিষ্পাপ দেহ ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দিবার পর আমার প্রতি এ নির্য্যাতন কেন? আমি ত হরির আদেশেই নিশ্চল হইতাম। আমাকে কৃপা করুন।" দেবগণ গয়ার এই উক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে বলিল, "যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করুন; পঞ্চক্রোশব্যাপী এই ক্ষেত্র গয়াক্ষেত্র নামে কীর্ত্তিত হউক—ইহার এক ক্রোশ আমার মস্তক অবস্থান করিবে। আর এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বলোক যেন পূর্ব্বপুরুষসহ ব্রহ্মলোকে গমন করে।" গয়ার এই প্রার্থনা শুনিয়া বিষ্ণুসনাথ দেবগণ বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে ও পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধকারী স্বয়ং ও তাহার উর্দ্ধতন সাত পুরুষ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।"

কে এই পরম বৈষ্ণব গয়াসুর যাহার দেহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দেহাপেক্ষাও পবিত্র এবং যাহাকে নিশ্চল করিতে বিষ্ণুসনাথ সমগ্র দেবকুলের সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল? যিনি সব্যসাচী রূপে ভারতীয় প্রত্নতত্বে একদিকে প্রচলিত ভ্রান্ত মত বিনষ্ট করিয়া অন্য দিকে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—এই গয়াসুর প্রচলিত প্রবলবল বৌদ্ধধর্ম্ম; আর গয়াসুরবিজয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বায়ুপুরাণের গ্রন্থকার জটিল দার্শনিক তত্বের বিচার করিয়াছেন। তিনি কিরূপে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে গয়াসুরের বিরাট বপু স্থাপিত করিবার কল্পনা করিলেন? গয়াসুরের অপরাধ—সে

মুক্তির পথ অত্যন্ত সুগম করিয়াছিল। সে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পালন করিত না। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই লক্ষণ। বৌদ্ধগণ ধর্ম্মাত্মা, আত্ম-ত্যাগী ছিলেন। গয়াসুর বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহার দেহ ৫৭৬×২৬৮ মাইল। কলিঙ্গ হইতে হিমালয় ও মধ্য ভারত হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত যে ভূভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ইহার কিছু অধিক। দেবগণের গয়াসুর-দমনচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের দমনচেষ্টার রূপক; আর বিষ্ণুর গদাঘাত বৌদ্ধধর্ম্মনির্য্যাতন। গয়ার মস্তকে শিলাসংস্থাপন বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানে আঘাতের পরিচায়ক। আবার দেবতার আশীর্ব্বাদেই বৌদ্ধ গয়া হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। বুদ্ধের পদচিহ্ন গয়ায় সম্পূজিত। ভারতে আর কোন তীর্থে পদচিহ্নপূজা প্রচলিত নাই। আবার 'গয়া মাহাত্ম্যেই' বিষ্ণুকে বুদ্ধ আখ্যা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গয়ামাহাত্ম্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—পুণ্যকামী বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুমমূলে পূজা করিবেন। এই পূজার বিশেষ মন্ত্রও আছে,—"আমি চলদল, স্থিতি-কারণ, যজ্ঞ, বোধিসত্ত্ব অশ্বত্থকে নমস্কার করি। হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, তুমি রুদ্রগণমধ্যে একাদশ, বসুগণ মধ্যে পাবক, দেবগণমধ্যে নারায়ণ। নারায়ণ সর্ব্বদা তোমাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তুমি বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তুমি ধন্য ও দুঃস্বপ্নবিনাশন। আমি অশ্বত্থরূপী দেব—শঙ্খচক্রগদাধর, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃক্ষরূপধর হরিকে নমস্কার করি।"

এত দিন পরে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মতপ্রকাশ সহজসাধ্য নহে। কারণ, রূপক কল্পিত—তাহা ক্রমেই অতিরঞ্জনে বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিশাল-বপু হইয়া উঠে। শেষে কি জন্য সে রূপকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তবে আমাদের পুরাণে রূপকের অভাব নাই। আর গয়ায় যে বৌদ্ধপ্রাধান্য প্রণষ্ট করিয়া হিন্দুপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। বুদ্ধ গয়ায় এমনও দেখা যায় যে, মন্দিরে সম্পূজিত প্রতিমার পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পঞ্চপাণ্ডব মন্দির তত প্রাচীন নহে। মন্দিরে কয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি ও মায়াদেবীর মূর্ত্তি আছে—ঐ গুলি পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী বলিয়া কথিত। প্রধান মন্দিরের নিকটে একটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। ইহা প্রধান মন্দিরের আদর্শে গঠিত। উভয় মন্দিরের ইষ্টকও একইরূপ। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবী "তারা দেবী" নামে কীর্ত্তিতা; কিন্তু মূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি নহে—পরন্তু পদ্মপাণি

বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি। পরবর্ত্তীকালে হিন্দু মোহন্তগণ যে সকল মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন সে সকলে প্রধান মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যানুকরণযোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই মনে হয়, এ মন্দির প্রাচীন—বোধ হয় হিউয়েন্থ সাং সে সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন সে সকলের একটি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে তারার পূজা হইত। হয় ত এ মন্দির সেই তারার। সেই ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত মন্দির পরিশেষে হিন্দু তারা দেবীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হয় নাই। *

চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ গয়ায় গিয়াছিলেন। তখন নগর যেন "পরিত্যক্ত ও নিরানন্দ।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তৎপূর্ব্বেই বুদ্ধ গয়া হিন্দুর অধিকারে আসিয়াছে। তাহার পর ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাংও দেখেন,—বুদ্ধ গয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিকৃত—একই ঋষিবংশীয় সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইঁহারা বোধ হয় গয়ালী। গয়ালীরা আপনাদিগকে ব্রহ্মাসৃষ্ট পুরোহিতের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইঁহাদিগের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। কারণ, ইঁহারা অন্য পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন ঘৃণার্হ বিবেচনা করিয়া স্বজনমধ্যেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ বিবাহে বংশবৃদ্ধি হয় না। মিশরের পুরাকালীন রাজবংশেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে বুদ্ধ গয়া কতকাল পূর্ব্বে হিন্দুর হস্তগত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। হিউয়েন্থ সাংএর আগমনের পূর্ব্বেই যে বুদ্ধ গয়ার সমৃদ্ধিসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনহেতু বজ্রাসন বালুকায় ও মৃত্তিকায় আবৃত হইয়াছে। উহা আর দৃষ্ট হয় না।—বাস্তবিক কোন প্রকৃতিক পরিবর্ত্তনে ফল্গুর গর্ভ হইতে বালুকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়াছিল। সে বালুকাস্তর ২॥০ ফিট উচ্চ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধেও কিম্বদন্তী আছে।—এই স্থানে দশ সহস্র সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহারা দুশ্চিন্তাপীড়িত হইলে প্রত্যুষে উঠিয়া নদীনীরে যাইয়া আনন পর্য্যন্ত জলে অগ্রসর হইতেন ও নদীগর্ভ হইতে মুষ্টিমেয় বালুকাসংগ্রহ করিয়া একটি থলীতে রাখিতেন। তাহার পর তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া সমবেত সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার

* বৌদ্ধমতে তারার একবিংশ রূপ আছে।—Waddell—Buddhism of Tibet.

করিয়া ঐ বালুকা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ মাইল ব্যাপী বালুপ্রান্তর সৃষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে মন্দির-প্রাঙ্গণ বালুকায় ও মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শেষে ভারত গভর্মেণ্টের চেষ্টায় জেনারেল কানিংহামের নির্দ্দেশমত মিষ্টার বেগলার এই সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করিয়া মন্দিরের স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

কানিংহাম বলেন, যে স্থান বর্ত্তমানে বুদ্ধ গয়া নামে পরিচিত তাহা পূর্ব্বে মহাবোধি নামে পরিচিত ছিল। হিউয়েন্থ্ সাং মন্দিরকে মো-হো-পু-তি (মহাবোধি) এবং ঐ স্থানের বিহারকে মহাবোধি সঙ্ঘারাম বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সকল চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারাও ঐ নামই ব্যবহার করিয়াছেন। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা ধর্ম্মপালের শিলালিপিতেও ঐ নাম পাওয়া যায়। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা অশোকবল্লও ঐ নামের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৩৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সকল লিপিতেই ঐ নাম পাওয়া যায়।

যে বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করেন প্রথমে তাহাকেই বোধি বা মহাবোধি আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উইলমট এই স্থানে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হয়েন। উহা সার চার্লস উইলকিন্স কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'এ প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম অমরদেব কর্ত্তৃক কীটক প্রদেশে এই মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। এই শিলালিপির উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া বহু প্রত্নতাত্ত্বিক মন্দিরের কালনির্ণয়ে ভ্রম করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিতে 'বুদ্ধ গয়ার' উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের সময় বোধি নামই প্রচলিত ছিল এবং বরহতের ভগ্নাবশেষে (খৃঃ পূঃ ২০০) দেখা যায়—"ভগবতো শক মুনিনো বোধি"—লিখিত আছে। ইহার অর্থ—ভগবান শাক্যমুনির বোধিদ্রুম।

তাহার পর হিউয়েন্থ সাংএর সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক কাল 'মহাবোধি' নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। বৃক্ষের নাম—বোধিদ্রুম; বুদ্ধের আসনের নাম—বোধিমণ্ড; আসনোপরি নির্ম্মিত মন্দিরের নাম—মহাবোধি বিহার; আর নিকটবর্ত্তী বিহারের নাম—মহাবোধি সঙ্ঘারাম। আবার ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের লিপিতে স্পষ্টই দেখা যায়—

মনাবোধি-নিবাসীদিগের কল্যাণার্থ চতুর্ম্মুখ মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ হইতে বোধ হয়, উক্তবিম্ব বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক মহাবোধি নামে অভিহিত হইত। বুদ্ধগয়া নাম—গয়ার প্রাধান্যের পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হয়।

বোধিদ্রুমকে কেন্দ্র করিয়াই বুদ্ধ গয়ার প্রতিষ্ঠা। ইহারই ছায়ায় বসিয়া শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধদিগের নিকট ইহা পূজার যোগ্য। ইউয়েন্থ সাং এই বৃক্ষের কথায় বহুবিধ অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই বৃক্ষ পিপ্পল জাতীয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ইহা বহুশত ফিট উচ্চ হইয়াছিল। বহুবার ছেদিত হইলেও বর্ত্তমানে ইহা ৪০।৫০ ফিট উচ্চ। বুদ্ধ এই বৃক্ষতলে সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বোধি বলা হয়। ইহার কাণ্ডের বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত—শাখা ও পত্র কৃষ্ণাভ হরিৎ। হিমে বা নিদাঘে ইহার পত্র বৃন্তচ্যুত হয় না। তবে তথাগতের নির্ব্বাণ-সময় পত্রগুলি পড়িয়া গিয়াছিল। তখন বহু লোক আসিয়া বৃক্ষমূলে গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিল। তখন ইহার চতুর্দ্দিকে সঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল; দীপাবলি প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল। তথাগতের নির্ব্বাণলাভের পর ভ্রান্তমতে আস্থাবান নৃপতি অশোক সৈন্যসহ এই স্থানে আসিয়া বৃক্ষটিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্তূপাকার করেন। তাঁহার আদেশে একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নি নির্ব্বাণের পূর্ব্বেই শিখামণ্ডলমধ্যে পত্রবহুল দুইটি বৃক্ষের আবির্ভাবে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। অশোক এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া বৃক্ষের অবশিষ্ট মূলে সুগন্ধি দুগ্ধ প্রদান করেন। পর দিন প্রত্যুষেই বৃক্ষ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।* ইহাতে অশোক আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইলে তাঁহার পত্নী গোপনে লোক পাঠাইয়া মধ্যরাত্রির পর বৃক্ষচ্ছেদন করান। প্রভাতে অশোক বৃক্ষের পূজা করিতে আসিয়া ইহার এই অবস্থা দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া উপাসনা করিলে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হয়।

* সংপ্রতি পুরাবস্তু বিভাগের যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৮—৯ খৃষ্টাব্দ) তাহাতে ডাক্তার ব্লক বলেন, অশোক বৃক্ষপূজার বিরোধী ছিলেন এবং এরূপ পূজা নিন্দাই ও নিস্ফল মনে করিতেন। তাঁহার পক্ষে বৃক্ষচ্ছেদন অসম্ভব নহে। তিষ্যরক্ষিতার বৃক্ষনাশপ্রয়াস অশোকের কৃতকর্ম্ম গোপন করিবার উদ্দেশ্যে পরে রচিত।

রাজা প্রায় দশ ফিট উচ্চ বৃতি দিয়া বৃক্ষটি বেষ্টিত করিয়া দেন। এই বৃতি এখনও বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী কালে রাজা শশাঙ্ক ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া বহু বৌদ্ধবিহার ভগ্ন করেন ও বোধিদ্রুম ছেদন করেন। তিনি বোধিদ্রুমের মূলোৎপাটনোদ্দেশ্যে ভূমি খনন করান। খনিত ভূমিতে জল দেখা দিল—তথাপি সকল মূল উৎপাটিত হইল না দেখিয়া তিনি ঐ ভূমির উপর অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করান এবং ইক্ষুরস ও শর্করা ছড়াইয়া দেওয়ান। কয় মাস পরে মগধের রাজা অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণব্রহ্ম এই সংবাদ পাইয়া বহু বিলাপ করিয়া যে স্থানে বৃক্ষ দণ্ডায়মানছিল,তথায় পতিত হয়েন ও বহুসহস্র গাভীর দুগ্ধ ঢালিয়া দেন। এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ জন্মে। পাছে কেহ আবার বৃক্ষ ছেদন করে এই আশঙ্কায় তিনি ২৪ ফিট উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া বৃক্ষটি বেষ্টিত করান। তাই আজও বোধিদ্রুম ২০ ফিটের অধিক উচ্চ বৃতিবেষ্টিত।*

অশোকের বৃক্ষচ্ছেদনের কথা 'অশোকাবদানে' নাই। কিন্তু তাঁহার মহিষী তিষ্যরক্ষিতা কর্ত্তৃক বৃক্ষচ্ছেদনে কথা 'অশোকাবদানে' আছে। অশোক প্রথমা মহিষীর মৃত্যুর পর তিষ্যরক্ষিতাকে বিবাহ করেন। এই তিষ্যরক্ষিতাই সপত্নীপুত্র কুনালের প্রতি আসক্ত হয়েন এবং কুনাল কর্ত্তৃক তাঁহার পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে কুনালের চক্ষুরুৎপাটন করান। 'অশোকাবদানে' লিখিত আছে, অশোক বহুমূল্যরত্নাদি ও সুশোভন কুসুম বোধিদ্রুমের সজ্জায় ব্যবহার করেন দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশে রাণী এই বৃক্ষ নষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি চণ্ডাল রমণী মাতঙ্গীকে, সে যাহা চাহিবে তাহাই দিতে স্বীকৃতা হইয়া, তাঁহার সপত্নী এই বোধিদ্রুমের বিনাশকার্য্যে

---

* ডাক্তার ব্লক বলেন শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া বোধিদ্রুম নষ্ট করেন—ইহার প্রমাণ নাই। পূর্ণবর্ম্মার 'বর্ম্মা' উপাধি হইতে বোধ হয়, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। বুদ্ধগয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌখারী বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা কুমারগুপ্ত, দামোদরগুপ্ত ও মহাসেনগুপ্তের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধেরও প্রমাণ বিদ্যমান। প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থায় রাজ্যস্থিত মন্দিরের বা তীর্থস্থানের আয়ের একাংশ রাজার প্রাপ্য। সুতরাং বুদ্ধ গয়া যে মগধের রাজার আয়ের প্রশস্ত উপায় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে তাঁহার শত্রু মগধের রাজার অনিষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে বোধিদ্রুম নষ্ট করাই সঙ্গত।

নিয়োজিত করেন। মাতঙ্গী মন্ত্রপ্রভাবে বৃক্ষটিকে দগ্ধ করে। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার নিকটে বোধিদ্রুমের বিনাশবার্ত্তা নিবেদন করিলে অশোক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়েন। তাঁহার জ্ঞানসঞ্চারের পর তিনি বৃক্ষের জন্য বিলাপ করিতে থাকেন। তখন তিষ্যরক্ষিতা তাঁহাকে বলেন, "ইহাতে বিলাপ না করিয়া আমার সহিত সংসারের সুখ ভোগ করুন।" কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। তখন তিষ্যরক্ষিতার চৈতন্যোদয় হয় এবং তিনি পুনরায় মাতঙ্গীর সাহায্যে বৃক্ষটির পুনরুদ্ধার করান।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন বলেন, বৃক্ষটি সতেজ অবস্থায় বিদ্যমান; কিন্তু ইহার বয়স শত বর্ষের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কনিংহাম যখন বৃক্ষটিকে দেখেন তখন ইহা জরাগ্রস্ত—পশ্চিম পার্শ্বে তিনটি শাখা ব্যতীত আর সবই শুষ্ক। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃক্ষের অবশিষ্ট অংশ বাত্যাহত হইয়া নিপতিত হয়। আবার নূতন বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কানিংহামের বিশ্বাস পূর্ণব্রহ্ম (বর্ম্মা) কর্ত্তৃক বৃক্ষের পুনঃসংস্থাপন খৃষ্টীয় ৬০০ হইতে ৬২০ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হয়। তখন হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক শশাঙ্কের ক্ষমতানাশ সম্পন্ন হইয়াছে। কানিংহাম ও বেগলার উভয়েরই বিশ্বাস, প্রস্তরপ্রাচীর দিয়া বৃক্ষবেষ্টন ভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ মন্দিরের রোয়াকের উপর নূতন তরুর প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরের পাশ্চাদ্ভাগে যখন বজ্রাসন বাহির করা হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ষের চিহ্ন পাইবার আশায় কানিংহাম বজ্রাসনের পশ্চিমে ভূমি খনন করান। আসনের পদতল হইতে ৩ ফিট ও পরবর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে ৩০ ফিট নিম্নে তিনি প্রাচীন পিপ্পল বৃক্ষের দুই খণ্ড অবশেষ পাইয়াছিলেন। একটি ৪ইঞ্চ ও অপরটি ৬।॰ ইঞ্চ মাত্র। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের পোস্ত দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক কাল এই স্থানে বিদ্যমান। তাই অনুমান হয়, এই দুইখণ্ড ৬০০ হইতে ৬২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বোধিদ্রুমের ধ্বংসাবশেষ।

বাস্তবিক এই স্থানের বৃক্ষ যে কতবার বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। তারানাথ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে "পশ্চিম প্রদেশের রাজা" হুনিমন্ত কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মন্দির বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বোধিদ্রুম যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না। কানিংহামের বিশ্বাস, এই হুনিমন্ত হয় ত হুণরাজা মিহিরকুল। ইহার পর

হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে বৃক্ষবিনাশের প্রমাণ নাই। তখন বহু সিংহলীয় পরিব্রাজক বুদ্ধ গয়ায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বোধিদ্রুমের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৭০০ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের বিনাশ না হইয়া থাকিলে পালরাজাদিগের রাজত্বাবসান পর্য্যন্ত ইহার কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই বৌদ্ধরাজগণ অনুমান ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্বারম্ভ করেন। তখন হইতে ১২০১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের বিনাশ সম্ভবপর নহে। তবে মুসলমানগণ যখন পেশোয়ারে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিনষ্ট করে নাই, তখন সম্ভবতঃ মহাবোধির বোধিদ্রুমও রক্ষা পাইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশীয় প্রচলিত বিবরণে দেখা যায়, রাজা পসেনদী (প্রসেনজিৎ) দুই প্রস্ত প্রাচীরে বোধিদ্রুম পরিবেষ্টিত করান; ধর্ম্মাশোক আর একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। এ কথা সত্য হইলে মনে হয়—প্রসেনজিতের প্রাচীর কাষ্ঠ বৃতিমাত্র। তাঁহার সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী পরে অশোক যখন সিংহাসনারূঢ় হয়েন তখন সে বৃত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। অশোক কর্ত্তৃক বোধিদ্রুমের পূর্ব্ব পার্শ্বে বিহার নির্ম্মাণকালে এই বৃতি উন্মূলিত হইয়াছিল।

পিপ্পল তরু দ্রুতবর্দ্ধনশীল ও অল্পকালজীবী। তাই অনুমান হয়, অশোকের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় ক্রমে ক্রমে বিংশটি বৃক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ষের স্থান অধিকৃত করিয়াছে। ক্রমের পর ক্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাক্যসিংহের সম্বোধিলাভের পূত ভূমিকে ছায়াসুশীতল করিয়া আসিতেছে।

সনাতন ধর্ম্ম।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

এই বিশ্ব সুবিশাল পবিত্র মন্দির তাঁ'র,
নিরমল হৃদিখানি সকল তীর্থের দ্বার ;
অজর অমর হেথা সত্য শুদ্ধ চিরন্তন,
সৃজন পালন লয়ে বিকার নাহিক কোন।
মন যাহা 'লয় মানি' তাই ধর্ম্মমূলাধার,
প্রীতি মর জগতের সকল সাধনসার।
স্বার্থ গেলে মন হ'তে বৈরাগ্য উপজে তথা
এই ধর্ম্ম সনাতন জেন মনে সার কথা।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতে বৈদ্যনাথে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

"জন্মিলে মরিতে হ'বে . অমর কে কোথা র'বে;
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে?"

কিন্তু যখন বার্দ্ধক্যের বহু পূর্ব্বে কর্ম্মবহুল জীবনের আরব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া কোন কর্ম্মবীরের তিরোভাব হয়, তখন শোক আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ করে। সখারামের মৃত্যুতে আমরা কেবল যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালা লেখক হারাইয়াছি তাহা নহে। আমাদের আশঙ্কা হয়, বুঝি বা যে চিতায় সখারামের শবদাহ হইয়াছিল সেই চিতাগ্নিশিখায় মহারাষ্ট্রের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও ভস্মসাৎ হইয়াছে।

সখারাম মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ'র সহিত নাগপুরের রঘুজী ভোঁশ্লার যে সন্ধি হয় তাহার সর্ত্ত অনুসারে নবাব বাঙ্গালার চৌথ হিসাবে উড়িষ্যা প্রদেশ রঘুজীকে দেন। সেই সময় কৃষ্ণভট্ট রায়কর রঘুজীর দূতরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া কিছু দিন মুর্শীদাবাদে বাস করেন। এই সময় নবাব কোন কারণে বীরভূমির শাসনকর্ত্তা বাদিয়াৎ জামা খাঁ'র উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েন। বাদিয়াৎ জামা খাঁ কৃষ্ণভট্টের সাহায্যে নবাবের কোপানল হইতে অব্যাহিত লাভ করিয়া তাঁহাকে বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী করোঁ গ্রাম জায়গীর দেন। কৃষ্ণভট্ট তদবধি করোঁতেই বাস করেন। সখারামের পিতামহ এই রায়কর পরিবারে বিবাহ করিয়া কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুক পাইয়া করোঁগ্রামেই আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গালা সখারামের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথে সখারামে সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তখন সখারাম দেওঘর স্কুলের ছাত্র—মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্র বাবু স্কুলের হেড মাষ্টার। তাহার চারি বৎসর পরে আমি আবার দেওঘরে গমন করি। তখন সখারাম স্কুলে শিক্ষক। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ তখনই আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসুমহাশয় পরম ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিসী

আর্য্যাবর্ত্ত



স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর।

লোক ছিলেন। সখারাম নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই মজলিসে সখারামের সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়।

এই সময় আমার কোন আত্মীয় 'প্রতিভা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পত্রখানি বর্ষমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। আমি তাহার লেখক, সখারামও অন্যতম লেখক। তখনও সখারামের বাঙ্গালা রচনার "আড়" ভাঙ্গে নাই। কিন্তু একাগ্র সাধনার ফলে তিনি অল্পকালমধ্যেই বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে প্রধান লেখকদিগের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিলেন। সখারামের সকল কার্য্যেই এই একাগ্র সাধনা সপ্রকাশ।

ইহার পর অদৃষ্ট চক্রের অতর্কিত আবর্ত্তন সখারামকে দেওঘরের নিভৃত নিবাস হইতে কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় আনিয়া শিক্ষকের শান্তিস্নিগ্ধ কার্য্য হইতে সর্ব্বগ্রাসী সংবাদ-পত্রসেবায় নিযুক্ত করে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি "আদর্শ সংবাদ পত্র" 'হিতবাদীর' পরিচালনে অসক্ত হইয়া তখন তাহার ভার ত্যাগ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তখন 'হিতবাদীর' ভার লইয়াছেন। বিশারদ অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। মিষ্টার হার্ড তখন দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ও সখারাম দুইজনেরই বাঙ্গালা লেখক "অপবাদ" ছিল। তাই দুইজনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সখারাম 'হিতবাদীতে' লিখিয়াছিলেন সেই সন্দেহে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বিশারদ তাঁহাকে 'হিতবাদীতে' চাকরী দিলেন। সখারাম সংবাদপত্রসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বিস্ময়কর একাগ্রতার ফলে তিনি ক্ষমতাশালী সম্পাদক, ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাতৎপর বিশারদের জীবনের শেষ সময় তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে—"তৃষ্ণা জুড়ায় যা'র জলে" তাঁহার সেই জন্মভূমি হইতে দূরে বারিধিবক্ষে বিশারদের মৃত্যুর পর সখারাম 'হিতবাদীর' কর্ণধার নিযুক্ত হয়েন। তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন—দলাদলির বাত্যায়—রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গতাড়নে তিনি কিরূপ নিপুণতাসহকারে 'হিতবাদী' পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মধ্যে একবার 'হিতবাদীর সহিত'

তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সে বিচ্ছেদও সখারামের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সুরাটে কন্‌গ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। 'হিতবাদী'র কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তিলকপ্রমুখ ব্যক্তিদিগকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন। সখারামের বিশ্বাস অন্যরূপ। তাই তিনি বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যত্যাগ করিলেন। দরিদ্রের পক্ষে এ কার্য্য সহজ নহে।

বাস্তবিক সখারামের সমস্ত জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম।

প্রতিকূল অবস্থাহেতু তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রম করিতে হইত। সংবাদপত্র সেবার বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। 'এটা কোন্ যুগ ?' ব্যতীত তাঁহার আর সকল পুস্তকই এইরূপ অবসরকালে লিখিত। পুস্তক ব্যতীত তিনি গত বিংশবর্ষ কালে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। সাময়িক সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইয়া সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। তিনি 'সাহিত্য' পত্রে "মহারাষ্ট্র সাহিত্যে" মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যিক ভাব বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ইতিহাস বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। 'আর্য্যাবর্ত্ত' প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি লিখিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাজীরাও যখন নর্ম্মদার কূলে পানিপথযুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন তাঁহার সেনাদল এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনে। সে দাক্ষিণাত্যে আওরাঙ্গাবাদের কোন মহাজনের দিল্লীস্থ গদি হইতে মহারাষ্ট্রবাহিনীর বিনাশবার্ত্তা লইয়া যাইতেছিলেন। তাহার নিকট বাজীরাও প্রথম আপনার সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়াছিলেন। গ্র্যাণ্ট ডাফ লিখিত ইতিহাসপাঠক সে কথা অবগত আছেন। আমি তাঁহাকে সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলাম। তাহার পর টেব্‌লে একখানি 'হিন্দুস্থান রিভিউ' দেখিয়া সখারাম তাহা তুলিয়া লইলেন। তাহাতে মস্তানীসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া সখারাম বলিলেন, "আমি বাজীরাওয়ের কলঙ্ক মোচন করিব।" দুই তিন দিন পরে তিনি 'আর্য্যাবর্ত্তের' প্রথম সংখ্যার জন্য "বাজীরাও ও মস্তানী" নামক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। শিবাজীর একখানি বিস্তৃত চরিত রচনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সে জন্য তিনি বহুদিন ধরিয়া বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থরচনা

হয় নাই। তিনি তাঁহার সেই ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কাহারও দ্বারা সেই উপহৃত উপাদানসাহায্যে বাঙ্গালায় শিবাজীচরিত রচিত হইবে কি না, তাহাও জানি না।

কিন্তু কেবল মহারাষ্ট্র ইতিহাস অধ্যয়নে নহে—সকল বিষয়ের অধ্যয়নেই তাঁহার শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা তাঁহাকে যত্নসহকারে উপাদানসংগ্রহে প্রবৃত্ত করাইত। তিনি বিনাপ্রমাণে কোন কথা বলিতেন না; তাই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। তাঁহার 'দেশের কথায়' এই শ্রমশীলতার পরিচয় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তিনি কিরূপ যত্নসহকারে উপাদান সংগ্রহ করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—সখারাম যখনই আমার গৃহে আসিতেন তখনই টেব্‌লের উপর নূতন পুস্তকগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেন। একবার তিনি সার ফ্রেডরিক ট্রীভসের The Other Side of the Lantern দেখিয়া পুস্তকখানি কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, উহা ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাহার পর পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া নামকরণের কারণ দেখাইয়া দিয়া আমি বলিলাম, ইহাতে "দেশের কথা" আছে;—গ্রন্থকার ভারতের দারিদ্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে এক দিন সখারাম আসিয়া বলিলেন, 'দেশের কথা'র নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে—সার ফ্রেডরিক ট্রিভসের উক্তিটুকু লিখিয়া দিতে হইবে। সার ফ্রেডরিকের উক্তি 'দেশের কথার' অঙ্গীভূত হইল। বাস্তবিক 'দেশের কথায়' তিনি অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনে 'দেশের কথার' আদর হয় নাই। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে পুস্তকখানির সমালোচনা করিবার জন্য অনুরোধকালে সখারাম বলিয়াছিলেন—অনেকে পাঠাগার প্রভৃতির জন্য বিনামূল্যে পুস্তক প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু তিনি ছাপাখানার ও কাগজের দেনা শোধ করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর এ পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হয়;—সন ১৩১১ সাল হইতে সন ১৩১৪ সাল—এই চারি বৎসরে 'দেশের কথা' চারি সংস্করণে ১০০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। তাহার পর সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পুস্তকের প্রচার যত বাড়িতে লাগিল শিক্ষাব্রত সখারাম তাহার মূল্য তত কমাইতে লাগিলেন। কাযেই ইহাতে তাঁহার অধিক আর্থিক লাভ হয় নাই।

'এটা কোন্ যুগ ?' ও 'দেশের কথা' ব্যতীত সখারাম আর পাঁচখানি পুস্তক প্রচার করেন—'ঝান্সির রাজকুমার' 'তিলকের মোকদ্দমা' 'মহামতি

রানাড়ে', 'বাজীরাও' 'আনন্দী বাই'। 'তিলকের মোকদ্দামার' প্রচারও বন্ধ হয়। 'বাজীরাও' পুস্তকের পুনঃপ্রচারও তিনি বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

সখারাম বাঙ্গালীকে মহারষ্ট্রের কথা বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রথমবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বঙ্গবাসী যে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সখারামের চেষ্টার বিষয় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। তাহার কারণ, তিনি কায করিতেই ভালবাসিতেন; কোন অনুষ্ঠানেই আপনাকে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেন না। মুসলমান ইতিহাসে শিবাজীর যে চিত্রিত চিত্রিত হইয়াছে সখারাম তাহা বিকৃত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, শিবাজী, তুমি যখন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে "এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে" বাঁধিতে চাহিয়াছিলে—

"সে দিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা।"

তাহার পর—

"এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"—ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি!
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি?"

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে শিবাজীর জয়ভেরি ধ্বনিত করিয়াছিলেন—বৈদ্যনাথের নদীকূলে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু শিবাজী উৎসবে তাঁহার চেষ্টা কয়জন অবগত আছেন?

বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে রানাডেপ্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত

তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না; আর ম্যান্‌চেষ্টারে উৎপন্ন মিহি বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্তা বঙ্গাঙ্গনার পক্ষে সে কাপড় ভিজিলে টানা দায় হইত। সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। আপনার মতমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সখারামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার উপর তিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি নানারূপে বিপন্ন হইতে থাকেন। 'হিতবাদী'র সহিত সংশ্রবত্যাগের পর তিনি "জাতীয় শিক্ষাপরিষদে" অধ্যাপনা করিতেছিলেন। কিন্তু সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দামা' পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে "জাতীয় শিক্ষাপরিষদের" শঙ্কিত কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিলেন।

এই সময় হইতে তিনি আর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়েন নাই। সাময়িক সাহিত্যেও আর তাঁহার অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার পর বিধাতার বজ্র সখারামের দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত পুত্রশোককাতর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল; তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল।

ভগ্নস্বাস্থ্য সখারাম হৃতপল্লব রিক্তশাখ তরুর দশাগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য শঙ্কিত হইলেন। সে আশঙ্কা অতি অল্প দিনেই সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সখারামের মত দুর্ভাগ্য কাহার? তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে সাহিত্যে তাঁহার স্থায়ী চিহ্ন থাকিল কোথায়? সংবাদপত্রের রচনায় যতই প্রতিভাস্ফুরণ থাকুক না কেন, তাহার স্থায়ীত্ব-সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল—'দেশের কথা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে। যে শ্রমশীলতা প্রতিভার স্ফুরণে প্রধান সহায় সেই শ্রমশীলতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যদুঃখে তিনি স্বাধীনভাবে রচনার যথেষ্ট অবকাশ পায়েন নাই। তাঁহার জীবনসাধন শিবাজীচরিত রচিত হয় নাই। তিনি সংসারে সম্পদ লাভ করেন নাই; শোকের পর শোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল।

সব গেল—রহিল কেবল বন্ধুজনের চিত্তে তাঁহার পুণ্য স্মৃতি।—সে স্মৃতি মুছিবার নহে। তাঁহার আন্তরিকতা—তেজস্বিতা ভুলিবার নহে। রোগের

কণ্টকশয়নে তিনি শোকবিক্ষত হৃদয়ে যে শান্তির কামনা করিয়াছিলেন, আশা করি, মৃত্যুর পরপারে তিনি সেই শান্তি লাভ করিয়াছেন।—

"তাই হোক হোক! নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
ধরা দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা!
লহ লহ, বন্ধু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!"

যবন হরিদাস।

ক্রুদ্ধ বাদশা দেখি' হরিদাসে—হইয়া মুসলমান্
কাফের হিন্দু তাহার ধর্ম্মে করিল আত্মদান?
ঘৃণিত হিন্দু গোলামের জাতি তা'দের আবার ধর্ম্ম?
তাই কিনা শেষে করিল বরণ; যবনের এই কর্ম্ম?
ডাকিয়া বাদশা মূঢ় হরিদাসে দিলা এ সদুপদেশ,
"এখনও ছাড় দুর্ম্মতি হেন, ঘুচাও কাফের বেশ।
"তা'নহিলে তোমা দুর্গতি বহু সহিতে হইবে শুন,
"মুসল্‌মানের পূত ধর্ম্মে দীক্ষা লওগে পুনঃ!
"অভাব তোমার ঘুচাইব আমি, রাখ আমাদের মান
"বাদ্‌শার জাতি, গৌরব কত, কেন লহ অপমান?"
ধীরে ধীরে কহে পরম ভক্ত। "ক্ষমা কর মোরে প্রভু
"অমৃতের স্বাদ পেয়েছি হেথায় ছাড়িতে নারিব কভু।
"তুমি কি বুঝিবে অভাব আমার? পারিবে না দিতে তাহা
"ভাণ্ডারে তব নাহি সে রত্ন জান নাও তুমি যাহা।

"একটি বিন্দু পাও যদি তা'র তুমিও দেখিবে তবে
"দীন্ দুনিয়ার বাদ্‌শাহগিরি চরণে পড়িয়া র'বে।
"কোরান্ পুরাণ নহেত ভিন্ন, খোদা হরি দুই নয়
"ভক্ত সে জানে গঙ্গা যমুনা সিন্ধুতে এক হয়।
"চরমের সেই এক—শুধু এক পরম পুরুষ হরি।
"কেন তবে মিছে যাপিতেছ কাল মিথ্যা কলহ করি'?
শুনিয়া বাদ্‌শা অজ্ঞান ক্রোধে আদেশিলা দাসগণে
"বাইশ বাজারে প্রহারে প্রহারে শিক্ষা দাও এ জনে।
"মারিতে মারিতে হয় যেন শেষ ভণ্ডের হরিভজা
"বাঁচাক্ আসিয়া দেবতা উহার, দেখুক্ কেমন মজা!"
বাদ্‌শা আজ্ঞা রক্ষা করিতে ছুটিল লক্ষ দাস
শ্রোতৃবৃন্দ চমকি উঠিল পাইল বিষম ত্রাস।
জল্লাদ সেও পালিতে আজ্ঞা ফেলিল দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যু আদেশে অটল কিন্তু নির্ভীক হরিদাস!!
প্রহার দেখিয়া দর্শকগণ শত্রুমিত্র সবে
"আর না আর না মেরো না সেপাই" বলিছে উচ্চ রবে।
ধরণীর ধূলা রক্তেতে কাদা, প্রসন্ন বদন হরি—
পীড়কের তরে আশীষ মাগিছে হাত দু'টি যোড় করি'।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-চক্র।

—:•:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•—

চিন্তারম্ভ।

—•—

ধরণীধর চলিয়া যাইলে যতীশ গৃহে আসিল, উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবে। পূর্ব্বে সে কখনও অর্থের অভাব অনুভব করে নাই। তাহার ব্যয় অল্প ছিল—সে পিতার নিকট ও পিতামহীর নিকট হইতে আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ পাইত। এখন ব্যয় বাড়িয়াছে—অথচ আয়ের পথ রুদ্ধ। সে যখন পিতার অবাধ্য হইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়াছিল তখন হইতে তাহার ব্যয় কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। একবার বাসা করিয়া সে আর 'মেসে' ফিরিয়া যাইতে পারিল না। বাসা রহিল—ব্যয়বাহুল্য চলিতে লাগিল। অমূল্যচরণ তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিত—প্রাপ্ত অর্থের সম্পূর্ণ ভাগ যতীশচন্দ্রের হস্তগত হইত না। উপস্থিত প্রয়োজন—ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ শোধের আশা সমুজ্জল। এ অবস্থায় যতীশও ঋণ করিত। ঋণের মত রক্তশোষী শত্রু আর নাই। সে কখন যে আসিয়া সুপ্ত মানবের বক্ষে বসিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। শেষে যখন সে জাগিয়া আপনার অবস্থা উপলব্ধি করে—তখন তাহার দেহ বলশূন্য—সে নিরুপায়। সংসারজ্ঞানহীন যুবক যখন ভবিষ্যতে উপার্জ্জনের আশায় উৎসাহিত হইয়া ঋণজালে জড়িত হয়, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে, হয় ত জীবনে সে আর সে জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; এই বন্ধন তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির গতিরোধ করিবে, তাহার সকল আশা বিনাশের কারণ হইবে। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল।

আপনার প্রতিভা সম্বন্ধে তাহার ভ্রান্ত ধারণা তাহার যুবজনসুলভ আশা আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। সে যে সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে

পারিবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। আঘাতের পর আঘাতে তাহার আশার ঔজ্জ্বল্য মলিন হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও সে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হিসাবে তাহার মত বিদ্বান' সামান্য বেতনে কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত। যতীশচন্দ্র তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিত; বুঝিত না—সেও তাহাদেরই একজন।

ক্রমে সংসারে অস্বচ্ছলতা যত বাড়িতে লাগিল যতীশচন্দ্র ততই বিপন্ন ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল। স্বচ্ছলতার সময়—সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিবার পূর্ব্বে—যখন জীবনে অস্বচ্ছলতার সম্ভবনা কল্পনাও করা যায় না তখন স্বাবলম্বনের প্রশংসা করা অতি সহজসাধ্য। কিন্তু স্বাবলম্বন সর্ব্বথা সুখের নহে। তাহার জন্য যে সাধনার ও যে সংযমের প্রয়োজন, যতীশচন্দ্র সে সাধনা-পরাঙ্মুখ—সে সংযমে অনভ্যস্ত। এ অবস্থায় সে পিতাকে পত্র লিখিবার সময় স্বাবলম্বনের যে সুরম্য মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিল—কার্য্যকালে তাহা দেখিতে পাইল না। তাই সে চিন্তিত হইল—কিছু ভীতও যে না হইল এমন নহে।

উপস্থিত প্রয়োজনের প্রাবল্যহেতু যতীশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিল। তাহার সে উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। তাহার অর্থাভাব জানিয়া স্নেহশীলা পিতামহী তাহাকে কিছু অর্থ দিলেন। সে অর্থে দিন কয়েক চলিবে; কিন্তু তাহার পর? যতীশচন্দ্র তাহা ভাবিল, ভাবিয়া পিতামহীকে বলিল, "তুমি একাকী এই স্থানে থাকিয়া কায নাই। কলিকাতায় ত বাসা রহিয়াছে; তুমি চল।" পিতামহী বলিলেন, "বুড়া বয়সে কি আর এ ভিটা ছাড়িয়া যাইতে পারি? আমি যাইলে বার ভূতে সব লুটিয়া খাইবে। বাড়ীখানিও নষ্ট হইবে। আর কলিকাতায় যাইয়া কি আমি থাকিতে পারি? তোর বয়স আমি কলিকাতায় যাই নাই। সেবার কালীঘাটে গিয়াছিলাম। কলিকাতা কি অপরিষ্কার, কি দুর্গন্ধ! এই স্থানেই গঙ্গাতীরে থাকি। তুই আর কেন কলিকাতায় থাকিস্? কেবল কষ্ট। তুই ফিরিয়া আয়। আমি বৌদিদিকে আনাই। তোর বাপকেও পত্র লিখি। সে কি তোর উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে? আমি পত্র লিখিলেই সে ফিরিয়া আসিবে। কি বলিস্?"

পিতামহীর প্রস্তাব যে সাধু যতীশ তাহা বুঝিল; বুঝিবার বিশেষ

কারণও ছিল—তাহার যে অবস্থা তাহাতে এ প্রস্তাব প্রলোভনীয়। কিন্তু? কিন্তু পিতার নিকট স্বাবলম্বনের অত কথা বলিয়া—আপনি আপনার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসা করিয়া—পত্নীকে আনিতে চাহিয়া আজ সে কি বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে? অমূল্যচরণ তাহার সব কথা জানে; সে কি ভাবিবে? তাহার নিকট সে কি করিয়া মুখ দেখাইবে? যতীশ কিছু স্থির করিতে পারিল না; বলিল, "আমি আবার আসিয়া বলিব।"

পিতামহী বলিলেন, "আমি বৌদিদিকে আনিতে পাঠাইতেছি।"

যতীশ বলিল, "আমি ফিরিয়া আসি। তখন যাহা হয় করিও।"

যতীশচন্দ্র চলিয়া গেল। উপস্থিত অভাবমোচনের উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে—কিছু দিন অভাবের দংশন হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে। তাহাই সে যথেষ্ট লাভ মনে করিল।

কলিকাতায় আসিয়া সে আবার পরিচিত জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হইল; অমূল্যচরণের অসার উপদেশে কুপথে চালিত হইতে লাগিল। পল্লীভবনে পিতামহীর সেই প্রস্তাবের কথা সে ভুলিতে লাগিল। যখন তাহা মনে পড়িত, তখন সে ভাবিত—সে যত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই। উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—উদ্ধত গর্ব্বে মনে করে, তাহার ফিরিবার পথ রুদ্ধ। সে ভুলিয়া যায়, ফিরিবার পথ রুদ্ধ হয় না; যে পথ স্নেহকুসুমাবৃত—প্রেমবারিসেচিত—শতস্মৃতিছায়াস্নিগ্ধ—সে পথ তাহারই প্রত্যাবর্ত্তনপ্রতীক্ষায় থাকে। ফুল মলিন হয়, বারি শুকাইয়া যায়, ছায়া আর থাকে না—তখনও সে পথে তাহার গমনাধিকার থাকে। এই কথা ভুলিয়াই সে দুঃখ ভোগ করে।

সে আর সব ভুলিল; কিন্তু শ্বশুরালয় হইতে পত্নীকে আনিতে যাইয়া সে যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিতে পারিল না।

হিন্দুর সংসারে সমষ্টিই সমাজের উপাদান। হিন্দু পরিবার অনেকের মিলন ক্ষেত্র; তাই হিন্দু পরিবারের গঠন স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। সে পরিবারে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে—পুত্রবধূ অল্প বয়সে পরিবারে প্রবেশ করিয়া সেই পরিবারের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্তা হয়—সে পরিবারের বিশেষত্বে শিক্ষিতা হয়; ক্রমে সে যখন শাশুড়ীর স্থান অধিকার করে তখন সে সে সংসারের অঙ্গীভূতা। বধূ

হইতে গৃহিণীতে পরিণতি এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হইয়া যায় যে, কেহ তাহা বুঝিতেও পারে না, সংসারেও কাহারও অভাব হয় না; শাশুড়ী সংসারের ভার পুত্রবধূর উপর দিয়া পৌত্রপৌত্রী লইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্ন যাপন করেন—শেষে যে দিন তিনি মহাযাত্রা করেন সে দিন সংসারের যন্ত্রচালনের কোনই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। প্রতীচ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় ব্যক্তিই সমাজের উপাদান। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতাইয়া বসে—সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই যে সংসারে সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে সংসারে আর তাহার স্থান হয় না। প্রাতীচ্য উপন্যাস পাঠ করিলে প্রতীচ্য সমাজের যে আদর্শ আমাদের মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়,—তাহাতে বোধ হয় যেন জগতে মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই—আছে কেবল নায়ক আর নায়িকা। প্রতীচ্য গ্রন্থকার সেই নায়কনায়িকার প্রেমকে পুস্তকের ভিত্তি করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, বিরহমিলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ণনার ধারাটিতে প্রবাহিত করিয়া লয়েন—সেই নায়কনায়িকার সংসারের—সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরিবারের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার বক্তব্যও সীমাবদ্ধ হয়। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। একে স্বার্থকতা উদার আত্মত্যাগে, অপরে স্বার্থকতা সঙ্কীর্ণ আত্মোন্নতিতে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যখন প্রতীচ্য উপন্যাসে প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাব দেখে, তখন সে অনেক সময় তাহাতে আকৃষ্ট হয়। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। যে শতাধিক উপন্যাসের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সমাজ দর্শন করে, সে কি কখন সমাজের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে? সে কল্পনায় বাস্তবের স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে—উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রপূর্ণ জগতে বাস করে। যতীশচন্দ্র পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শে পত্নীর কল্পনা করিয়াছিল। তাই সে সরোজার ব্রীড়াসঙ্কুচিত ব্যবহারে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। আর তাই সরোজা তাহার সহিত না আসায় সে তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে ক্রোধ অক্ষমের ক্রোধ—তাহা নিরপরাধের উপর নিপতিত হয়। সে যে সমাজে জন্মিয়াছে সে সমাজে যে হিন্দুকন্যার পক্ষে পিতৃগৃহে পিতার আদেশ বা অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করা অসম্ভব, সে তাহা বুঝিল না। সে কেবল মনে করিল—কেন সরোজা সব ত্যাগ করিয়া—তাহার সহিত আসিল না?

সে এ বিষয়ে অমূল্যচরণের পরামর্শ লইল। অমূল্যচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া অনুকূল পরামর্শ দিল। ফলে সে পত্নীকে আর একখানি পত্র লিখিল। তাহাতে সে লিখিল, যদি সরোজা পত্র পাইয়া তাহার নিকট চলিয়া না আইসে তবে তাহার সহিত সে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে।

এই পত্র পাইয়া সরোজা কাঁদিল; পত্র বিরজাকে দেখাইল। বিরজা পিতাকে পত্রের কথা বলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উন্মাদের প্রলাপ! তবে দেখিতেছি, সরোজার কপালে সুখ নাই। কি জানি চঞ্চল-চিত্ত যুবক কি করিয়া বসে! কিন্তু সরোজা কি আপনি যাইবে? আর যাইবে কোথায়? শ্বশুরালয়ে হয়—আমি পাঠাইয়া দিব। কলিকাতায়—অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কেমন করিয়া থাকিবে?" বিরজা বলিল, "যতীশ যখন তাহা বুঝিল না, তখন আর আমরা কি করিব? সে যাহা ভাল বুঝে সরোজাকে ত তাহা করিতেই হইবে!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এ বড় সমস্যা। আমি বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করেন—সেইরূপ হইবে।" তিনি ধরণীধরকে পত্র লিখিলেন।

ধরণীধর বৈবাহিকের পত্র পাইলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নে কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সরোজা স্বামীর পত্র হস্তে লইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল; মনে মনে বলিল, হে আমার দেবতা, হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি কোন্ অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী যে তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। কিন্তু কোন উপায়ে আমি তোমার কাছে যাইব? তুমি আমাকে লইয়া যাও। তোমার নিকট থাকিলেই আমি জীবন স্বার্থক মনে করিব। তাহার পর সে বাক্স খুলিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিল। মনের এই কথা পত্রে লিখিল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই অশ্রুপাতহেতু সে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না;—অক্ষরগুলি বড় অসমান—ছত্রগুলি আঁকা বাঁকা হইতেছিল; অশ্রুপাতে অক্ষরগুলি একান্তই অস্পষ্ট হইতেছিল।

সরোজা ভাবিল, এ পত্র কেমন করিয়া পাঠাইব? তিনি কি ভাবিবেন! তাহার পর যে আবেগে সে পত্র লিখিয়াছিল সে আবেগ একটু প্রশমিত

হইলে সে ভাবিল,—এ কি লিখিতেছি? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে একান্ত লজ্জাহীনা মনে করিবেন।

সে আরও ভাবিল, পিতার মত—শ্বশুরের অভিপ্রায়, এ সকল না জানিয়া—না বুঝিয়া সে কেমন করিয়া এরূপ পত্র লিখিবে?

ভাবনায় ভাবনা বাড়িল। সরোজা পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজের টুকরাগুলি বাতায়নপথে বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে আবার কাঁদিল।

—:*:—

নবম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন-শেষে।

আকাশ মেঘহীন—বায়ুমণ্ডল অনাবিল—প্রকৃতি প্রসন্নাননা। পূর্ব্ব গগনে দিবালোকবিকাশ শিশিরস্নাত প্রান্তরদৃশ্যে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়াছে। বসন্তাগমপ্রফুল্ল তরুর পত্রাগ্রে দোদুল্যমান শিশিরবিন্দু তরুণ রবিকরে হীরকের মত জ্বলিতেছে; তৃণদলে শিশিরবিন্দু—যেন দিবালোকভয়ত্রস্তা বিভাবরী চঞ্চলপদে গমনকালে ছিন্নসূত্র মুক্তাহারের মুক্তাগুলি ফেলিয়া গিয়াছে, তৃণ-পুষ্পে সঞ্চিত শিশির এখনও টল টল করিতেছে—যেন তরুণীর প্রেম এখনও অনাদরে—উপেক্ষায় শুকায় নাই। বসন্তের আরম্ভ—প্রান্তরে স্থানে স্থানে শিমুলের বিরাট বপু কোমল—মাংসল রক্ত পুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছে—যেন হরিৎ প্রান্তরে অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; আর কিছু দূরে একটি অনতি-উচ্চ স্তূপের উপর কয়টি পলাশ তরু গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম-শোভায় সুন্দর। চারিদিকে সৌন্দর্য্য—চারি দিকে বিহগবিরাব। প্রান্তরের পার্শ্বে নদী—নদীবক্ষে বালুকাবিস্তার—মধ্যে জলধারা। নদীর পরপারে গিরিশ্রেণী—রবিকরে পর্ব্বতাঙ্গে নানাবর্ণের বিকাশ লক্ষিত হইতেছে। একজন যুবক ও একজন যুবতী নিকটস্থ গ্রাম হইতে নদীতীরবর্ত্তী পথে আসিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। উভয়েই মুগ্ধনেত্রে প্রান্তরদৃশ্য দেখিল। উভয়েই আননে হর্ষদীপ্তি—সে হর্ষ প্রেম-সহচর—জীবনে তাহার স্বাদ যে পায় না সে দুর্ভাগ্য।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যুবতী শ্রান্তা হইয়াছিল। তাহার চামীকরতপ্তগৌর ললাটে স্বেদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। তাহার নিশ্বাস কিছু দ্রুত পড়িতেছিল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "চারু, চল একটু বিশ্রাম করিবে।"

যুবতী কোন কথা কহিল না। সে এই অভিনব সৌন্দর্য্যের রাজ্যে—অভি-

নব জীবনে স্বামীর প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে তাহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সে যুবকের সঙ্গে যাইয়া অদূরে নদীতীরস্থ একখণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিল, তাহার পর শালখানি খুলিয়া রাখিল। পত্নীকে বসাইয়া রাধাচরণ তাহার পার্শ্বে বসিল, সাদরে পত্নীর মুখ চুম্বন করিল। তাহাদের পদতলে তৃণগুলি রক্তাভ হরিদ্রা কুসুমে সজ্জিত—সম্মুখে নদীর শীর্ণ প্রবাহ প্রভাত পবনে বীচিবিক্ষুব্ধ—পশ্চাতে প্রান্তর হইতে প্রবাহিত পবনের স্পর্শ সুখদ। রাধাচরণ ও চারুশীলা মনে করিল, এই পৃথিবীই স্বর্গ।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াই রাধাচরণ পিসীমা'কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন সে আর চারুশীলা—আর কেহই নাই। তাহার মনে হইত, যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্ভার কেবল তাহাদেরই দুইজনের জন্য, জীবনের—যৌবনের অমৃতউৎস তাহাদেরই দুইজনের জন্য উৎসারিত।

সে প্রভাতে পত্নীকে লইয়া গ্রামের বাহিরে প্রান্তরে বেড়াইতে আসিত। তাহার পর আফিসের নির্দ্দিষ্ট কায কোনরূপে সম্পন্ন করিয়া বা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে অপরাহ্নে গৃহে আসিত। গৃহে আসিয়া সে আবার পত্নীকে লইয়া কোন দিন নদীর পরপারে—কোনদিন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে—কোন দিন বা গ্রামপ্রান্তস্থিত শালবনের দিকে বেড়াইতে যাইত। জীবনের যে সুধা যৌবন তাহাদের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিল তাহা তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে পান করিত—তবুও যেন পিপাসা মিটিত না।

আজ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতে লাগিল—গৃহে তাহারা এই সুখ হইতে বঞ্চিত ছিল! জীবনে যে সুখ প্রেমের দান—যাহাতে যুবক যুবতীর স্বাভাবিক অধিকার সমাজের ব্যবস্থায় তাহারা তাহা ভোগ করিতে পারে না—জীবন দুঃখময় করে। যে সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করে সে ব্যবস্থায় ধিক।

চারুশীলা মুগ্ধ হইয়া স্বামীর এই সব কথা শুনিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কত সময় কাটিয়া গেল কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না, শেষে চারুশীলা স্বামীকে বলিল, "চল বাড়ী যাই।"

রাধাচরণ ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা প্রায় নয়টা। সে উঠিল—দণ্ডায়মানা পত্নীর অঙ্গে শালখানি সযত্নে জড়াইয়া দিল। উভয়ে গৃহাভিমুখগামী হইল। আফিসের সময় হইয়া আসিতেছে; রাধাচরণ একটু দ্রুত চলিল। কিন্তু অল্প দূর যাইয়াই সে দেখিল, পথশ্রমে অনভ্যস্তা চারু-

শীলা শ্রান্ত হইয়াছে—তাহার কপালে স্বেদচিহ্ন—মুখে রক্তাভা।

তাহার মুগ্ধ নয়নে পত্নীকে যেন আরও সুন্দর দেখাইল। সে আবার পত্নীর মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার শ্রান্তি বোধ হইতেছে —তাহা কি বলিতে নাই?"

সে ধীরে চলিল। তাহারা নানা কথায় —নানা গল্পে হাসিতে হাসিতে গৃহে চলিল। যখন হৃদয় আনন্দে পূর্ণ থাকে তখন হাসির উৎস আপনি মুক্ত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা যে স্থানে পৌঁছিল সেই স্থানে রাস্তা ঘুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। সেই বাঁকের নিকট পথিপার্শ্বে একটি ঝোপে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল ফুটিয়া ছিল। চারুশীলা বলিল, "কি সুন্দর ফুল!" রাধাচরণ ফুল তুলিতে হাত বাড়াইল। সে জানিত না, গাছটি কণ্টকময়! তাহার করে কয়টি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া গেল। সে একগুচ্ছ ফুল তুলিয়া পত্নীকে দিল। ফুলে রক্তচিহ্ন দেখিয়া চারুশীলা বলিল, "একি?" সে দেখিল, স্বামীর হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। সে ফুল ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার জন্য তোমার এই কষ্ট।" রাধাচরণ বলিল, "কষ্ট কি? এ সামান্য একটু ছড়িয়া গিয়াছে।" চারু সযত্নে স্বামীর হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিল--কণ্টক বিদ্ধ হইয়া মাংসে গভীর ক্ষত হইয়াছে। সে রাধাচরণের রুমাল লইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটি কূপ। একজন কৃষক সেই কূপ হইতে জল তুলিতেছিল। চারুশীলা তাহার নিকট জল চাহিয়া লইয়া রুমাল ভিজাইয়া স্বামীর হস্তে জড়াইয়া দিল।

সে দিন রাধাচরণের আফিসে যাইতে বিলম্ব হইল। সে চিন্তিত হৃদয়ে আফিসে গেল—কারণ পূর্ব্বদিন সে কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া আসিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, পরদিন যাইয়াই সে কায শেষ করিয়া রাখিবে। কিন্তু আজ সে করতলে বেদনাহেতু কলম ধরিতে পারিতেছিল না।

আফিসে আসিয়াই রাধাচরণ শুনিল, 'সাহেব' তাহাকে ডাকিয়াছেন। সে সশঙ্কিত চিত্তে 'সাহেবের' নিকট গেল। "সাহেব' সেলামবিমুখ বাঙ্গালী কেরাণীর উপর বড় প্রসন্ন ছিলেন না; তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়াছ।"

রাধাচরণ কোন উত্তর দিল না।

"তোমার আসিতে প্রায়ই বিলম্ব হয়।"

রাধাচরণ বলিল, "মধ্যে মধ্যে হয়?"

"কাল যে কায দিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে?"

যে অভাবের তাড়নায় লোক সময় সময় সত্য গোপন করিবার জন্য অসত্যের আশ্রয় লয়—রাধাচরণ সে অভাবপীড়িত নহে। সে অসত্যে অভ্যস্ত নহে। সে বলিল, "না।"

প্রশ্ন হইল, "কেন?"

রাধাচরণ বলিল, "গৃহে কায ছিল—আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তোমাকে লইয়া আমার চলিবে না। আজ মাসের ২৫শে—মাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কার্য্যকাল শেষ হইবে জানিও।"

রাধাচরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল 'সাহেবের' কৃপাভিক্ষা করে; কিন্তু সে তাহা পারিল না। রাধাচরণ যখন গৃহে ফিরিল তখন চারুশীলা গৃহকর্ম্ম সারিয়া—ভৃত্যের সাহায্যে প্রাঙ্গণে রোপিত ফুল গাছগুলির মূলে জল দিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাধাচরণ হস্তমুখ প্রক্ষালিত করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। চারুশীলা "জলখাবার" আনিয়া দিল। তাহার আহার শেষ হইলে চারুশীলা বলিল, "আজ কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবে?" রাধাচরণ বলিল, "যে দিকে হয় চল।"—দুঃসংবাদ দিয়া পত্নীর হৃদয়ে আনন্দালোক নির্ব্বাপিত করিতে তাঁহার মন সরিল না! দুইজনে নদীকূলে বেড়াইতে গেল। কিন্তু রাধাচরণ কেমন অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ পরে যখন পল্লবরাগতাম্র তপন পশ্চিম গগনে মেঘমালায় রক্তাভা বিকীর্ণ করিয়া অস্তগমনোম্মুখ হইল, তখন তাহারা শ্যামায়মান বনপথে গৃহে ফিরিল।

রাত্রিতে ভ্রমণশ্রান্ত চারুশীলা শয়ন করিয়াই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রাধাচরণের নয়নে নিদ্রা নাই। পত্নীকে সুপ্ত বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। বাতাস শীতস্পর্শ—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; কিন্তু দিগন্তের পুঞ্জীভূত মেঘমালার প্রান্তে উদীয়মান চন্দ্রের রজত কিরণ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে আলোকবিকাশ হইতে লাগিল। দূরে বৃক্ষগুল্ম স্বচ্ছান্ধকারে গাঢ় অন্ধকারস্তূপবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল;—ক্রমে তাহারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল।

মেঘমালার মধ্য দিয়া চন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি গগনে উদিত হইল। রাধাচরণ

ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনে চারুশীলা ঐ চন্দ্রেরই মত উদিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল সে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রেমের কিরণে অসীম তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছে। আজ কোথা হইতে কাল মেঘ আসিয়া তাহাকে সে তৃপ্তি—সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহার মনে হইল, তাহার জীবনে আনন্দ নির্ব্বাপিত ও তাহার হৃদয় হইতে সুখ নির্ব্বাসিত হইতেছে। তাহার হৃদয় বিষাদবেদনায় যেন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে তখন আর আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দ্রুত-পদে কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

শয্যায় চারুশীলা নিদ্রিত। রাধাচরণ প্রবল আবেগে—উন্মাদের মত তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুদিত নেত্রে, অধরে, গণ্ডে, কপালে চুম্বনদান করিল। চারুশীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার বোধ হইল, স্বামীর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাহার আননে পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদিতেছ?"

তখন রাধাচরণ তাহাকে সব কথা বলিল।

চারুশীলা উঠিয়া বসিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। কিন্তু রোগে—শোকে—বেদনায় রমণীর সান্ত্বনাদায়িনী কল্যাণী মূর্ত্তি আত্ম-প্রকাশ করে। সে আপনার বেদনা গোপন করিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন? আবার চাকরী পাইবে।"

এ আশার কথা এতক্ষণ রাধাচরণের মনে হয় নাই। সে যেন অকূলে কূল পাইল। সে শান্ত হইল।

তাহার পর চাকরীর চেষ্টা করিয়া পশ্চাতে বিফলমনোরথ রাধাচরণ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাকে দূরে যাইতে দেওয়া তাঁহার অভি-প্রেত ছিল না। বিশেষ বিদেশে চাকরী করিতে যাইয়া তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা কিরূপে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাধা-চরণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মনে আশঙ্কা হইত। তাই তাহার প্রত্যা-বর্ত্তনে তিনি আনন্দিত হইলেন।

রাধাচরণ লজ্জায় গৃহে থাকিল না—কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক ব্যাস্‌টাইল

দুর্গ অধিকার—১৭৮৯খৃঃ জুলাই।)

এদিকে সর্ব্বজনপ্রিয় সচিবশ্রেষ্ঠ মহানুভব নেকার রাজাজ্ঞায় কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। সমরনীতিপরায়ণ অদূরদর্শী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুচক্রিগণ সমাভিব্যাহারে রাজনৈতিক গগন হইতে ধূমকেতুর ন্যায় ফরাসী জাতির প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নেকারের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী রাজ্যের শাসননীতি এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সমগ্র ফরাসী জাতির সহিত অচিরে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে মনে করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তদনুরূপ আয়োজনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, পদাতিক দলে দলে অহর্নিশ রাজবর্ত্মে ধাবিত হইতে লাগিল। কামান, সঙ্গীন্, বন্দুক, গোলা, গুলি ও তরবারী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হওয়ায় প্যারিস রণসাজে সজ্জিত হইল।

অকস্মাৎ এইরূপ বিরাট আয়োজন দেখিয়া প্যারিসবাসিগণের হৃদয়ে প্রথমতঃ আতঙ্ক ও ত্রাস উপস্থিত হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহারা ভীরুতা পরিহার পূর্ব্বক প্রতিহিংসাবৃত্তিপরিচালিত হইয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার আয়োজন করিল। অচিরে নগরের যাবতীয় নাট্যশালা অবরুদ্ধ হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উৎসব পরিত্যক্ত হইল। বিপ্লবনেতৃগণ সর্ব্বসাধারণকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১২ই জুলাই তারিখে ইতর সাধারণ প্যালে রয়াল ভবনে সম্মিলিত হইলে জনৈক নেতা সর্ব্বসাধারণকে অস্ত্র ধারণের নিমিত্ত বলিলেন:—"প্যারিসবাসিগণ, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত। মাননীয় নেকারের পদচ্যুতিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বদেশসেবকগণের সংহারসাধনের সময় উপস্থিত। জাতীয় সমিতির ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত সমিতিগৃহের নিম্নভাগে রাশীকৃত বারুদ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্যারিস নগরের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া শতাধিক কামান শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা কাহারও নিস্তার নাই। অদ্য সন্ধ্যাকালে চ্যাম্প ডিমার সৈন্যাগারস্থিত বিদেশীয় সৈন্যগণ আমাদিগের সকলকেই হত্যা করিবে। নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায় অস্ত্রধারণ"।

নেতৃবরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্যারিসের ইতরসাধারণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি পদচ্যুত মন্ত্রিবরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া রাজবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের নিমিত্ত একদল পদাতিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা পদাতিকবৃন্দের প্রতি অজস্র প্রস্তর বর্ষণ করিল। তখন পদাতিকগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে একদল অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইল দেখিয়া, ইতর সাধারণ স্থান ত্যাগ করিয়া টুইলারি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই গার্ড ডি ফ্রান্স নামক রাজসৈন্যদল প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করিল। সুতরাং ফরাসীরাজার বিপত্তির পরিসীমা রহিল না।

পরদিবস (১৩ই জুলাই, ১৭৮৯খৃঃ) প্রত্যূষে সংখ্যাতীত ব্যক্তি মুদ্গর, বল্লম, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া সেণ্ট লাজার নামক ধর্ম্মাশ্রম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অধিবাসিগণ যৎপরোনাস্তি ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ভাণ্ডারস্থ যাবতীয় খাদ্য তাহাদিগকে বিতরণ করিল; কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আগন্তুকগণ বলপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতঃ পরিশেষে ধর্ম্মাশ্রমে অগ্নিপ্রদানের আয়োজন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তথায় একদল সৈন্য উপস্থিত হইলে তাহারা ধর্ম্মাশ্রম ত্যাগ করিয়া গার্ড মিউবল্ নামক অস্ত্রাগারাভিমুখে ধাবমান হইল। বলপূর্ব্বক দ্বার ভগ্ন করতঃ অস্ত্রাগারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা রাশি রাশি বন্দুক, সঙ্গীন, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র লুণ্ঠন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা লাফোর নামক সুপ্রসিদ্ধ কারাগৃহ আক্রমণ করিয়া কারাবাসিগণকে মুক্তিপ্রদান করিয়া যদৃচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। কারাবাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া মহানন্দে শান্তিভঙ্গকারিগণের সহিত সম্মিলিত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, প্যারিস ও ফবর্গ নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়

নগরীর বিদ্রোহদমনকল্পে যে দুর্জ্জেয় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা ব্যাসটাইল দুর্গ নামে অভিহিত। ব্যাসটাইল দুর্গ সুগভীর সুপ্রশস্ত পরিখাবেষ্টিত; তদুপরি কয়েকটি অস্থায়ী সেতু; সেতুগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্তে পরিখা-সংলগ্ন অথবা স্থানান্তরিত হইতে পারিত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে কতিপয় উচ্চ গুম্বজ গৃহ; তদুপরি পঞ্চদশটি অতি বৃহৎ কামান সংস্থাপিত। দুর্গপ্রবেশের সর্ব্বপ্রধান দ্বারের উপরিভাগে অস্ত্রাগার। দুর্গাভ্যন্তরে তিনটি প্রাঙ্গণ। বহির্দ্দেশ হইতে দুর্গে প্রবেশ করিয়াই প্রথম প্রাঙ্গণ। প্রথম প্রাঙ্গণের বহির্দ্দিক উচ্চ সুপ্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাঙ্গণে দুর্গ-রক্ষকের অশ্বশালা এবং সৈনিকবৃন্দের অবস্থিতির নিমিত্ত কয়েকটি সুদীর্ঘ বারাক। প্রথম প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি শুষ্ক পরিখা, তদুপরি একটি অস্থায়ী সেতু। সেই সেতু সংরক্ষণের নিমিত্ত তৎসন্নিকটে একটি প্রহরিশালা; তৎ-পার্শ্বে দুর্গ-রক্ষকের ভবন। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ হইতে একটি সুবৃহৎ লৌহ নির্ম্মিত দ্বার দিয়া তৃতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। তৃতীয় প্রাঙ্গণ ১০০ ফিট দীর্ঘ এবং ৭০ ফিট প্রশস্ত; ইহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগের আবাস গৃহ। দুর্গের বহিস্থ পরিখা সীন নদীর সহিত সম্মিলিত। সুতরাং ব্যাসটাইল দুর্গ যে অতি দুর্গম ও দুর্ভেদ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্যারিস নগরে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়া রাজমন্ত্রিগণ দুর্গ-রক্ষক ডেলানিকে দুর্গ সংরক্ষণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান পূর্ব্বক জনৈক দূত-দ্বারা একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিখানি বিপ্লব প্রহরিগণের হস্তে পতিত হওয়ায় তাহারা তৎক্ষণাৎ উহা হোটেল ডি ভিলা ভবনে বিপ্লব সমিতি সমীপে প্রেরণ করিল। বিপ্লব সমিতি রাজা ও মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে ব্যাসটাইল দুর্গ আক্রমণের নিমিত্ত ১৩ই জুলাই তারিখে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী প্রেরণ করিলেন।

১৩ই জুলাই রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ দুর্গস্থ প্রহরিবৃন্দের প্রতি কয়েকবার মাত্র অগ্নিবর্ষণ করতঃ সন্নিহিত স্থানে যামিনী যাপন করিল; কিন্তু দুর্গস্থ সৈন্যগণ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। পরদিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় আক্রমণকারিগণ প্রধান দ্বারে সমবেত হইয়া উদ্যম ও অধ্য-বসায় সহকারে দুর্গ প্রবেশের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দুর্গ-রক্ষক আক্রমণকারিগণের প্রতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু অগ্নিবর্ষণ আরব্ধ হইবামাত্র আক্রমণকারীরা স্থান ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে গমন করিল। তখন গুম্বজ গৃহের বৃহৎ কামানগুলি রিউ সেণ্ট এণ্টনি নামক স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সেরূপ ভাবে কামান সংস্থাপিত হইলে, প্যারিস নগরের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত বিপদ নিরাকরণমানসে দুর্গসন্নিধানে সমাগত হইল। জাতীয় সমিতির দুইজন সভ্য দুর্গ-রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কামানগুলি অন্য ভাবে সংস্থাপিত করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্গ-রক্ষক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আক্রমণনিবারণকল্পে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রমণকারিগণের দলপুষ্টি হইতে দেখিয়া ডেলানির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ সর্ব্বপ্রধান দ্বার দিয়া দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দুর্গরক্ষক সৈনিকগণ অন্যকোন দিকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সেই দ্বার সংরক্ষণের প্রয়াস পাইতে লাগিল। শত্রুগণের দুর্গ প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত পরিখা-সেতু ইতঃপূর্ব্বে শৃঙ্খলসাহায্যে পরিখাচ্যুত করিয়া উপরিভাগে রক্ষিত হইয়াছিল। আক্রমণকারীদিগের দলে টুর্নি ও বনমারী নামক দুইজন বহুদর্শী সৈন্য ছিল। তাহারা দুর্গরক্ষক সৈন্যগণের অজ্ঞাতসারে কৌশলে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিখা-সেতু পরিখাসংলগ্ন করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারিগণ সেই সেতুর উপর দিয়া দলে দলে দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ-রক্ষকের আবাসগৃহ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দৃষ্টে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ আগন্তুকগণের প্রতি অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি হত হইলে আক্রমণকারিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সেতুসন্নিধানে সমবেত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে রাজদ্রোহী গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক দলভুক্ত বহু সংখ্যক সৈন্য ইনভালিড অস্ত্রাগারলুণ্ঠিত কামান ও অন্যান্য অস্ত্রাবলী সমভিব্যাহারে আক্রমণকারিগণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের আগমনমাত্র আক্রমণকারিগণের সমগ্র যুদ্ধপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগে এবং গবাক্ষ-প্রদেশে বহুসংখ্যক বন্দুকধারী দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণের প্রতি অজস্র অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলাবর্ষণে দুর্গের প্রাচীরসমূহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। আক্রমণকারিগণ গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের আগমনে উৎসাহিত হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক

দুর্গ-রক্ষকের গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। কামানের ভীষণ নিনাদে দিগ্-দিগন্ত নিনাদিত এবং প্রজ্জলিত হুতাশনের প্রচণ্ড প্রতাপে দুর্গের চতুর্দ্দিক ভস্মীভূত হইতে লাগিল। আক্রমণকারীরা দুর্গ-রক্ষকের গৃহে একটি বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে দুর্গ-রক্ষকের কন্যা মনে করিয়া অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত করিতে লাগিল। তাহারা বালিকাটির হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "দুর্গ-রক্ষক এই মুহূর্ত্তে দুর্গ সমর্পণ না করিলে তাহার কন্যাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।" বালিকা ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল কিন্তু পাপাত্মগণের হৃদয়ে করুণার লেশমাত্র সঞ্চার হইল না। তাহারা তাহাকে তৃণরাশির মধ্যে শয়ন করাইয়া তৃণে অগ্নি-প্রদানের আয়োজন করিতে লাগিল। বালিকার পিতা মমস্বীন এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবলোকন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কন্যার জীবন রক্ষার নিমিত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন। কিন্তু বন্দুকের গুলির আঘাতে তিনি অচিরে ভূতলশায়ী হইলেন। সুতরাং বালিকার জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনা রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক দলস্থ জনৈক সৈনিক পুরুষ বালিকার জীবন রক্ষার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? বালিকাটি দুর্গ-রক্ষকের কন্যা নহে।" এই বলিয়া তিনি বালিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন।

তিন ঘণ্টাকাল উভয়পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হইল, তথাপি ডেলানি দুর্গ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। চাম্প ডি মারস্থ সেনাপতি তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিবেন এইরূপ আশা করিয়া তিনি অতুল বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির বিনানুমতিতে সৈন্য প্রেরণ করিতে অক্ষম। সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি দুর্গসংরক্ষণবিষয়ে উদাসীন। সুতরাং ডেলানির সকল চেষ্টাই বিফল হইল। এ দিকে দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণ আক্রমণকারিগণের সহিত গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের সম্মিলন দৃষ্টে ডেলানিকে পুনঃ পুনঃ দুর্গ সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ডেলানি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে যখন তিনি সেনাপতিপ্রবরের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইলেন; যখন দেখিলেন যে, মুষ্টিপরিমিত সৈন্যের সাহায্যে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারীর আক্রমণ নিবারণ অসম্ভব, তখন তিনি মনে করিলেন, শত্রুর হস্তে সমর্পণ

অপেক্ষা দুর্গের ধ্বংসসাধন সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এইরূপ চিন্তা করিয়া দুর্গ ও দুর্গবাসিগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তিনি দুর্গস্থ বারুদ-রাশিতে অগ্নি প্রদানকল্পে প্রজ্জ্বলিত দীপ-শলাকা হস্তে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন। কিন্তু দুর্গস্থ সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিল। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি আক্রমণকারিগণের হস্তে দুর্গসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে ভার্সেলিস নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। সভ্যগণ ব্যাসটাইল দুর্গবিজয় অথবা প্যারিস নগরের ঘটনাবলী বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন। রাজা অবধারণ করিয়াছেন, রাজধানীতে না জানি কি কি ভীষণ নাট্যের অভিনয় হইতেছে। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে ফরাসী জাতির দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না, এই চিন্তায় সকলেই ম্রিয়মাণ। কামানের ভীষণ নিনাদ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে অথচ ব্যাপারটি কি তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বিদেশীয় সৈন্যগণকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত বারম্বার রাজাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ফরাসীরাজ নিরুত্তর।

ফরাসীরাজ সপরিবারে ভার্সেলিস প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দলন-নীতি পরিচালিত হইয়া অবধারণ করিয়াছেন; কিন্তু ইনভ্যালিড অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অথবা ব্যাসটাইল দুর্গ বিজয় ইত্যাদি কোন ব্যাপারই অবগত নহেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে ডিউক্ ডি লিয়ান কোটের প্রমুখাৎ প্রাগুক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করত: তিনি বিশুষ্ক বদনে বলিলেন, "হাঁ। দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত।" লিয়ান কোট বলিলেন, "বিদ্রোহ নহে। মহারাজ, বিপ্লব।" তখন ফরাসীরাজ অনন্যোপায় হইয়া পরদিবস ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে জাতীয় সমিতিগৃহে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"সভ্য মহোদয়গণ, একটি গুরুতর প্রসঙ্গে আপনাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত আমি এই স্থানে আসিয়াছি। রাজধানীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিষম বিভ্রাট দেখিয়া ফরাসী জাতির নেতৃস্বরূপ আমি শান্তি সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবনকল্পে বিশ্বস্ত জাতীয় প্রতিনিধিবর্গসন্নিধানে প্রহরিবিহীন হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমার অভিসন্ধিসম্বন্ধে অশেষবিধ অলীক জনরব প্রচারিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই আমি অবগত হইয়াছি। দুষ্ট ব্যক্তিগণ এরূপ রটনা করিতেও ক্রটি

করে নাই যে, আমি আপনাদের দৈহিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু আমার নিষ্পাপ চরিত্রই আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ। আমি যে প্রহরিবিহীন হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি ইহাই আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ। আমি ফরাসী জাতির প্রতিনিধিবর্গসন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য হইতে চিরদিনের নিমিত্ত আমি ফরাসী জাতির সহিত সম্মিলিত হইলাম। জাতীয় সমিতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি ভার্সেলিস ও প্যারিস হইতে সৈন্যগণকে স্থানান্তরে প্রেরণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনারা আমার অভিপ্রায় রাজধানীতে প্রচারিত করিবেন।"

রাজার বক্তৃতা শ্রবণে সভ্যগণ প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার সহিত রাজ-ভবনে গমন করিলেন। এই শুভ সংবাদ প্যারিসে প্রচারিত হইলে, উন্মত্ত ইতরসাধারণ প্রকৃতিস্থ হইল। ইহার অব্যবহিত পরে ফরাসীরাজার সম্মতিক্রমে মহামান্য বেলি প্যারিস নগরের অধ্যক্ষ পদে এবং ল্যাফাইট জাতীয় সৈন্যগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন।

অনন্তর ১৭ই জুলাই তারিখে ফরাসীরাজ কতিপয় প্রহরী সমভিব্যাহারে প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাতীয় সমিতির বহুসংখ্যক সভ্য তৎসঙ্গে গমন করিলেন। রাজা প্যারিস নগরে উপস্থিত হইলে মাননীয় বেলি মিউনি-সিপালিটীর সভ্যগণসমভিব্যাহারে রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ফরাসীরাজ হোটেল ডি ভিলায় গমন করিয়া জাতীয় ত্রিবর্ণ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিলেন। তদ্দৃষ্টে সংখ্যাতীত ব্যক্তি জাতীয় ভাবে উন্মত্ত হইয়া "ফরাসী জাতি দীর্ঘজীবী হউক" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিল। অনন্তর কয়েক ঘণ্টা কাল রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়া ফরাসীরাজ ভার্সেলিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে জাতীয় সমিতির আদেশক্রমে ব্যাসটাইল দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভারতের প্রথম নীলকর।

নীল ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার ইতিহাসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। সুতরাং সে বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই। তবে ভারতে সর্ব্বপ্রথম যিনি নীল-বীজ বপন করিয়া অঘটন ঘটাইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে সেই প্রথম নীলকর লুই বোনাডের কথাই কিছু বলিব।

মুসো লুই বোনাড ফরাসীস। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের মার্সেলিস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বোনাডের সংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পুর্ব্বেই নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্য-পরীক্ষার্থ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলিয়া যায়েন। তথায় বোনাডের সুবিধাই হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। এই দ্বীপে থাকিতে থাকিতেই বোনাড সর্ব্বপ্রথম নীল-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া বুরবনে যাইয়া বাসস্থাপন করিলেন; কিন্তু বুর্বনে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নাই। তথা হইতে তিনি তিন জাহাজ পণ্য ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ তিন-খানি জাহাজই পথিমধ্যে জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার বিস্তর লোকসান হইয়া যায়। ভগ্নাশ বোনাড ধ্বংসাবশিষ্ট মূলধন লইয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একেবারে ভারতে—কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিল না। তথা হইতে তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলিয়া গেলেন। নূতন দেশে নূতন আসিয়া বোনাড নীলের ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে হুগলী জিলার তালডাঙ্গা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বাগান জমা লওয়া হইল; কিন্তু তথায় ব্যবসায়ের উপযুক্ত বিস্তৃত জমী না পাওয়ায় এবং বাগানটি নদী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি চন্দননগরের দক্ষিণ ও তেলিনীপাড়ার নিকটবর্ত্তী নদীতীরস্থ গোন্দল-পাড়ায় বিস্তৃত জমী জমা করিয়া লইয়া তথায় কুঠি স্থাপন করতঃ নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে এডাম্‌স্‌প্রমুখ তিনজন অর্থশালী ইংরাজ ব্যবসায়ীর সহিত

বোনাডের পরিচয় হয়। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মালদহে যায়েন এবং তথায় নীলকুঠি স্থাপিত করেন। কুঠির জন্য ইষ্টক ও সুরকি তথায় সহজেই প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু চুণ পাওয়া যাইত না বলিয়া বোনাডকে প্রথমে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইল। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ ইহারও এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন। মুসলমান-প্রধান মালদহে কবরের অভাব ছিল না। বোনাড এই সমস্ত কবর খুঁড়িয়া নরকঙ্কাল বাহির করিয়া তাহাই পোড়াইয়া চুণের অভাব পূর্ণ করিলেন।

ইহার পর বোনাড যশোহরের প্রসিদ্ধ নহাট্টা ও নদীয়ার কালনা ও মীর্জাপুর নামক স্থানের কুঠিগুলির সত্বাধিকারী হয়েন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মীর্জাপুর কুঠি পরিত্যাগ করিয়া যায়েন। এই বৎসর মীর্জাপুর কণসার্ণ হইতে ১৪০০ শত মণ নীলের রপ্তানি হয়। এত অধিক পরিমাণ নীল এক বৎসরে এ কুঠি কেন বোধ হয় সমগ্র বাঙ্গলার কোনও কুঠি হইতে পাওয়া যায় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে বোনাডের মৃত্যু হয়। বোনাডের বংশে কেহ আছেন কি না এবং থাকিলেও কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

চিররুদ্ধা।

(ম্যাক্সমুলারের German Text হইতে)

তুমি যে আমারি ওগো, তোমারি আমি,
হৃদিমাঝে ভরা আছ দিবসযামী।
হৃদয়ে রুধিয়া তোমা হারানু চাবি,
রুদ্ধ রহিলে চির ;—কি হবে ভাবি ?

শ্রীকালিদাস রায়।

সমালোচনা।

—০—

এষা।*

—:০:—

টেনিসনের In Memoriam গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া সমালোচক ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলিয়াছেন, এই পুস্তকের রচনাকালে কবির স্বাভাবিক রচনাশক্তি অনুশীলনফলে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা' সম্বন্ধেও আমরা সেই কথা বলিতে পারি। অক্ষয়কুমার যখন যৌবনের 'ভুল' লইয়া ভারতীর কুঞ্জে দেখা দিয়াছিলেন তখনই বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'তে সে ক্ষমতার ক্রমবিকাশ; আর 'শঙ্খে' তাহার পূর্ণ পরিণতি। 'ভুলে' বিদেশী কবিদিগের প্রভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু অক্ষয়-কুমারের ক্ষমতার পরিচয়ও সপ্রকাশ। পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কবির বিশেষত্বের ও নিজস্বেরই পরিচয়। 'এষা' শোক-গীতি। উভয় পুস্তকই শোককাতর হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস—উভয় পুস্তকই বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি।—In Memoriamএর সহিত 'এষার' সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। টেনিসনের পুস্তকের সকল কবিতাই একরূপ ছন্দে রচিত, অক্ষয়কুমারে 'এষার' কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত। টেনিসন বন্ধুবিয়োগবিধুর হইয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন; অক্ষয়কুমারের বেদনা জীবনসর্ব্বস্ব পত্নীর মৃত্যুশোক—

"সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে।
লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।"

মৃত্যুর নিষ্ঠুরতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া টেনিসন সংশয়ের কঙ্কর-

---

* এষা, গীতি কাব্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

কণ্টাকিত পথে যাইয়া—দার্শনিক নিরাশার মধ্য দিয়া ভক্তির গিরিশিরে বিশ্বাসের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" অক্ষয়কুমার মৃত্যুর অন্ধকারে প্রেমের দিব্যদীপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; বুঝিয়াছেন, প্রেমমৃত্যুঞ্জয়ী—"ইহকাল—পরকাল।" টেনিসনের কবিতা পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য হইতে উথিত জয়ের ও জীবনের তূর্য্য-নিনাদ। অক্ষয়কুমারের কবিতা মৃত্যুর মধ্য হইতে উথিত প্রেমের জয়গান। তবে উভয়েরই শোক শান্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উভয়েরই শোক-গীতি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবে। যদি সাহিত্যে অমরতা মৃতের সান্ত্বনার বা সুখের কারণ হয়, তবে টেনিসনের বন্ধুর ও অক্ষয়কুমারের পত্নীর সে সান্ত্বনার ও সে সুখের অভাব হইবে না।

মুমূর্ষু পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় 'এষার' আরম্ভ, আর মৃত্যুর পরপারে অমর প্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় 'এষার' শেষ। প্রথমাংশ পড়িতে পড়িতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না; শেষাংশের গম্ভীর ভাব হৃদয়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আনিয়া দেয়। প্রথম অংশের দারুণ শোক ও বেদনা দ্বিতীয় অংশে শান্তি ও সান্ত্বনা।

মরণাহতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীর নিকট "কর্ম্মস্থল হ'তে" পত্র আসিল। মাতৃস্নেহও বুঝি মৃত্যুঞ্জয়ী। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—'একি প্রবাসী পুত্রের পত্র?'—

"অশ্রুভরা কাতর নয়ন
এক-দৃষ্টে চায়;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর-আশায়।
"হে দেবতা, লই তব নাম,
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম
পড়িতেছে বেশ।'

"বক্ষ হ'তে নেমে গেল ভার—
গভীর নিশ্বাস;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।
"শান্ত—তৃপ্ত কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন;
শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন।

মৃত্যু! সে কি এইরূপ?

"এই কি মরণ?
এত দ্রুত—সহসা এমন!
চিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন।

বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন।
মন কি গো কাঁদিছে না? প্রাণে কি গো বাধিছে না—
যেতেছ যে জন্মের মতন।"

কিন্তু যে কি ছিল স্থির করা যায় না—"প্রেয়সী না ক্রীতদাসী? দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি" যে—

"একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক"

তাহাতে ছাড়িয়া জীবন যাপন কি সম্ভব?

"মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার!
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি,' প্রাণেশ্বরি, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার!
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
শ্বাস-শ্বাসে অধরে তোমার।"

বৃথা আশা।—

"ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, ওঠে শূন্যে ধূম-ভার;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—শুধু মোহ, কে কাহার!
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।
"চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ!
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন!
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন।
"চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল,
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।
"বিদায়—বিদায় তবে! দিবা হ'ল অবসান;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান।
যেথা থাক—সুখে থাক। ঝরে তপ্ত অশ্রুভার;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।"

যে জীবনে সর্ব্বস্ব ছিল তাহাকে হারাইয়া জীবনে কি আর আকর্ষণ থাকে? তখন জীবন যাতনাভার! ভাবনার সূত্রও ছিন্ন।—

"ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর—নহে দূর
ওই মরণের পুর!
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।"

"নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা,
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই।
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।"

শোক বিশ্বাসের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। দেবতায় আর বিশ্বাস নাই, প্রকৃতির নিয়ম—"এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।" জড় প্রকৃতি নিরানন্দ। পূর্ব্বে—

"হেরি নরে—মম হ'ত ঋষি ভ্রম;
নারী ছিল দেবীসমা;
মন্দার-কলিকা বালক বালিকা;
বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা!

"আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা?
স্বার্থ-ভরা নারী নর।
জগৎ নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক;
মৃত্যু এক সর্ব্বেশ্বর।"

কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারে না; স্থায়ী হইলে শ্মশান বৈরাগ্য দূর হইত না—সংসার শ্মশান হইত। তাই শোকান্তে হৃদয়ে "শান্তিজল" আপনি বর্ষিত হয়; মনে হয়, ভ্রম আমাদেরই—"প্রকৃতির নাহি ব্যাভিচার।"

"বীজে তরু ফুলে ফল,
ফলে পুনঃ বীজদল;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে।"

মৃত্যু কি নিরর্থক নিষ্ঠুরতা মাত্র?

"কভু দেখি,—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট—
ধরিত্রীর পাদপীঠ;
শব কে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ় উদ্দেশ্য তরে
মরিতেছে স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্ম, করি বিশ্বজয়!"

তবে প্রকৃতি কোন মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত—বিধাতার বিধান মঙ্গলময়।

মনে যখন এই ভাব আইসে তখন শোকে সান্ত্বনা আইসে। মনে হয়—

"সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি।
তুমি যাহে দেহ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ।
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?"
"হে মরণ ধন্য তুমি না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়।"

তখন জাগ্রত স্বপ্নে মনে হয়, মৃতা বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিতা—মর প্রেম অমরতা লাভ করিয়াছে। সংশয়ের স্থানে বিশ্বাস—নিরাশার স্থানে ভক্তি অধিষ্ঠিত হইল—

"ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নাহিত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেখ সম্বন্ধ অক্ষয়।
শোকে শুধু হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু।
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়।"

"দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়।
জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!"

মূঢ় মানব শোকের আবেগে সংশয়সঙ্কুলিত চিত্তে অবিশ্বাসকে আশ্রয় দিয়াছি—"ক্ষম এ ক্রন্দন-গীতি—শোক অবসাদ।"

আমরা 'এষার' পরিচয় দিলাম। ইহা বঙ্গ সাহিত্যের অলঙ্কার।

'এষা' শোককাব্য। কিন্তু হইাতে প্রকৃতির সহিত গ্রন্থকারের যে পরিচয়ের প্রমাণ আছে—স্বভাবের চিত্র ভাষার প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা দেখা যায় তাহার উল্লেখ না করিয়া এ সমালোচনা শেষ করিতে পারি না। কবি প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রকৃতি—জননী—জননী !
করিয়া তোমার স্তন-সুধাপান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ !
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী !"

পুস্তকে দুইটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম—

"রবি নিরুজ্জ্বল
আকাশের এক প্রান্তে করে টল্ টল্।
সমস্ত আকাশ ভরি'
ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—
নিশীথে চষেছে শূন্য যেন দৈত্যদল !"

দুর্দ্দিনের বর্ণনা—

"ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে।
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরুছায়ান্তরে,
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে।
"অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত বৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।
"জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পিচ্ছল ;
গলিত বজন-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত।
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।
"ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিত-বরণা ;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তালতরী ;
বংশসেতু পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।
"তীর-বেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী ;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।
ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি ফুটে ;
ক্বচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি ;
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিশ্বাসি।"

প্রকৃতির এইরূপ যথাযথ বর্ণনা পুস্তকে অনেক আছে। কবি নিপুণতা-সহকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; চিত্র দেখিলে বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়।

'এষা' কবি অক্ষয়কুমারের যশোমুকুটে সমুজ্জ্বল রত্নদীপ্তিবিকাশ করিয়াছে।

মাথার খুলি।

সুবোধচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মাতুল হরিমোহন ঐ কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। উভয়ে কলেজের ছাত্রাবাসের নিম্নতলে একটি প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করেন।

গৃহের দুই পার্শ্বে দুইখানি কেওড়া কাষ্ঠের তক্তোপোষ, তদুপরি শয্যা আস্তীর্ণ। উভয়ের শিয়রে একখানি করিয়া ক্যাম্প টেবল্; তদুপরি বহি, খাতা, কাগজ, কলম, ছুরী, কাঁচি, পেন্সিল এবং মস্যাধার। পার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে ছোট শেল্‌ফ, তাহাতে বিবিধ পাঠ্য পুস্তক সজ্জিত। পশ্চাতে একটি করিয়া ষ্টীল ট্রাঙ্ক এবং তাহার পার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে ছোট আলনায় নিত্যব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি লম্ববান। গৃহের মধ্যস্থলে একটি কেরসিনের ঝুলান ল্যাম্প দোদুল্যমান।

সুবোধচন্দ্রের তক্তপোষের নিম্নে তাহার পাদুকা এবং তৎপার্শ্বে এক বাক্স মানুষের হাড়। হরিমোহনের শয্যানিম্নে দুই তিনটি কাষ্ঠের এবং কাগজের বাক্সে নানাবিধ ঔষধ, এসিড এবং রাসায়নিক পরীক্ষোপযোগী যন্ত্রাদি।

সুবোধচন্দ্র কৃশাঙ্গ এবং তাহার বর্ণ ফ্যাকাশে; দেখিলে বোধ হয় "ডিস্‌পেপটিক." অর্থাৎ অম্লরোগী। তাহার পরিপাকশক্তি কিছু অল্প এবং রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। হরিমোহনের দেহ স্থূল, বর্ণ শ্যাম; আহারে যেমন রুচি, নিদ্রায় তেমনই পটুতা। উভয়ের আকৃতি প্রকৃতিতে বিষম বৈষম্য।

সুবোধচন্দ্রের বরাবর রাত্রি জাগিয়া পড়া অভ্যাস। হরিমোহন অধিক রাত্রি অধ্যয়নের বিপক্ষবাদী।

সুবোধচন্দ্রের বাৎসরিক পরীক্ষা সন্নিকট, সেই জন্য সে প্রতিদিন রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত। হরিমোহন দশটা বাজিলে শয়ন করিত এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠাভ্যাস করিত।

একদিন রাত্রিতে সুবোধচন্দ্র "এনাটমি" (দেহবিজ্ঞান) পড়িতেছিল। হাড়ের বাক্স হইতে মানুষের মাথাটি বাহির করিয়া তাহার গঠনপ্রণালী, অক্ষিকোটর এবং মস্তিষ্কাধার উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতেছিল।

রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে; জানি না কি কারণে সুবোধচন্দ্রের চিত্ত

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল,—কাহার এ মাথার খুলি; স্ত্রীলোকের, কি পুরুষের? তাহার অদৃষ্টের গতি কি আমাদের অদৃষ্টের গতির মতই ছিল?

সুবোধচন্দ্র আর পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিল না; সেই কোন বহু দিন মৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির মস্তকের হাড় নাড়িয়া চাড়িয়া সে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার অবসন্ন অঙ্গ ও ক্লান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিবার জন্ত মনুষ্য-মস্তকটি শয্যানিয়ে রাখিয়া সে শয়ন করিল।

সে বহুক্ষণ শয়ন করিয়া রহিল; কিন্তু তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যখন একটু তন্দ্রাবেশ হইল তখন শয্যানিয়ে খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সেই মনুষ্যমস্তকটি নড়িতেছে। একে সে তন্দ্রালু ও ক্লান্তদেহ; তাহার উপর কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়, অথবা ভয়, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবসাদ এবং জড়তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে, সুবোধচন্দ্র সম্মোহনাভিভূত স্বেচ্ছাবিবর্জ্জিত ব্যক্তির ন্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

ক্রমে শব্দ যেন ধীরে ধীরে শয্যানিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া মাতুলের শয্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল।

সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সেই নরকপাল ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিল; এবং ক্ষণকালমধ্যে পূর্ণাবয়ব নরকঙ্কালে পরিণত হইল। সুবোধচন্দ্রের ললাটে স্বেদসঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন সে কোন এক ভৌতিক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

নরকঙ্কাল ক্রমে তাহার মস্তক-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যেন হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তাহার ললাট স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। সুবোধচন্দ্র চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

তখন শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই নরকঙ্কাল তাহার পাদদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল—"যুবক আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? কিন্তু চাহিয়া দেখ আমি আর এখন নরকঙ্কাল মাত্র নাই।"

সুবোধ চন্দ্রের মনে হইল, সে যেন চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার শয্যাশেষে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি!

তাহার মুখ সুন্দর; তাহার চক্ষু আয়ত। মুখাবয়বের তুলনায়

তাহার নাসিকা কিঞ্চিত দীর্ঘ; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই। রমণীর বর্ণ গৌর। তাহার অবেণী-সংবদ্ধ কেশ নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছে। পরিধানে শুভ্র শাটী, তন্নিম্নে মেরুণা রঙ্গের জামা। প্রশান্ত চক্ষুর্দ্বয়—তাঁহার ক্ষীণ মৃদু দৃষ্টি সুবোধচন্দ্রের ভীতিবিহ্বল মুখপ্রতি ন্যস্ত। তাহার সৌন্দর্য্য যৌবনে পরিপূর্ণতা পাইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তরঙ্গ নাই। তাহা শান্ত, ধীর, স্থির। ভয়ে—বিস্ময়ে সুবোধচন্দ্র এক স্বপ্ন-রাজ্যের অলৌকিক প্রভাবে হৃতশক্তি; দেহ আছে, কিন্তু তাহার কোন সামর্থ্য নাই; সংজ্ঞা আছে, কিন্তু বুদ্ধি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা নাই।

নারীমূর্ত্তি বলিল,—"যুবক, এই আমি। এক দিন ঠিক এমনই ছিলাম। তোমাদের মত সংসারের সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, অভাব অভিযোগ আমাকে বিচলিত করিত। কখন মনে হইত সংসার স্বর্গ; কখন মনে হইত সংসার নরক।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আজ আমার মাথার হাড় লইয়া তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ; তোমার পূর্ব্বে আরও কত যুবক ক্রীড়নকরূপে আমার মস্তকাস্থি ব্যবহার করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে। যতবার আমার অস্থি মনুষ্যের হস্ত স্পর্শ করে ততবার আমি সজীব হইয়া উঠি,—প্রতি অস্থিখণ্ডের মধ্যে আমার বিলুপ্ত প্রাণ জাগিয়া উঠে, সুপ্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠে। পৃথিবীর সুখ—মনুষ্যের সঙ্গলাভ করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে।"

মনে হইল যেন নারীমূর্ত্তি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সুবোধ-চন্দ্রের হৃদয়ে সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া উঠিল।

নারীমূর্ত্তি বলিতে লাগিল,—"মরিয়াছি—সে কত দিন, কত বৎসর পূর্ব্বে! কিন্তু এখনও সংসারের লালসা ত্যাগ করিতে পারি নাই; ভোগেচ্ছা এখন সম্পূর্ণ বলবতী। বাসনা বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই, তাই এখন,—এত দিন প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছি।

"কতবার চেষ্টা করিয়াছি, বিদ্যার্থিগণকে আমার পরিচয় দিব; কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছে; বিফল চেষ্টার নৈরাশ্যে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। জানি না কেমন তাহাদের ধাতু প্রকৃতি; তোমাকে যেমন আমার ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা আয়ত্ত করিয়াছি তাহাদের কাহাকেও তেমন বশীভূত করিতে পারি নাই। মনে হয়, কাহাকেও আমার জীবন-কথা শুনাইতে পারিলে

আমার অন্তর্জ্জালার নিবৃত্তি হয়। শুনিবে আমার কাহিনী! ভয় পাইও না, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।

"চাহিয়া দেখ,—এই আমি দাঁড়াইয়া আছি; আমার কি কিছু রূপ ছিল বলিয়া মনে হয়? রূপ—রূপ—রূপ—; যে রূপের জন্য প্রতি নারী লালায়িত, সে রূপ তাহার সর্ব্বনাশের মূল,—পাপের কারণ। হায়! কয়-জন অভাগিনী তাহা ভাবিয়া দেখে!

"আমার রূপ ছিল না? ছিল!—বল, বল, আবার বল, আমার রূপ ছিল। ছিল; যথার্থই ছিল। তুমি যে রূপ ভালবাস তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমার রূপ ছিল। সে রূপে কতজনের মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়াছিল—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল;—আমার রূপে তাহারা আত্মহারা হইয়াছিল। অন্ততঃ একজন একদিন এই রূপের মোহে পাগল হইয়াছিল! সয়তান—বিশ্বাসঘাতক—"

যেরূপ তীব্র, তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠে সেই নারীমূর্ত্তি—"সয়তান—বিশ্বাস-ঘাতক," উচ্চারণ করিল তাহাতে ভীতিবিহ্বল সুবোধচন্দ্রের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিবার উপক্রম হইল; তাহার নিস্পন্দ হৃদয় নিশ্চল, স্থির হইবার মত বোধ হইল। তাহার মনে হইল, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসি-তেছে। সুবোধচন্দ্র দেখিল, সেই রমণীয় রমণী-মূর্ত্তির শান্ত, স্নিগ্ধ, চক্ষু পিশাচীর জীঘাংসা-জ্বালায় প্রজ্বলিত।

"সয়তান—বিশ্বাসঘাতক, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে সুখী হইয়া-ছিল। কিন্তু পৃথিবীর সুখ কয় দিনের জন্য? পাপের ফল যে পৃথিবীর পরপার পর্য্যন্ত আইসে দুষমন তখন তাহা বুঝিতে পারে নাই; এখন আমার মত এই প্রেতলোকে আসিয়া তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। কাফের—দুষমন্, দূর হ', আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।" বঙ্কিম গ্রীবা বক্র করিয়া নারীমূর্ত্তি যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল যেন নারীমূর্ত্তির পশ্চাৎ হইতে একটি পুংপ্রেত-মূর্ত্তি অপসৃত হইয়া গেল।

নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"কাফেরের প্রলোভনে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম; তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া, তাহার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম; তাহার কপটতায় প্রলুব্ধ হইয়া কায়মনোবাক্যে জীবন—যৌবন তাহার ভোগবাসনার জন্য উৎসর্গ করিয়া-

ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, জীবন-নদীতে যৌবন-নৌকা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভাসিয়া বেড়াইবে। কে জানিত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে—উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে ভরা ডুবি হইবে?"

নারীমূর্ত্তি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল; তাহার হিংসাপ্রদীপ্ত কঠোর মুখভঙ্গী ক্রমে কোমল হইয়া আসিল; চক্ষুর প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। তাহার পর সে অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"যুবক, আমি তোমার মত হিন্দু নহি—মুসলমান। সত্যধর্ম্মে আমার জন্ম হইয়াছিল; কাফেরের প্রেমে পড়িয়া আমি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম,—হিন্দুর বেশভূষা, আচারব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাই আমার এই কঠোর শাস্তি; মরিয়াও আমার সুখ নাই, কারণ আমি মুসলমানের মত মরিতে পারি নাই, মুসলমানের চিরাচরিত কবর আমার ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। আমি বাদশাহজাদি—বাদশাহের ঘরে আমার জন্ম হইয়াছিল। বিশ্বাস করিতেছ না? তবে চাহিয়া দেখ;—দেখ,—দেখ, কি সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমার জন্ম হইয়াছিল।—"

সুবোধচন্দ্র দেখিতে পাইল,—সুবৃহৎ সৌধাবলী সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত। চারিদিকে চারিটি মহল, তন্মধ্যে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে স্ত্রী-প্রহরী। বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, সুসজ্জিত সুরম্য হর্ম্ম্যমালা। সম্মুখ মহলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মণ্ডপ। মণ্ডপে নবাবের দরবার বসিয়াছে; রাজা প্রজা এবং উজীর পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের মহলে রাজকর্ম্মচারী এবং কার-কুনরা কর্ম্ম করিতেছে, বামদিকের অট্টালিকা কর্ম্মচারী এবং অভ্যাগত-জনের বাসস্থান। পশ্চাদ্ভাগের দৃঢ়ভিত্তি লৌহপ্রাচীরবেষ্টিত; প্রকোষ্ঠা-বলীতে সেনানিবাস এবং কারাগার।

সর্ব্বাপেক্ষা সুচারু অন্তঃপুর—বেগম মহল; গৃহে গৃহে অসূর্য্যম্পশ্যা পারিজাতপুষ্পসদৃশ নয়নাভিরাম রমণীমূর্ত্তি; গৃহ কলকণ্ঠের মৃদু গীতে এবং মধুর হাস্যপরিহাসে মুখরিত।

সুবোধচন্দ্র শুনিতে পাইল—"ঐ আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ-পরিপূর্ণ—সুখস্মৃতিবিজড়িত বাসভবন। আমিও ঐ গৃহে জন্মিয়াছিলাম; কিন্তু তখন উহার এরূপ শ্রী ছিল না। তখন ইংরাজ রাজত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। কালের কুটিল প্রবাহে ঐ সৌধাবলী, স্থানে স্থানে

ভগ্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। নবাবী 'চাল' বজায় ছিল—পূর্ব্বেরই মত দরবার বসিত, কিন্তু সে পূর্ব্বদরবারের ছায়া মাত্র! বিরল-প্রহরিপরিবেষ্টিত ঐ গৃহে আমার শৈশব, কৈশোর অতীত হইয়াছিল; যৌবনের প্রারম্ভে এক হিন্দু কর্ম্মচারীর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার পিতা পিতামহ আমার পিতা এবং পিতামহের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। নবাবের গৃহে সস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া তরলমতি যুবক কেবল বিলাস-ব্যসন শিখিয়াছিল। বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীর পুত্র; অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশাধিকার ছিল। উভয়ে অনেক সময় একত্র ক্রীড়া করিতাম। যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম তখন মাতার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত মিশিতাম। ওস্তাদের নিকট গান শিখিয়া তাহাকে না শুনাইলে তৃপ্তি হইত না। সে কি সুখের দিন ছিল!"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"সে তখন কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিত। ফিরিয়া যাইয়া আমাকে কত প্রলোভনের কথা বলিত—বিলাসব্যসনের কত পাপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমার অসংযত মনকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিত।

"নবাবের গৃহে জন্মিয়াছিলাম, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং পিতামাতার ভৎর্সনায় সয়তানের সহিত প্রকাশ্য ভাবে সাক্ষাৎ না করিয়া গোপনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। তখন কলিকাতায় প্রথম থিয়েটার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে আমাকে থিয়েটার দেখাইবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু বাদসাহ-কন্যা আমার পক্ষে অন্দরের বাহিরে আসা একেবারে নিষিদ্ধ, তাই সয়তান আমাকে ফুস্‌লাইয়া, সমাজ---ধর্ম্ম এবং মর্য্যাদার মস্তকে পদাঘাত করাইয়া কূলের বাহির করিল।

"মর্য্যাদাহানির ভয়ে পিতামাতা আমাকে আর গৃহে লইলেন না, দুষমনও আমাকে যাইতে দিল না। ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ ও রোষপরবশ হইয়া পিতা আমার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট করিয়া দিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে আমার মিথ্যা কবর দিলেন। আমি সয়তানের আশ্রয়ে হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু কুলকলঙ্কিনীদিগের সহিত কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলাম।

"কিছু দিন বেশ সুখে কাল কাটিয়া গেল। সে সুখ যে সুখ নহে, অনন্ত

দুঃখের আপাতরম্য প্রারম্ভ, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী যেমন বহুদিন আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তি পাইলে স্বাধীনতার প্রাণোন্মাদকারী রসাস্বাদন করিয়া আত্মবিহ্বল হয় এবং অস্থিরভাবে পক্ষ উচাটনপূর্ব্বক মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; মনে করে, সেই স্বাধীনতাসুখের নিকট সুবর্ণপিঞ্জর এবং সযত্নসঞ্চিত অনায়াসলব্ধ আহার অতি তুচ্ছ, আমিও তেমনই শুদ্ধান্তের পবিত্র তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সংযমহীন বিলাসব্যসনে আত্মহারা হইয়াছিলাম।

"সর্ব্বনাশের মূল, ক্ষণভঙ্গুর সেই সুখ আলেয়ার আলোকের ন্যায় মুহূর্ত্ত-জ্বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল! দুঃখের অনন্ত অন্ধকারের প্রথম আভাস আমার জীবনপথে বিভীষিকা দেখাইল। ধর্ম্মবন্ধনবিহীন বন্ধু আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া লঘুহৃদয় প্রজাপতির ন্যায় পুষ্পান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন জানিতাম না যে, পাপের পথে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; সুতরাং প্রণয়ের প্রথম নৈরাশ্যে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। ঘৃণায়, লজ্জায়, শোকে—নবাবনন্দিনী আমি, মৃত্তিকায় বুক পাতিয়া অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিলাম।"

অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কি গভীর দুঃখ, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা? অবৈধ প্রণয়ের প্রথম নৈরাশ্য যে কত তীব্র,—আন্তরিক ভালবাসার প্রথম উপেক্ষা যে কত জ্বালাময় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বোধ হয়, বৈধ প্রণয়াপেক্ষা অবৈধ প্রণয়ের আসক্তি অধিক, নতুবা তখন সেই সয়তানের বিশ্বাস-ঘাতকতায় হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িবে কেন, প্রতি অণুপরমাণুতে ব্যর্থ প্রণয়ের তীক্ষ্ণ-বেদনা বাজিয়া উঠিবে কেন?

"সে ত অনেক দিনের কথা। তাহার পর কত উপেক্ষা, কত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিয়াছি; হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিসকল সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি—তথাপি এই যুগ-যুগান্তর-পরে—এই প্রেতলোকে, এই ছায়া-মূর্ত্তির পঞ্চভূতপরিবর্জ্জিত হৃদয়ের নিভৃত কোনে সেই পিশাচের প্রতিবিম্ব লাগিয়া রহিয়াছে। কত চেষ্টা করিয়াছি—দুঃখের পর দুঃখ পুঞ্জীভূত করিয়া হৃদয়কে অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি তথাপি সেই প্রথম প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি বিদূরিত করিতে পারি নাই।

সে যে আমার হৃদয়ফলকে অকৃত্রিম প্রণয়ে উৎকীর্ণ,—আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা, আমার যৌবন-প্রভাতের প্রথম অরুণরাগ, আমার সুখ-জীবনের প্রথম মধুর স্বপ্ন; সে ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারি না। ত্যাগ করিলে যে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এই দগ্ধ জীবনের সেই অকপট প্রণয় ব্যতীত আর সব যে মসীময়, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন! সেই প্রণয়ের জন্য যে আমি সর্ব্বত্যাগী।

"প্রণয় সুখের, কিন্তু প্রণয়হেতু প্রণয়ীর প্রতারণা দুঃখের; তাই তাহাকে দেখিলে—তাহার কথা মনে হইলে হৃদয়ে হিংসাপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তাহাকে যেমনটি ভালবাসিয়াছিলাম,—যখন সে আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তখন ত সে তেমন ছিল না। তাহার দেবত্বকে ভালবাসিয়াছিলাম—সেই দেবত্বকে কেন না পূজা করিব? তাহার দানব প্রকৃতিকে ভালবাসি নাই—তাই সেই দানব-প্রকৃতিকে হৃদয়ের সহিত, অন্তরের সহিত, ঘৃণা করি। তাই যখন সে প্রেত-মূর্ত্তিতে আমার নিকটে আইসে তখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়া থাকি। ইহা কি আমার দোষ? দোষ হয়, আমি এ দোষ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। দুর্ব্বলতা!—ভাল, এ দুর্ব্বলতা যেন আমার চিরসঙ্গী থাকে।"

নারীমূর্ত্তি মৌন হইয়া রহিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সে যেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তির করুণকাহিনী বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একি! আবার সেই কণ্ঠস্বর, সেই করুণস্বর; আরও বিষাদবিজড়িত, আরও বিনীত।

অনুরুদ্ধ হইয়া সুবোধচন্দ্র যেন পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন করিল। কি ভয়ানক দৃশ্য! নারীমূর্ত্তির আর সে রূপ নাই, সে বিশীর্ণ, বিবর্ণ, অস্থি-চর্ম্মসার কঙ্কালমাত্র—রোগ শয্যায় শায়িত। সেই যে শান্ত সুন্দর কমনীয় রূপ তাহার কিছুমাত্র নাই!

"দেখ, যুবক, রূপ দেখিয়াছিলে; এখন রূপের বিকৃতি দেখ। রূপ পুণ্যের ফল, পাপসংস্পর্শে রূপ বিকৃত হইয়া যায়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন দুর্ম্মন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন আমি অর্থহীন, সহায়হীন, অশ্রুমাত্র আমার সম্বল। এক পক্ষ অনাহারে অনিদ্রায় এবং অশ্রুজলে অতিবাহিত করিলাম।

"যে কুলকলঙ্কিনীদিগের সহিত বাস করিতেছিলাম তাহাদের এক-

জনের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। সে আমাকে অনেক বুঝাইল, অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল—অনুরোধ করিল; কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম; সে শিক্ষার ফল আমি সহজে ভুলিতে পারিলাম না।

"আমার স্খলিত চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া আমার সঙ্গিনী আমাকে এক নূতন পথ দেখাইয়া দিল। এক দিন সে আমাকে বলিল—'একজন বাবু থিয়েটারের জন্য একজন নৃত্যগীতকুশল স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিতেছেন। তুমি লিখিতে পড়িতে জান, এবং তোমার গলাও বেশ মিষ্ট, তুমি যদি বল, আমি তোমাকে সেই বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিব।' সে আমাকে বুঝাইল, আমি যে বেতন পাইব তাহাতে আমি স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আমি সম্মত হইলাম।

"বাবুর সহিত পরিচয় হইল। তিনি ভদ্রবংশজাত। আমার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে থিয়েটারে আমার চাকরী হইল। তিনি আমাকে আরও অধিক অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু আমার রুচি ভিন্ন বুঝিতে পারিয়া কলা বিদ্যায় পারদর্শিতা অনুসারে ভবিষ্যতে আমার যথেষ্ট উন্নতি হইবে এইরূপ ভরসা দিলেন।

"অনন্যমনে অধ্যবসায়ের ফলে অল্পদিনে রঙ্গালয়ে আমার সুযশ হইল। মুসলমান নায়িকার অংশ অভিনয় করিতে আমার সমকক্ষ আর কেহ রহিল না।

"মনে হয় প্রথম অভিনয় রজনী। সেই জনবহুল, দীপালোকোজ্জ্বল নাট্যশালা; দর্শকদিগের আগ্রহ এবং সোৎসুক প্রতীক্ষা। যখন নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম দর্শকদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম—তখন মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় বড় দুর্ব্বল বোধ হইল;—মনে হইল,ঐকান্তিক শিক্ষা এবং সাধনা বুঝি সব বিফল হইয়া যায়! মনে মনে ডাকিলাম—'আল্লা, আমাকে বল দাও।' অনেক দিন আল্লাকে এমন প্রাণ ভরিয়া ডাকি নাই। খোদা মেহেরবানি করিয়া আমার কাতর আহ্বান শুনিলেন। দুই অঙ্ক অভিনয়ের পর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

"তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমার গীত। সেই আমার প্রথম প্রকাশ্যে গীত। সে গীত কি ভুলিবার?

'ওসে কেন আসে না?
আসি বলে চলে গেল আর এলোনা।'

"ভৈরবী রাগিণীর কোমল মধুর প্রাণস্পর্শী মূর্চ্ছনা রঙ্গালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন স্তরে স্তরে ঢেউ খেলিয়া দর্শক-মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া তুলিল, ঘন ঘন—'বাহবা', 'বহুৎ আচ্ছা' প্রভৃতি উৎসাহ-সূচক শব্দে তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-প্রবাহ বহিয়া গেল। সেই গীতের ধ্বনি এবং করতালির প্রতিধ্বনি যেন এখনও আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে।

"সেই ক্ষুদ্র একটি সঙ্গীতেই আমার যশঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। সে যে আমার প্রাণের গীত। আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে সেই গীতের প্রতি শব্দ যে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল তাহা কয়জন অনুভব করিয়াছিল? সর্ব্বান্তঃকরণে যখন আমি সেই গীত গাহিতেছিলাম, তখন যে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম; তদ্গত ভাবে আমার প্রণয়াস্পদের উদ্দেশে গাহিতে-ছিলাম—

'ও সে কেন আসে না?
আসি বলে চলে গেল আর এলোনা!'

সে যে আমার প্রাণের নিদারুণ নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া সেই করুণ কাতর আহ্বান সমুত্থিত হইয়াছিল। অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়া; স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া আমি যে প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলাম—'তারে বড় ভালবাসি।' হায়, লাঞ্ছনা!"

সুবোধ চন্দ্রের মনে হইল, সেই রোগশয্যাশায়িনী কঙ্কালাবশিষ্টা রমণীর নেত্রযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া হত-ভাগিনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

"এমনই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার যশঃসূর্য্য উত্তরো-ত্তর অধিকতর ভাস্বর হইতে লাগিল। একদিন অভিনয়ান্তে রজনী-প্রভাতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমাদের পরিচারিকা বলিল, এক-জন বাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। এমন অনেক ভদ্রলোক

মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন এবং আমাকে বিরক্ত করিয়া অপ্রিয় কথা শুনিয়া ক্ষুন্নমনে চলিয়া যাইতেন। আমি দাসীকে বলিয়া দিলাম—'আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা, আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি; বাবুকে ফিরিয়া যাইতে বল।' দাসী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু আমার পূর্ব্বপরিচিত, বিশেষ আবশ্যক আছে, সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। অগত্যা তাঁহাকে আমার কক্ষে আহ্বান করিলাম।

"বাবু আর কেহ নহেন, সেই বিশ্বাসঘাতক—সয়তান—দুষমন। কেমন করিয়া বলিব, বৎসরাধিক কাল পরে সেই দুরাচারকে দেখিয়া আমার হৃৎপিণ্ড কত দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আবার কেন আসিয়াছ?' শুনিলাম, 'আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; আমাকে ক্ষমা কর।' বলিলাম, 'ক্ষমা,—এতদিন পরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? কিন্তু তুমি যে ক্ষমার অযোগ্য।' উত্তর শুনিলাম, 'যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমা ত সকলেই করিয়া থাকে। তাহাতে বিশেষত্ব কি? অযোগ্যকে যে ক্ষমা করে—তাহার ক্ষমায় মনুষ্যত্ব আছে। আবার বলিলাম, 'মনে আছে তোমার প্রতিজ্ঞা? সেই যে দিন অমাবস্যার অন্ধকারে পিতামাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, লাজধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, তোমার হাত ধরিয়া কুলত্যাগ করিয়াছিলাম, মনে আছে সেই দিনের প্রতিজ্ঞা? উভয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিব?' শুনিলাম, 'আমাকে আর লজ্জা দিও না। আমার অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা কর, মেহের।'

"মেহের—মেহের! মেহের মরিয়াছে—অনেক দিন মরিয়াছে। আবার কেন মেহেরকে ডাক? না, না; ডাক, আবার আমার সেই পুরাতন নাম ধরিয়া—সেই পুরাতন, পরিচিত চিরবাঞ্ছিত সুধামাখা স্বরে ডাক। প্রতারক তোমার কপটতায় অনেক দুঃখ যাতনা সহ্য করিয়াছি;—তবু ডাক। ঐ নামের সহিত আমার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত। সে বড় সুখের স্মৃতি—বড় মধুর।

"আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মা'র কথা মনে হইল। মা ডাকিতেন—মেহের। সে কি স্নেহের ডাক! পিতার কথা মনে হইল। পিতা ডাকিতেন—মেহের। অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল।

"সে সুযোগ বুঝিয়া আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আমাকে চুম্বন করিল। আমি তখন যেন আত্মহারা হইয়াছিলাম। স্বর্গগত পিতামাতার স্নেহ-স্মৃতি আমার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল; মনে হইতেছিল, সেই সুখের শৈশব, সেই সুধাময় কৈশোর,—তাহার পর সেই স্বপ্নময় প্রথম যৌবন; সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনের প্রথম অনাবিল প্রণয়। তখন চিত্তের স্থৈর্য্য—হৃদয়ের দার্ঢ্য শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। তাই সেই ভণ্ডের আলিঙ্গন, চুম্বন আমার বিভ্রম বিদূরিত করিতে পারিল না। আমি ভুলিয়া গেলাম। সে যখন ছল ছল নেত্রে প্রার্থনা করিল,—'মেহের—মেহের, আমাকে ক্ষমা করিবে না?'—তখন অতীত ভুলিয়া গেলাম—অবজ্ঞা, উপেক্ষা, লাঞ্ছনা সব ভুলিয়া গেলাম। হায়, নারীর দুর্ব্বল হৃদয়!"

সেই মুমূর্ষু মায়ামূর্ত্তি আবার নীরব হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার রোগক্লিষ্ট মুখে শান্তির ছায়া পরিলক্ষিত হইল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সে বুঝি মৃত্যুর ছায়া। কিন্তু ক্ষণপরে আবার সেই বিশীর্ণ, বিবর্ণ—মুখে বিকট ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল। নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল—"তাহার পর কিছুদিন পরে আমাকে কালরোগে ধরিল। সে রোগ কিছুতেই সারিল না। যত দিন অর্থসামর্থ্য ছিল তত দিন রোগের সহিত যুদ্ধ করিলাম। অবশেষে হাসপাতালে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। তথায় মৃত্যু আসিয়া আমার সকল পার্থিব যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল।

"বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, যাহার জন্য আমার এই দুর্দ্দশা—যাহার জন্য সব বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম—যাহাকে ত্যাগ করিয়াও গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যে বার বার আমাকে লাঞ্ছিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া চলিয়া যাইত—যে রোগের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে একবার দেখা দেয় নাই, সংবাদও লয় নাই,—মৃত্যুর পূর্ব্বে হাঁসপাতালের রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছিল। মনে হইত, যদি একবার তাহাকে দেখিয়া মরিতে পারি তাহা হইলে বুঝি জীবনের সকল অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হয়—সকল দুঃখের জ্বালা ভুলিতে পারি। দিনের পর দিন তাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছি—বিন্দু বিন্দু অশ্রু গণ্ডে গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিয়াছে, ধাত্রীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু

যাহার সহানুভূতি ও সেবার উপর অধিকার আছে মনে করিতে পারিতাম, সে একটি দিন—একটি বারও দেখিতে আইসে নাই।'

"যুবক, আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তোমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে—তোমার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু যাহার এক বিন্দু অশ্রুর জন্য আমি অকাতরে জন্ম জন্ম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিতাম এবং যাহার অশ্রু আমার দুঃখে স্বতঃউৎসারিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার চক্ষু তখন জলিতেছিল কি নিবিয়া গিয়াছিল তাহা একবার জানিবার অবকাশ পাই নাই। এখন ঘৃণার আবরণে প্রণয় আবৃত করিয়াছি—হৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বালিত করিয়াছি—তবুও সেই কালপ্রণয়কালকুটের প্রদাহ সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে—তুষের আগুনের ন্যায় এখনও হৃদয়ে ধিকি ধিকি জলিতেছে। এ আগুণ কি কখন নিবিবে না—এ বিষের মোহ কি কখন কাটিবে না? রমণীর প্রণয় কি এত গভীর!"

মায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শয্যোপরি বসিল; তাহার পর আবেগভরে বলিতে লাগিল—"যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বার দেখা দিত, অন্ততঃ মৃত্যুর পর আমার সৎকার করিত, তাহা হইলে আমার দেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইত না,—আমার হাড় বিদ্যার্থিগণের নিকট বিক্রীত হইত না এবং তাহা হইলে আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতাম।

"যুবক, তুমি আমার একটি উপকার করিবে? কল্য প্রত্যুষে আমার বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ডসকল একত্রিত করিয়া জনৈক মৌলবীসাহায্যে আমায় কবর দিবে? কবর হইলে আমি বোধ হয় মুক্ত হইব; মুক্ত হই না হই, তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

তাহার পর সুবোধচন্দ্র দেখিল—সে শয্যা নাই, সে নারীমূর্ত্তি নাই;—আছে একটি সংযুক্ত সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল। আর সেই কঙ্কাল বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। ভয়ে সুবোধচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই শব্দে হরিমোহনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। হরিমোহন ডাকিল—"সুবোধ, সুবোধ।"

ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে সুবোধ উত্তর দিল, "কি, মামা।"

"তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ,—ভয় পাইয়াছ কি?"

তখন মেজের উপর খট্‌খট্‌ শব্দ হইতেছিল। সুবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"মামা কিসের শব্দ হইতেছে।"

হরিমোহন বলিল—"মাথার হাড়ের ভিতর বোধ হয় আবার ইন্দুর ঢুকিয়াছে।"

হরিমোহন আলো জ্বালিল। মনুষ্যমস্তকাস্থি শয্যানিম্ন হইতে বহু দূরে নীত হইয়াছে। হরিমোহন সেইটি হাতে করিয়া তুলিবামাত্র তন্মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র ইন্দুর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

প্রত্যূষে সুবোধচন্দ্র সেই অস্থিখণ্ডসকল মৌলবীসাহায্যে কবরস্থ করিয়াছিল কি না সে সংবাদ জানা যায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগ্রহ

বিবিধ।

হেষ্টিংস হাউস।

আলিপুরের হেষ্টিংস হাউস সরকারের সম্পত্তি। ইহার সহিত অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। কেবল কাহিনী নহে, পরন্তু একটি অলৌকিক রহস্যও ইহার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। এ পর্য্যন্ত সেই রহস্যের উদ্ভেদ হয় নাই। সংপ্রতি সরকার এই ঐতিহাসিক উদ্যান বাটিকাটি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের চেষ্টায় লর্ড ক্রু আপাততঃ সেই চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে হেষ্টিংস হাউস সম্বন্ধে নানা কথাই বিলাতী ও এ দেশী সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে। এফ্, এচ, টি, সাক্ষর করিয়া অনৈক লেখক সংপ্রতি এই ঐতিহাসিক উদ্যান বাটিকা সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

কলিকাতার উপকণ্ঠে, আলিপুরে হেষ্টিংস হাউস অবস্থিত। কর্ম্মকোলাহলমুখরিত কলিকাতার কলরব তথায় প্রবেশ করে না। কেবল পার্শ্বস্থিত রাজপথে মোটরকার ও ট্রামগাড়ির ঘর্ঘরধ্বনি এখন মধ্যে মধ্যে ইহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকে। ইহার চারিদিকেই সমুচ্ছ্রিত শাখিরাশি সুশোভিত। সম্মুখে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ও বক্র রাজপথ। বাতায়নসান্নিধ্যে সরল তালতরু মৌন শাস্ত্রীর ন্যায় দণ্ডায়মান। গৃহসান্নিধ্যেই একটি সুন্দর পুষ্করিণী। হেষ্টিংস যখন ঐ গৃহ নির্ম্মিত

হেষ্টিংস হাউস।

করিয়াছিলেন,—তখন ও তাহার বহুদিন পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত উহা উক্ত গৃহবাসী লোকদিগের জল সরবরাহ করিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে তরুরাজি সজ্জিত,—উহাদের ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীর অবকাশমধ্য দিয়া স্থানে স্থানে মন্দুরাদি লক্ষিত হয়।

কলিকাতায় অনেকগুলি প্রাচীন সৌধ বর্ত্তমান আছে,—কিন্তু সেগুলি বড় পুরাতন তাহাদিগকে তত পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। দুই শত বৎসরের পুরাতন বাড়ী কলিকাতায় অনেক আছে। হেষ্টিংস হাউস তাদৃশ পুরাতন নহে। তবে উহা ক্রমশঃ পুরাবস্তুর মধ্যে

অবস্থা।

গণ্য হইবার যোগ্যতালাভ করিতেছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেখিলে সন্নিহিত অনেক আধুনিক বাড়ী অপেক্ষা ইহাকে নূতন বলিয়াই মনে হয়।

এই গৃহখানির ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সম্ভবতঃ হেষ্টিংস স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। কলিকাতায় ও তাহার সান্নিধ্যে অনেক গৃহেই তিনি বাস করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে এখন বার্ণ কোম্পানীর আফিস, সেই বাড়ীই

হেষ্টিংসের বিভিন্ন ভবন।

হেষ্টিংসের অন্যতম বাসভবন ছিল। ঐ বাড়ীর বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে হেষ্টিংসের আমলের পাখা এখনও দোদুল্যমান। উক্ত গবর্ণর জেনারেল যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সহিত ভোজনে বসিতেন, তখন ঐ পাখাই তাঁহাদিগের নিদাঘতাপতপ্ত দেহ শীতল করিত। উহা এখন কৌতূহলোদ্দীপক পুরাবস্তু বলিয়াই তথায় রক্ষিত আছে। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে যে সৌধে এখন লোয়েলিন কোম্পানীর অফিস, উহা এক সময় 'গবর্ণমেণ্ট হাউস' ছিল। উহার যে গৃহে ব্যবস্থাপক পরিষদের বৈঠক বসিত সে গৃহ এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। হেষ্টিংস কিছু দিনের জন্য রিষড়ার হেষ্টিংস মিল গৃহে ও বেলভেডিয়ারে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় নাই। সেইজন্য তিনি তরুচ্ছায়াসমন্বিত আলিপুরে উদ্যান বাটিকার ন্যায় একটি গৃহ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। উহার চারি দিকেই পল্লীশোভা বিরাজমান। সামাজিক সম্মিলন-ব্যাপারে কিছুকাল বেলভেডিয়ার প্রাসাদই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে হেষ্টিংস বেলভেডিয়ার প্রাসাদ ভাড়া দিয়াছিলেন। যে সময় হেষ্টিংসের সহিত ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বৈরথযুদ্ধ হইয়াছিল,—সেই সময় বেলভেডিয়ার মেজর টলি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। এই মেজর টলির নাম আদিগঙ্গার নামের সহিত জড়িত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ; আলিপুরের প্রান্তবাহিনী আদিগঙ্গার অন্য নাম টলির নালা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হেষ্টিংস হাউস বৃহৎ গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সে সময়ের সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে,—ইহাতে একটু বিস্মিত হইতে হয়। মিসেস্ কে.

ক্ষুদ্র গৃহ।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিসেস হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উহাকে সুন্দর ক্ষুদ্র বাটিকা বলিয়াছেন। ঐ বৎসর ব্যাক্রেবী লিখিয়াছেন,—"কর্ণেল মন্‌সন্ আমাদের সহিত পল্লীভবনে ভোজন করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে আমরা পদচারণ করিতে করিতে গবর্ণরের নবনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে গেলাম। বাড়ীখানি সুন্দর ও ক্ষুদ্র; কিন্তু উচ্চ। ইহাতে বায়ুপ্রবাহের

অবাধ গতি। উহার অত্যুজ্জল দুগ্ধফেনশুভ্রকান্তি নয়নে ধন্দ উৎপাদন করে।" লেখক ঐ বৎসর বলিয়া কোন্ বৎসরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? তাঁহার লিখা পড়িলে মনে হয়, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আলেকজাণ্ডার ম্যাক্রেবী ও জর্জ্জ মন্‌সন্ উভয়েই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। ঐ সময় হেষ্টিংস হাউস কেবল মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং উহা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দেরই কথা।

প্রায় সমস্ত আলিপুরটাই হেষ্টিংসের সম্পত্তি ছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথম ভাগে পুরাতন গৃহ ও তৎসংলগ্ন উদ্যান, দ্বিতীয় ভাগে নূতন গৃহ ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি এবং তৃতীয় ভাগে বৃতিবেষ্টিত মাঠ। সম্ভবতঃ মেজর টলি বেলভেডিয়ার খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। যে য়ুরোপীয় হেষ্টিংসের শকটচালকের কার্য্য করিত তাহার ভাগেও অনেক জমী মিলিয়াছিল। সে ব্যক্তি কলিকাতায় বাস করে। ঐ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার বংশধরগণ বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

হেষ্টিংসের সম্পত্তি।

এই প্রাচীন বাটীতে অনেক লোক বাস করিয়াছেন। অনেকে সপরিবারে ইহাতে বাস করিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গৃহে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বাস করিয়াছিলেন। অনেক সুপ্রসিদ্ধ পরিদর্শক ও ভারতীয় রাজন্য এই বাড়ীতে রজনী যাপন করিয়াছেন। তিব্বতের দলই লামাও এই গৃহে কয়েক দিন ছিলেন।

ইদানীন্তন অধিবাসী।

হেষ্টিংস কি কারণে এই গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। সম্ভবতঃ ব্যারণেস্ ইম্‌হফের বসবাসের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই রমণীকে উত্তরকালে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বুঝিয়া উঠা কঠিন। হেষ্টিংসের সহিত উক্ত রমণীর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায়না। সাধারণ লোকের এই সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটিই এখন অতীতের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। নৈতিক দৃষ্টতে হেষ্টিংস ও ইম্‌হফ দম্পতির আচরণ দুষ্ট বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্যাপারটি মূলতঃ এইরূপ। ইম্‌হফ জাতিতে জর্ম্মাণ। তিনি মান্দ্রাজ সেনাবিভাগে একটি সামান্য পদ পাইয়া বিলাত হইতে সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন। যে জাহাজে ইম্‌হফ দম্পতি ভারতে আসিতেছিলেন, সেই জাহাজেই হেষ্টিংস লণ্ডন হইতে মান্দ্রাজে আসিতেছিলেন। হেষ্টিংস উক্ত জাহাজে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইম্‌হফপত্নী সযত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সঞ্চার হয়। মান্দ্রাজে আসিয়া ইম্‌হফ দেখিলেন যে, সামান্য পতাকী সেনার বেতনে তাঁহার সংসার চলা অসম্ভব। সেই জন্য তিনি সেনাবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক 'তসবীর' অঙ্কিত করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এই কার্য্যে ব্যারণ ইম্‌হফের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে হেষ্টিংস শ্রীমতী ইম্‌হফের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ইম্‌হফ তাঁহার স্বামীর সহিত কলিকাতেই আসিয়াছিলেন। হেষ্টিংসও পরে

ইম্‌হফ ও হেষ্টিংস।

গবর্ণর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ইহা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শুনা যায়, তাহার পর ইমুহফ,তাঁহার পত্নী ও হেষ্টিংস তিন জনে মিলিত হইয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, শ্রীমতী তাঁহার পতির সহিত বিবাহ বন্ধন 'নাকচ' করিয়া লইবেন এবং পরে হেষ্টিংসকে বিবাহ করিবেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারণ ইমুহফ লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। তিনি দশ হাজার পাউণ্ডের (তদানীন্তন লক্ষ টাকা) অধিক টাকা লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে ঐ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইমুহফ পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সামান্য কোনও পল্লীতে ব্যারনেস ইমুহফের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। সেই বিবাহচ্ছেদ-সংবাদ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে গিয়া পৌঁছে নাই। তাহার পর হেষ্টিংস সেণ্ট জন্ গীর্জ্জায় তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপার অনেকগুলি সমস্যাবিজড়িত। প্রথমতঃ তাঁহারা তিন জনই যদি পরামর্শ করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইমুহফ তৎপরে দুই বৎসর কাল ভারতে থাকিয়া পরে বিলাতে গেলেন কেন? ঐ দুই বৎসর তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত সদ্ভাবে একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন।

সমস্যা ও সন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ ইমুহফ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কেন? তৃতীয়তঃ হেষ্টিংস ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইমুহফ-ঘরণীকে বিবাহ করেন নাই কেন? চতুর্থতঃ ইমুহফের ঔরসে হেষ্টিংস-পত্নীর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল; এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতায় বিবাহের রেজিষ্টারীতে মিস্ আন্না মেরিয়া আপলোনীয়া চাপুসেটিন এই কুমারী অবস্থার নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছিল কেন? পঞ্চমতঃ উক্ত ইমহফের সহিত তাঁহার কবে বিবাহ হইয়াছিল?

হেষ্টিংস হাউসের সহিত কোন কলঙ্কের কথা বিজড়িত থাকুক আর নাই থাকুক, (সার চার্লস লসন ও মিস সিডনী গ্রিয়ার উভয়েই বলেন যে, ব্যারণেস্ ইমুহফের ব্যভিচার-কথা অলীক) উহাতে যে একটি বা একাধিক ভূত আছে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। প্রচলিত গল্পগুলির মধ্যে একটু একটু পার্থক্যও আছে। গল্পটি কৌতুহলোদ্দীপক। একটি গল্পের মর্ম্ম এইরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেরূপ বেরুস গাড়ী প্রচলিত ছিল, সেইরূপ একখানি গাড়ী দুইটি বৃহদশ্ব

অলৌকিক কাণ্ড।

কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে ঐ বাড়ীর দিকে আগমন করে। উহার উচ্চ কোচবক্সে সাবেক ধরণের সাড়ম্বর পরিচ্ছদ পরিহিত জনৈক কোচম্যান্ বসিয়া থাকে। অশ্বের ক্ষুরশব্দ গৃহের দ্বিতলবাসীরা স্পষ্টই শুনিতে পায়। গাড়ীখানি তীরবেগে আসিয়া গাড়ীবারান্দায় প্রবেশ করে। গৃহস্থিত লোকগণ উহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দ্বারদেশে আগমন করে; আসিয়া দেখে কোথাও কিছুই নাই। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দ্বারা এই গল্প সমর্থিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন।

আর একটি গল্প এইরূপ।—গাড়ী দেখা যায় না,—উহার ঘর্ঘর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া

যায়। ভিতরের লোকগণ একখানি গাড়ী আসিতেছে এইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। দ্রুতগতি অশ্বের পদশব্দ ও শকটচক্রে নিষ্পিষ্ট কঙ্করের মড় মড় শব্দ স্পষ্টই শ্রুত হয়। ক্রমে অশ্বের গতি মন্দীভূত হইয়া শেষে থামিয়া যায়। বোধ হয় যেন গাড়ীখানি গাড়ীবারান্দায় নিয়ে থামিল। তখন কেবল অশ্বের দীর্ঘশ্বাস ও নাসিকাধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি, দণ্ডায়মান অশ্বের পদাঘাতশব্দ, মস্তকসঞ্চালন-জনিত সাজের শব্দ, গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে শুনা যায়। কে আসিল দেখিবার জন্য লোক দ্বারদেশে আসিয়া দেখে কোথাও কিছুই নাই।

দ্বিতীয় কথা।

প্রথম ব্যাপারটি অপরাহ্নে ও দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সংঘটিত হয়।

প্রবাদ, এই স্থানে একটি ভোজের আয়োজন হয়; কিন্তু কোনও ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু বা হত্যার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহার হয় নাই। কিন্তু এই বাড়ীতে এমন কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ নাই। তবে কি হেষ্টিংস ও তাঁহার পত্নী আগমন করেন? অথবা যাহারা ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের কেহ? ইনি কি নন্দকুমার? কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবে না। তবে এই ভৌতিক গল্প বাড়ীটিসম্বন্ধে কৌতূহলকে বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত করে।

ব্যাপার কি?

——:*:——



মদ্রজা।

চিত্রকর—রবিবর্ম্মা।

রাধা।

গভীর বরষা-রাতি ঝর ঝর ঝরে বারিধার,
আঁধিনীরে মেঘমালা ঢালিতেছে হৃদয়ের ভার।
অপহৃত-করজ্যোতি তারাকুল দেখা নাহি যায়,
সলজ্জ আকুল আঁখি আর নাহি চাহিছে ধরায়;
শুধু ঘন মেঘময় সীমাহীন অনন্ত গগন,
সান্দ্র অন্ধকারপাতে অন্তহীন অর্ণব যেমন।
মাঝে মাঝে চপলার দীপ্তিময় আলোক চঞ্চল
আঁধার গগন-বক্ষ তুলিতেছে করিয়া উজ্জ্বল।
মাঝে মাঝে শুনি যেন জলদের স্তনিত গভীর,
নদীকূলে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে হইয়া অধীর।
সে অন্ধ অম্বরতলে অন্ধকার যমুনার জল,
কোন্ দূর সিন্ধুপানে ছুটিয়াছে করি কল কল;
বিরহান্তে মিলনের সুখ সম বর্ষাবারিরাশি,
প্লাবিয়া হৃদয় তা'র দুই কূলে উঠিছে উচ্ছ্বসি।
উঠিছে তরঙ্গরাশি বরষার চল সমীরণে;
শত খণ্ডে ভাঙ্গি' পড়ে বরষার বরষতাড়নে।
নবস্ফুট কদম্বের মৃদু বাস করিয়া বহন
বহিছে শীকর-সিক্ত বরষার তীব্র সমীরণ।
বিকচ কদম্বকুল ছড়াইছে সৌরভ বাতাসে,
বরষার বনভূমি পূর্ণ তা'র সুরভিনিশ্বাসে।
আঁধার বরষা-রাতি প্রাণিকুল সুষুপ্তিমগন—
শুধু জাগে কুঞ্জগৃহে রাধিকার তৃষিত নয়ন।
বিপ্রলব্ধা একাকিনী কুঞ্জগৃহে সজল নয়নে,
জাগরণশ্রান্ত আঁখি কা'র আশে চাহে পথপানে!
বরষার বায়ুবেগে কাঁপি' উঠে বৃক্ষপত্রচয়,
কা'র পদশব্দ ভাবি' কাঁপি' উঠে তৃষিত হৃদয়!
বারিপাতে বনভূমে জাগি' উঠে মৃদু মর মর,
হৃদয় চমকি' উঠে ভাবি' কা'র বাঁশরীর স্বর!
কোলে মালা—শোভে তাহে সর্ব্ব ঋতু কুসুমের শোভা,
বিকশিত স্থূল নীপ মধ্যভাগে শোভে মনোলোভা।

ব্যর্থ অভিসারসাজে বসি' একা শুধু পড়ে মনে
বিশদ কদম্বমূলে পীতাম্বর মুরলীবদনে ;
সজল জলদ অঙ্গে স্বর্ণপ্রভা নেহারি' চঞ্চল,
মনে পড়ে শ্যাম-অঙ্গে পীতধড়া শোভে সমুজ্জ্বল ;
শুনি' বনে বৃক্ষপত্রে পবনের মৃদু মর মর,
মনে পড়ে মাধবের মুরলীর মধুময় স্বর ;
কদম্বসৌরভভরা পবনের মৃদু পরশনে
মনে পড়ে কেশবের স্নেহভরা সাদর চুম্বনে ;
হেরি' বাতবিকম্পিত দীপশিখা নিকুঞ্জ-ভবনে
কৃষ্ণের চঞ্চল প্রেম তাই আজ পড়ে শুধু মনে।
অমলকমলদল তৃষাতুর নয়নযুগল
অশ্রুপূর্ণ ; পদ্মপর্ণে শোভে যেন নিরমল জল।
ব্যথিত—তৃষিত দৃষ্টি কুঞ্জদ্বারবদ্ধ দু'নয়নে,
হৃদয়ের ভাব যেন প্রকাশিত নয়ন-দর্পণে।
প্রণয়কমলকলি ফুটিয়াছে হৃদয়-সরসে
কা'র সে বাঞ্ছিত পদে সাধ যায় সঁপিতে হরসে।
এমনি নিঠুর সে কি লবে না এ প্রেম উপহার ;
এমনি পাষাণ-হৃদি চাহিবে না ফিরি' একবার ?
ব্যর্থ অভিসারসাজে কুঞ্জগৃহে বসি একাকিনী,
এমনি কি যা'বে কাটি' বরষার বিরহ-যামিনী ?
পরাণে সুখের আলো নিবে যায় নিরাশা আঁধারে ;
পরাণে প্রেমের সুখ ডুবে যায় বিষাদ-পাথারে,
পরাণের শত আশা মিশাইয়া যায় হতাশায়,
জোছনা-আলোক যথা মেঘময় বরষা-নিশায়।
হতাশায়—বেদনায়—আশঙ্কায় মলিন আনন,
মধুর বসন্ত-অন্তে তপ্ত বায়ে কুসুম যেমন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে বেদনায় সকরুণ স্বরে
কহিতে লাগিলা দেবী ধীরে ধীরে স্মরি' পীতাম্বরে ;
কমলনয়নযুগে অশ্রু বহি' অবিরল ধারে,
সিঞ্চিল সলিল যেন অঙ্কদেশে কুসুমের হারে :—
"হে প্রভু, হে বনমালি, যদুকুলনলিনীদিনেশ,
রাধায় নিদয় কেন আজি তুমি রাধার প্রাণেশ ?

গুণহীনা অবলার গুণহীন হৃদি উপহার
নিজগুণে কৃপা করি' রেখেছ ও চরণে তোমার ;
কৃতার্থ হয়েছি আমি লভি' ওই রাজীব-চরণ,
আজি কেন কৃপাময় মোর প্রতি নিদয় এমন ?
ধারণা-অতীত তুমি যোগিকুলসাধনদুর্লভ,
জ্ঞানের অতীত তুমি রাধিকার পরাণ-বল্লভ,
কে আমি—তোমায় পা'ব হৃষীকেশ কোন্ পুণ্যফলে,
তোমার করুণা, হরি, তাই আমি ও চরণতলে।

"তুমি কি দিয়াছ, শৌরি, স্থান মোরে তোমার চরণে
ধনী যথা অর্থ দেয় গৃহিভারে না হেরি' নয়নে ?
প্রেমপূর্ণ হৃদি মোর দেখ নাই তুমি পীতাম্বর ;
ও প্রেমপিপাসী হৃদি দেখ নাই তুমি, দামোদর ?
কুল, মান, লজ্জা, ভয় ডুবেছে যে প্রেম-পারাবারে
তুমি কি দেখনি তাহা ? তবে তুমি দেখ নি আমারে।
সে প্রেম না নেহারিয়া, দিয়া মোরে পদতলে স্থান
করিও না, হে মাধব, প্রণয়ের ঘোর অপমান।
প্রণয়ের অপমান সহিবে না হৃদয়ে রাধার,
তা' চেয়ে মরিব বহি' হৃদিভরা যাতনার ভার।

"তুমি সে সকলি জ্ঞান অন্তর্যামী পুরুষপ্রধান
তোমার প্রেমের লাগি' ব্যাকুল এ সেবিকার প্রাণ।
এস তুমি—তোমা তরে রচেছি এ হৃদয়-আসন,
হৃদয়ে আসিয়া, প্রভো, কর মোর সার্থক জীবন।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে শোভে বিমোহন ;
ভক্তিজেয়, ভক্তপ্রিয়, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ ;
খঞ্জনগঞ্জন দু'টি প্রেমপূর্ণ বঙ্কিম নয়ন ;
অধরে মুরলীখেলা ভকতের নয়নরঞ্জন ;
পীতধড়া পীতাম্বর প্রেমপূর্ণ কোমল হৃদয় :
বর গলদেশ বেড়ি' বনমালা শোভে শোভাময়।
ভকতবৎসল হরি, ভকতের হৃদয়রঞ্জন
তৃষিত নয়ন মোর, আজি মোরে দাও দরশন।
হের আজি একবার, প্রাণনাথ, হৃদয় রাধার
বরষা-আকাশ সম আলোহীন—অনন্ত আঁধার ;

আজি মোর দু'নয়নে ঝরিতেছে নয়ন আসার
বরষা বারিদে যথা ঝরিতেছে বারি অনিবার।
এস প্রভু, দয়াময়, কর মোর সার্থক জীবন
রাধিকার আঁখি-আলো রাধিকারে দাও দরশন।
হেরিয়া তোমায়, হরি, ঘুচিবে এ বেদনা রাধার
চন্দ্রোদয়ে ঘুচে যথা নিশীথের ঘন অন্ধকার।

"না—না কায নাই, সখা, আর আর আসিয়া হেথায়
তিমিরমগন বনে কত ব্যথা পা'বে পায় পায়!
কণ্টক-আকীর্ণ পথে, ক্ষত হ'বে রাতুল চরণ
বেদনাব্যথিত হ'লে ম্লান হ'বে কমল-আনন।
তবে আজ থাক্, সখা, র'ব আমি বেদনা সহিয়া
কৃতার্থ হইবে রাধা যবে পা'বে চরণ পূজিয়া।"

বুদ্ধ গয়া।

(৩)

হিউয়েন্থ সাং বলিয়াছেন, অশোক বোধিদ্রুমটি ১০ ফিট উচ্চ পাষাণ বৃতি-বেষ্টিত করিয়াছিলেন। যে ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তির উপর এই বৃতি অবস্থিত ছিল তাহার পরিমাণও হিউয়েন্থ সাং প্রদত্ত পরিমাণের অনুরূপ। এখনও বুদ্ধ গয়ায় প্রাচীন পাষাণবৃতির অবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই বৃতির কতকাংশ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ও কতকাংশ মন্দিরপার্শ্বস্থ মোহান্তের গৃহ-প্রাঙ্গণে ছিল। লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশানুসারে, সার উইলিয়ম ডিউকের ও মন্দিররক্ষক পরলোক-গত শ্রীগোপাল বসু মহাশয়ের চেষ্টায় সকলগুলি সংগৃহীত ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে সংস্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ বৃতি অন্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। বৃতির স্তম্ভগাত্রে, বোধিদ্রুম, ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মচক্র, কল্পদ্রুম, বোধিদ্রুমাভিমুখগামী মাল্যবাহী দেব-মূর্ত্তি, লক্ষ্মী, জেতবন, নৌকা, ভূমিকর্ষণ, প্রভৃতি চিত্র ক্ষোদিত। দুই একটি স্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাও অশোকের রাজত্বকালে ব্যবহৃত লিপি।

রাজেন্দ্রলাল ও কানিংহাম উভয়েই এই বৃতি অশোকের দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডাক্তার ব্লক বলেন, বর্ত্তমানে বুদ্ধ গয়ায় অশোকের কোন কীর্ত্তিচিহ্নই নাই। তিনি অশোককর্ত্তৃক বোধিদ্রুমপূজা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন; এবং বলেন, বুদ্ধ গয়ার বৃতি অশোকের শতবর্ষ পরবর্ত্তী। তিনি বলেন, বৃতি-গাত্রে পঞ্চদশবার যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ সকল বৃতি মাহিয়সী মহিলা কুরঙ্গীর উপহার। দুইটি সমরূপ লিপিতে প্রকাশ ইনি ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের পত্নী।* একটি বিভগ্নলিপিতে এই ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের নামও পাওয়া যায়। আর এক স্থানে লিখিত, ইহা ব্রহ্মমিত্রপত্নীর দান। ব্লকের বিশ্বাস, উত্তর ভারতে বহু তাম্র মুদ্রায় যে ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের ও ব্রহ্মমিত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে—ইঁহারা সেই ইন্দ্রাগ্নিমিত্র ও ব্রহ্মমিত্র। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধ গয়ার বৃতি অশোকের শতবর্ষপরবর্ত্তী।

এই সকল লিপিই কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। তিনিও এই সকল লিপি-সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বৃতি অশোকের উপহার। কুরঙ্গীর অর্থ কুরঙ্গ-নয়না। বৌদ্ধ সাহিত্যে কুরঙ্গী মৃগজাতকও আছে। সারী-পুত্রের জননীর নয়ন সারীর নয়নের মত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সারিকা হইয়াছিল। কানিংহাম লিপির অক্ষরের আকারে নির্ভর করিয়া বলিয়া-ছিলেন, বৃতি অশোকের সময়ের। ডাক্তার ব্লক সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। বৃতির লিপিতে উল্লেখিত ব্রহ্মমিত্র ও ইন্দ্রাগ্নিমিত্রই যে মুদ্রাঙ্কিতনাম ব্রহ্মমিত্র ও ইন্দ্রাগ্নিমিত্র তাহাও তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় পর্য্যাপ্ত প্রমাণে পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত মত খণ্ডিত না হইলে আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারি না। মিষ্টার মার্সাল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর 'জার্ণালে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাক্তার ব্লকের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পূর্ব্বমত পরিহারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যে স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধানও করেন নাই—ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের স্থানে ইন্দ্রমিত্র লিখাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভিনসেণ্ট স্মিথও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কোন কারণদর্শন প্রয়োজন মনে করেন নাই!

হিউয়েন্থ সাং বলিয়াছেন, বুদ্ধ গয়ায় অশোক একটি ক্ষুদ্র বিহার নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন (খৃঃ পূঃ ২৫৯—২৪১); তাহার পর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়।

* কানিংহাম বলেন, ভ্রাতৃজায়া জীবার কন্যা কুরঙ্গী।

সিংহাসনারোহণকালে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; পরন্তু তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কথা বলার অপরাধে তিনি স্বহস্তে পঞ্চশত মন্ত্রীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। একদিন পুরাঙ্গনারা তাঁহার শ্রীহীনতায় বিদ্রূপ করিয়া উপবনস্থ অশোকতরুর পত্র ছিন্ন করিলে তিনি পঞ্চশত রমণীকে দগ্ধ করাইয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মতের প্রচারকার্য্যে অকাতরে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উপগুপ্তের সহিত বুদ্ধের স্মৃতিপূত স্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। লুম্বিনী উদ্যানে ১০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া ও স্তূপনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া তিনি কপিলবস্তু হইয়া বুদ্ধ গয়ায় আগমন করেন এবং তথায় ১০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন ও চৈত্যনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই মন্দিরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বরহুতের ভগ্নস্তূপে অশোকের এই মন্দিরের দুইটি প্রতিকৃতি ক্ষোদিত আছে; উভয়েরই পশ্চাতে বোধিদ্রুম দণ্ডায়মান। একটিতে লিখিত আছে—"ভবগতো শক মুনিনো বোধি"। চিত্রে দেখা যায়, এই মন্দিরের ছাত স্তম্ভোপরি অবস্থিত; মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন; বজ্রাসনের পশ্চাতে বোধিদ্রুমের কাণ্ড দৃষ্ট হইতেছে; দ্রুমের দুই পার্শ্বে অনুচ্চ স্তম্ভোপরি ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মচক্র; বজ্রাসন-গৃহের দুই পার্শ্বে দুইটি কক্ষ। বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কারকালে যখন হর্ম্ম্যতল খনিত হয় তখন দেখা যায়, বর্ত্তমান আসনের পশ্চাতে আর একখানি আসন বর্ত্তমান। তাহার পশ্চাতে আর একখানি আসন দৃষ্ট হয়। এই আসন বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে—ইহা মন্দিরের উত্তর প্রাচীর হইতে ৩৯ ইঞ্চ ও দক্ষিণ প্রাচীর হইতে ২০ ইঞ্চ দূরবর্ত্তী। কানিংহাম অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির অবশেষ পাইয়াছিলেন। তাহার সহিত বরহুতে ক্ষোদিত মন্দিরের সাদৃশ্যে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

বুদ্ধ গয়ার বর্ত্তমান মন্দির কত দিনের তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে বিশেষ মতান্তর লক্ষিত হয়। চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন্থ সাংএর বর্ণনাই বিস্তৃত।—তিনি মন্দিরের যে বর্ণনা ও পরিমাণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি বর্ত্তমান মন্দিরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘকালে মন্দির বহু বার সংস্কৃত হইয়াছে এবং সংস্কারে পরিবর্ত্তনও যে না হইয়াছে এমন নহে।

কানিংহামের বিশ্বাস খৃষ্টীয় ৩০০ বা ৪০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ফার্গুসন যে বলিয়াছেন ব্রহ্মদেশীয়গণ উহা পুনর্গঠিত করে, তাহা প্রামাণ্য নহে। লিপিতে দেখা যায়, তাহারা মন্দিরের সংস্কারমাত্র করিয়াছিল।

ফার্গুসন প্রথমে বলেন, বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।* পরে তিনি ঐ মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন, বহুবিধ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত নবতল মন্দিরের আদর্শ। বোধ হয় চীন প্রভৃতি দেশের নয় তল মন্দির ইহারই আদর্শে গঠিত।× ফার্গুসনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু রিজ ডেভিডস্ সত্যই বলিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়াও ভারতীয় শিল্পীদিগের কীর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁহার চেষ্টা অসাধ্যসাধনচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দুই এক স্থানে ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এ স্থলে তিনি যে প্রমাণে নির্ভর করিয়া মন্দিরটিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়াছিলেন,সে প্রমাণ বিশেষ বিচারের ফলে কানিংহাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সংপ্রতি মিষ্টার বার্জ্জেস ফার্গুসনের প্রসিদ্ধ পুস্তকের যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতেও পূর্ব্বমত পরিত্যক্ত হয় নাই।

যে প্রমাণের উপর নিভর করিয়া কানিংহাম এই মন্দিরটিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বুদ্ধ গয়ায় প্রাপ্ত ৯০৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে, এই মন্দির অমরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই অমরদেব বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের অন্যতম এবং বিখ্যাত 'অমর কোষ' অভিধান প্রণেতা। ইনি বরাহমিহির ও কালিদাসের সমসাময়িক; সুতরাং প্রায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এই শিলালিপিতে প্রকাশ, অমরদেব বুদ্ধ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই গল্পের সহিত হিউয়েন্থ সাং লিখিত গল্পের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। দুই বিবরণেই প্রকাশ, দেবাদেশে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হয়। কেবল হিউয়েন্থ সাং দেবতাকে মহাদেব বলিয়াছেন, আর শিলালিপিতে বুদ্ধেরই উল্লেখ আছে।

* J. A. S. B. Vol III.

× *Indian and Eastern Architecture.*

কিন্তু এ লিপির কথায় আর বিশ্বাস সংস্থাপনের উপায় নাই।

হিউয়েন্থ সাং বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের কথায় বলিয়াছেন;—"বোধি-দ্রুমের পূর্ব্বদিকে একটি বিহার বিদ্যমান। উহা ১৬০ হইতে ১৭০ ফিট উচ্চ;—উহার তলদেশ ২০ পাদ (৫০ ফিট) হইবে। এই বিহার নীলাভ ইষ্টকে গঠিত এবং প্রলেপাবৃত। ইহাতে স্তরে স্তরে কুলঙ্গী আছে। প্রতি কুলঙ্গীতে বুদ্ধের স্বর্ণরঞ্জিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত। চারি দিকে প্রাচীর সুন্দর স্থাপত্যকার্য্যে, মুক্তামাল্যে ও ঋষিদিগের মূর্ত্তিতে শোভিত। চূড়ায় স্বর্ণ-রঞ্জিত তাম্রনির্ম্মিত আমলক ফল। পরে ইহার পূর্ব্বদিকে (বা সম্মুখে) একটি দ্বিতল মণ্ডপ গঠিত হইয়াছিল। মন্দির মুক্তারত্নখচিত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে শোভিত। বহির্দ্বারের দক্ষিণে ও বামে দুইটি বৃহৎ কুলঙ্গী—দক্ষিণে অবলোকিতেশ্বরের ও বামে মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিদ্বয় রৌপ্যনির্ম্মিত ও প্রায় ১০ ফিট উচ্চ।"

এই বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান মন্দিরের বর্ণনার সাদৃশ্য এমনই সুস্পষ্ট যে, হিউয়েন্থ সাং যে বর্ত্তমান মন্দিরই দেখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাদৃশ্যের বিশেষ বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল:—

(১) বর্ত্তমান মন্দিরের আকার হিউয়েন্থ সাং বর্ণিত মন্দিরের আকারের সমান। ইহারও ভিত্তি ৪৮ ফিট, উচ্চতা ১৬০ হইতে ১৭০ ফিট। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভগ্ন অবস্থায় ইহা ১৬০ ফিট উচ্চ ছিল; এক্ষণে, সংস্কারের পর, ১৭০ ফিটের কিছু অধিক হইয়াছে।

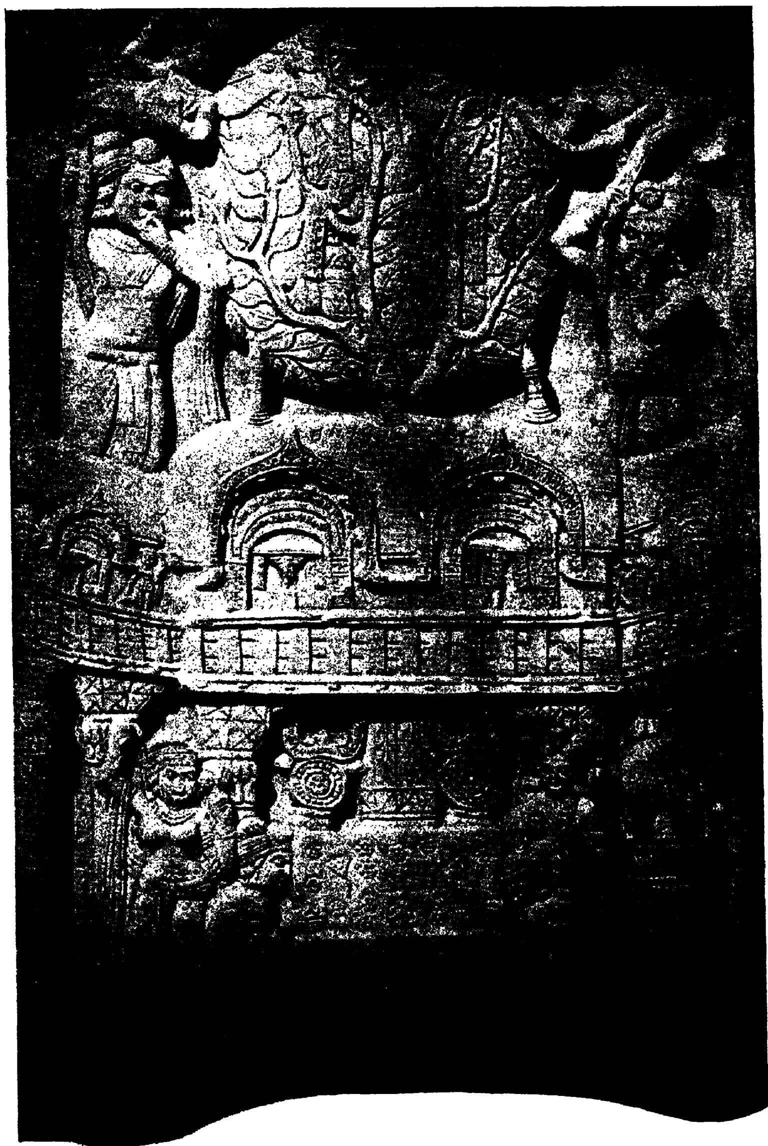
(২) বর্ত্তমান মন্দির নীলাভ ইষ্টকনির্ম্মিত ও প্রলেপাবৃত।

(৩) বর্ত্তমান মন্দিরের চারি দিকে স্তরে স্তরে কুলঙ্গী আছে। পূর্ব্বে এই সকল কুলঙ্গীতে বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল। কানিংহাম যখন প্রথম মন্দির দেখিয়াছিলেন তখন তিনটি মাত্র মূর্ত্তি ছিল।

(৪) পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-মণ্ডপ যে পরে নির্ম্মিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার ইষ্টকের সংস্থাপনরীতি মন্দিরের ইষ্টকের সংস্থাপনরীতি হইতে স্বতন্ত্র।

পরবর্ত্তীকালে গঠিত পোস্তগুলিতে মন্দিরের প্রাচীর আবৃত হইয়াছিল। সেগুলি অপসৃত হইলে হিউয়েন্থ সাং বর্ণিত মন্দিরের সহিত বর্ত্তমান মন্দিরের সাদৃশ্য সপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

হিউয়েন্থসাং আরও বলিয়াছেন, নালন্দার বালাদিত্য মন্দির বুদ্ধ গয়ার



বুদ্ধ গয়ায় অশোকের মন্দির।

মন্দিরের অনুরূপ ছিল। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিম্নাংশ (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) এখনও বিদ্যমান, সুতরাং দুই মন্দিরে তুলনার সুবিধা আছে। বাস্তবিক, দুই মন্দিরের গঠনরীতিগত সাদৃশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হিউয়েন্থ সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়,—নালন্দার মন্দিরের উচ্চতা ৩০০ ফিট; কিন্তু তাঁহার জীবনীতে লিখিত আছে, উহার উচ্চতা ২০০ ফিট। নালন্দার মন্দিরের তলদেশ ৬৩ ফিট ও বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের তলদেশ ৪৮ ফিট। উভয় মন্দিরের গঠনরীতি এক প্রকারের হইলে বুদ্ধ গয়ার মন্দির যখন ১৬০ বা ১৭০ ফিট উচ্চ, তখন নালন্দার মন্দির ২০০ ফিট উচ্চ হওয়াই সম্ভব।

এই সকল কারণে মনে হয়, ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাং যে মন্দির দেখিয়াছিলেন, বুদ্ধ গয়ায় অদ্যাপি সেই মন্দিরই বিদ্যমান এবং বৃটিশ গভমেণ্ট প্রায় ২০০০১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাহারই সংস্কার করাইয়াছেন।

কিন্তু এই মন্দির যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে গঠিত তাহার প্রমাণ কি? মন্দির যদি সত্য সত্যই অমরদেব কর্তৃক নির্ম্মিত হইত তবে হিউয়েন্থ সাংএর আগমনকালে তাহা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইত না এবং তাহার নির্ম্মাতার নামও হয়ত উল্লিখিত হইত। হিউয়েন্থ সাংএর বর্ণনায় মনে হয়, মন্দির তখনও বহুদিনের।

মন্দিরের সংস্কারকালে কানিংহাম একটি মৃৎপিণ্ড পাইয়াছিলেন। সেই পিণ্ডমধ্যে যে সকল দ্রব্য দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর এবং সুবর্ণে হুবিষ্কের মুদ্রার ছাপ খৃষ্টীয় ১২০ হইতে ১৬০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সময়েই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরের বৃতির দক্ষিণ দ্বারের নিকটস্থ একটি ভগ্ন মন্দিরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তির বেদী পাওয়া গিয়াছে। বেদীতে যে লিপি আছে তাহার অক্ষর ও ভাস্করকার্য্য গুপ্ত-কালীন। ইহা ৬৪ সম্বতের। সুতরাং ইহা যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কানিংহামের গণনায় এই বৎসর খৃষ্টীয় ১৫২। এই সময় হুবিষ্ক রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সময় হুবিষ্কের অর্থসাহায্যে বুদ্ধ গয়ার বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়।

ইহার পর মন্দির বহু বার সংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বুদ্ধ

গয়ায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত মন্দিরই দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারতে এরূপ প্রাচীন মন্দির আর নাই।

বুদ্ধ গয়ায় কেবল স্থাপত্যনিদর্শন নহে, পরন্তু ভাস্করকার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃতিগাত্রে ও মন্দিরগাত্রে ভাস্করকার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাস্তবিক বুদ্ধ গয়ার বিরাট মন্দির বিবিধ ভাস্করকার্য্যে পূর্ণ। এই সকল ভাস্করকার্য্যে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ভাস্করকার্য্য লইয়া অভিজ্ঞদিগের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। চারিটি অশ্বসংযুক্ত রথে আসীন মূর্ত্তি—সঙ্গে দুইজন ধনুর্দ্ধারী। কানিংহাম বলেন, ইহা সূর্য্যমূর্ত্তি। হিন্দুমতে সূর্য্যের রথ সপ্তাশ্বসংযুক্ত। বেদেও ইহাই দেখা যায়; আর সর্ব্বত্র শিল্পনিদর্শনে সপ্তাশ্বরথই দেখা যায়। অতএব এই মূর্ত্তি গ্রীকপ্রভাবের পরিচায়ক। রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করিয়াছেন, এ মূর্ত্তি সূর্য্যের নহে। বিস্ময়ের বিষয়, সংপ্রতি মিষ্টার মার্শালও কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়া কানিংহামের মতেরই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

কানিংহাম যথার্থই বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পে বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের তুলনা নাই। এই মন্দিরে ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। বরহুতের ভাস্করকীর্ত্তি সুঙ্গদিগের সময়ের; কিন্তু বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে অশোকের সময়ের শিল্প-নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কানিংহাম দেখাইয়াছেন, জরাসন্ধের বৈঠকে বুদ্ধের সমসাময়িক প্রস্তর স্থাপত্যের নিদর্শন বর্ত্তমান। আর এত দিনও যে উহা বিদ্যমান আছে তাহাতেই পুরাতন ভারতীয় শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য সপ্রকাশ। রিজ ডেভিড্‌স বলিয়াছেন, গিরিব্রজে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাচীরের অবশেষ দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের সহিত এ সকলের তুলনা হয় না। উভয় স্থানেই প্রস্তরগুলি সুপরিষ্কৃত নহে। আর বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছে তাহা আজও জগতের সর্ব্বস্থানের শিল্পসমালোচকের বিস্ময় উৎপাদিত করিতেছে।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানের ফলে এই মন্দিরে প্রাপ্ত উপাদান হইতে ভারতীয় শিল্পের বহু সমস্যার সমাধান হইবে।

—:—

উপাসনা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—ইহা উপাসনারাজ্যের এ একটি গূঢ় কথা। যাহার মন দুর্ব্বল ঈশ্বর তাহার লভ্য নহেন। উন্নত হইতে হইলে আপনাকে একটা উচ্চ আদর্শের নিকটে লইতে হয়। ঈশ্বর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। প্রথমতঃ আমরা জগৎ-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই যে বিটপী-সমাচ্ছন্ন শ্যামল উদ্যান, নক্ষত্রখচিত নীলাম্বর, তরঙ্গতাড়িত তটিনী, উন্নতকায় গিরিশ্রেণী, এগুলি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে একটু ভাবের আবেশ হয়। এইগুলি কি, কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে সকলেই সেই চিন্তা করিয়া থাকে। সকলের চিন্তা একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলেও একটি ভাব প্রত্যেক উপাসকের সাধারণ সম্পত্তি; তাহা দর্শকের বিস্ময়। এই বিস্ময়ের কারণ চিন্তা করিয়া আমরা ইহাই পাই, প্রকৃতিরাজ্যে কতকগুলি দুরধিগম্য বিষয় আছে। যাঁহারা উহা তত্ত্বতঃ দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়,—এই রহস্যময়ী প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হওয়ার নামই উপাসনা।

সুনীল অম্বরে যখন নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া জ্বলিতে থাকে, চন্দ্রের অমল ধবল কিরণ পৃথিবীর গাত্রে পড়িয়া হাসিতে থাকে, তখন উহাদের দিকে চাহিয়া কি আমরা বিস্মিত হই না? প্রথম বিস্ময়ের কারণ, চন্দ্রের প্রভাময়ী শক্তি, দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ স্রষ্টার শিল্পচাতুর্য্য। চন্দ্র যদি আমার অপেক্ষা সুন্দর, বৃহৎ, দীপ্তিশালী না হইত, তাহা হইলে কি সে আমার এত বিস্ময়ের কারণ হইত?—কখনই নহে। আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সে আমার বিস্ময়ের পাত্র। যখন এই বিস্ময় স্থিরতর হইয়া উঠে, তখন চন্দ্র আমার উপাস্য। এইরূপে জগতের যাবতীয় সুন্দর, বৃহৎ, পদার্থ কোন না কোন সময় মনুষ্যের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, মনুষ্যমণ্ডলীও উহাদের উপাসনা করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি বিরাট পদার্থগুলি কোন এক সময় ভারতের লোকের উপাস্য ছিল—এখনও আছে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ নহে।

মনুষ্যের সঙ্গে উহারা সমধর্ম্মী নহে বলিয়া মানুষ চিরকাল উহাদের উপাসনায় পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। উপাস্যের বিরাট ভাব স্তম্ভিত

করে বলিয়াই উপাসক উপাসনাদ্বারা তাঁহার ন্যায় বিরাট হইবার কল্পনা করে।

প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটি দিক আছে, একটি ভিতর, অপরটি বাহির। যে এই দুইটি দিকের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত দর্শক। উপাসক উপাস্যের এই দুইটি দিক দর্শন না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। কেবল পরিতৃপ্ত নহে, উপাস্যের নিকট হইতে উপাসক মনোরাজ্যের উন্নতির জন্য যে উপদেশ চাহেন, উহা উপাস্যের কেবল বহির্ভাগ দর্শনে লাভ করিতে পারেন না। উপাস্যের সঙ্গে উপাসকের হৃদয়ের বিনিময় থাকা প্রয়োজন। যে উপাসনায় তাহা হয় না, সে উপাসনা অসম্পূর্ণ। এই জন্য জড়ের উপাসনা অসম্পূর্ণ। হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, সাগরের ন্যায় শক্তিশালী অথচ ভাব-রাজ্যের যে সর্ব্বসুখাবহ—রাজরাজ্যেশ্বর যাঁহার সঙ্গে আমার মনের বিনিময় চলে, এমন যদি কেহ থাকেন, তিনি আমার উপাস্য।

মনুষ্য যতই ইন্দ্রিয়-রাজ্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিবে, ততই উপাস্যের দৈহিক সৌন্দর্য্যের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া উহার ভাবের পিপাসা প্রবল হইবে, এবং ততই সে জড়ের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একধর্ম্মী শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপাসনার আকিঞ্চন করিবে। মনুষ্যই যদি মনুষ্যের প্রকৃত উপাসক হয়, তবে কোন্ প্রকার মনুষ্যের উপাসনা করিলে আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হইতে পারে? মনুষ্যের ভিতর যাহারা মুক্ত পুরুষ তাহারাই আদর্শ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির দুইটি পথ; একটিকে দেবযান ও অপরটিকে ধূমযান কহে। যাঁহারা দেবযান ধরিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, আর যাঁহারা ধূমযান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে উপাসকের জন্য এই দুইটি পথ স্থিরীকৃত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানান্বেষণ করিয়া উপাসক দেবযান প্রাপ্ত হয়েন, আর ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যাদি-দ্বারা উপাসক ধূমযান প্রাপ্ত হয়েন। এই দেবযান ও ধূমযানের কথা গীতা ও প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়, বেদান্তেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

যখন কোন উপাসকই ব্রহ্ম প্রাপ্তির পর পুনরাবর্ত্তন করিতে চাহেন

না, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে সাম্যতা লাভ করিয়া চিরকাল যাহাতে সেই ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল উপাসকের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের অনেক পন্থা আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ প্রশস্ত। ঈশ্বর জ্ঞানময় সুতরাং তাঁহার গুণগুলির আলোচনা করিতে হইলে সাধককে জ্ঞানার্জ্জন করিতেই হইবে। এই জ্ঞান দ্বিবিধ—পরা ও অপরা। পরাবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, অপরাবিদ্যা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভে এই দুইটি বিদ্যাই সাহায্য করে। তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব ঐ দুই বিদ্যার সাহায্যে ধারণা করিতে পারিলে তৎপ্রতি সাধকের ভক্তি জন্মিয়া থাকে। এই ভক্তি যে সময় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ভক্ত তখন উপাস্যকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম্মের এত নৈকট্য সম্বন্ধ আছে যে, জ্ঞান হারাইলে ভক্তি স্থায়ী হয় না, ভক্তি হারাইলে কাহার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিবে? এই জন্য উপাসনাপথে জ্ঞান সর্ব্বদাই কার্য্যোপযোগী। উহার নূতনতায় সাধনের অন্তরায় হয়।

জ্ঞানের ফলে যখন ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন ভক্তি অচলা রাখিবার জন্য সাধকের সর্ব্বদা উন্নত হইবার প্রবল বাসনা থাকা চাহি। যে সর্ব্বদা নীচ থাকিতে চাহে, সে কদাপি উন্নত আদর্শের ধারণা করিতে পারে না।

উপাস্য সাকার হইলে তিনটি বিভাগের প্রতি সাধকের দৃষ্টি রাখিলেই চলে। যথা শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক। উপাস্য বলবান হইলে দুর্ব্বল তাহার উপাসনায় আনন্দ পায় না। তদ্রূপ উপাস্য সংযমী হইলে অসংযমী তাহার উপাসনায় স্ফূর্ত্তি পায় না। কেবল ইহাই নহে, উপাস্য যদি সহস্র প্রলোভনজয়ী বীর হয়েন, তাহা হইলে সেই সংযমী পুরুষ তাঁহার বীরত্বে—আনন্দিত হইতে পারেন যে, অন্ততঃ একটি প্রলোভন জয় করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে পরিয়াছেন। স্থূল কথা, উপাস্যকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে সব বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ সেই সব বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করা চাহি। অনেকে বলেন, উপাসনার সময় উপাস্যের নিকট প্রার্থনা করিলে উপাসক ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় পূর্ব্বের প্রার্থনাগুলি স্মরণ করিয়া

উন্নতির ও অবনতির পরিমাণ করিয়া লওয়া উচিত। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উপাসক যদি তদনুযায়ী সৎ হইতে আন্তরিক চেষ্টা না করেন, ভগবান তাহা হইলে সে প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা আন্তরিক ও ক্রমোন্নতিবিধায়ক হওয়া চাহি। উপাসনার এগুলি অঙ্গ হইলেও পূর্ণাঙ্গ নহে। এইরূপ উপাসনার নিয়ম অবলম্বনে উপাস্যের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, নিজের উন্নতি হয়, কিন্তু উপাস্য সাক্ষাৎ হয়েন না। উপাস্যকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। এই যোগসাধন ভিন্ন কেহই চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হয়েন না। কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তৎ সম্বন্ধে কঠোপনিষদ বলিতেছেন, যচ্ছেদ্বাঙ্‌ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্‌ যচ্ছেজ্জ্ঞান জ্ঞান আত্মনি জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত বরিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্‌ আত্মাতে অর্থাৎ জীবাত্মাতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন।

এইরূপে যখন মন বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া উপাস্যের প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখনই ধ্যানের অবস্থা। এই ধ্যান তৈলধারার ন্যায় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রবাহমান থাকা চাহি। এই অবস্থা দুই এক দিনের সাধনায় হয় না, ক্রমশঃ এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য সাধনা করিতে হয়। এই অবস্থায় উন্নীত হইলে চতুর্ব্বেদ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি গহন বিষয়গুলিও অবোধ্য থাকে না। এই জন্য ধ্যান অপরা ও পরাবিদ্যার মূল। একমাত্র যোগী ইহার সাহায্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন। বিষয় হইতে মনকে ভগবৎ রাজ্যে লইবার জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন, আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে লাগাম বলিয়া জান। কিরূপ স্থানে বসিয়া কিরূপ ভাবে ধ্যান করিতে হইবে, উহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

গীতায় এই যোগের স্থান উচ্চতম। যোগের চরম উপদেশ এই—

আমাতে মন অর্পিত কর, আমাকে যাজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর, এইরূপ যোগ করিলে আমাতে মিলিত হইবে। যোগের ইহা সার উপদেশ, উপাসনারও ইহা চূড়ান্ত কথা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

জীবন-বৈচিত্র্য।

প্রেম।

(২)

প্রেম হৃদয় দিয়া দেখে বলিয়া রূপের অপেক্ষা কোমল হৃদয়ের অধিক পক্ষপাতী। সে কুলমর্য্যাদার পরিবর্ত্তে প্রীতি-প্রবণ অন্তঃকরণ অন্বেষণ করে এবং যথায় এরূপ অন্তঃকরণ দেখিতে না পায় তথায় রূপের হাটবাজার বসিলেও সে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ডেস্‌ডিমোনা বলিয়াছিলেন, "আমি ওথেলার মুখশ্রী তাঁহার মানস-পটে দেখিয়াছিলাম।" একজন প্রেমিক কবি বলেন, "যে চক্ষু আমার প্রতি প্রেম-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে আমি তাহাতে কোনও জ্যোতি দেখিতে পাই না।" এ কথা প্রেমিকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। প্রেমিক নিজ প্রণয়িনীর নয়নে যে হৃদয়হারী প্রেমালোক দেখিতে পায়েন তাহা অন্য কোনও সুন্দরীর চক্ষুতে দেখিতে পায়েন না বলিয়া তাহাদের রূপ তাঁহার নজরে লাগে না। এইজন্য নারী মাত্রেই তাহার প্রণয়ীর নয়নে স্বর্গের দেবী এবং অপরের নিকট নারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোক বলে যে, বিবাহকালে বর ও বধূর দেহে হর গৌরীর আবির্ভাব হয়; এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

প্রেম হৃদয় দিয়া শুধু দেখে না, শুনেও হৃদয় দিয়া; এই জন্য প্রেমের শ্রবণ-শক্তি নিরতিশয় তীক্ষ্ণ। তোমার জীবিতেশ্বরী যতই মৃদুপাদবিক্ষেপে তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করুন না কেন, তোমার হৃদয় তাঁহার সেই নিঃশব্দকল্প পদসঞ্চার শুনিতে পায়। তিনিও সংসারের যে কোনও কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকুন না কেন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাগ্রে তোমার যানের শব্দ শুনিতে পায় এবং তখন তিনি তোমায় দর্শনোন্মুখী হইয়া বাতায়নের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়েন। একজন তরুণবয়স্ক সাহিত্য-সেবক অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার স্বল্পায়তন শয়নকক্ষেই সাহিত্য-সেবা করিতেন। তাঁহার তরুণী সহধর্ম্মিণীকে সাংসারিক নানাকার্য্যব্যপদেশে ঐ গৃহে দণ্ডে দণ্ডে যাতায়াত করিতে হইত; পাছে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে স্বামীর স্বাস্থ্যনাশ হয় এই উৎকণ্ঠাও যে তাঁহার আনাগোনার একটি মুখ্য কারণ ছিল না তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, পাছে স্বামীর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তিনি

প্রবেশনিস্ক্রমণক্রিয়া রুদ্ধশ্বাসে ও নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার কর্ম্মগতচিত্ত স্বামীর হৃদয়ের অগোচর থাকিত না। তিনি যতক্ষণ ঐ গৃহে উপস্থিত থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার স্বামীর লেখনী কি এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে বিদ্যুদ্বেগে চলিত এবং নব নব ভাব লিপিবদ্ধ করিত। জগতের সাহিত্য প্রেমের এইরূপ অতর্কিত সাহায্যে কত বাড়িয়া যায় কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুইটি প্রেমিক হৃদয় পরস্পরকে একটি মাত্র বিলোল কটাক্ষ বা মৃদু স্মিতের তারযোগে কি সুস্পষ্ট সংবাদ প্রেরণ করে! যিনি এরূপ সংবাদ কখনও পাইয়াছেন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমি যাহাকে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত করিয়াছি তাহারই চলিত নাম গুণ। প্রেমবিহঙ্গ রূপের ফাঁদে ধরা পড়িলেও কেবল গুণের পিঞ্জরে জন্মের মত বন্দী হয়। জোয়ারের জলের ন্যায় রূপ ও যৌবন দেখিতে দেখিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রূপ যতই কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, গুণ ততই আরও বদ্ধমূল হয়। কাল নারীর দেহ হইতে যে সৌন্দর্য্য অপহরণ করে তাহা উঁহার হৃদয়পুটে অকাতরে ঢালিয়া দেয়। বিবাহের দিন স্মরণ করিলে কাহার না আনন্দ হয়? আহা সেই ব্রীড়াবনতমুখী বালিকাটির সুখ দুঃখ যখন জন্মের মত আমার হস্তে ন্যস্ত হইল, তখন শুভ-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কি এক বর্ণনাতীত মমতার উদয় হইল! কিন্তু তখন তাহার গুণের কোনও পরিচয় পাই নাই। বহুদিন একত্র সহবাস না করিলে সে পরিচয় কখনই লাভ করা যায় না। এই জন্য নবোঢ়া যতই আদরের হউক না কেন, সে সম্যক পরিচিতা পত্নীর ন্যায় কখনই স্বামীর হৃদয়ের হৃদয় ও প্রাণের প্রাণ হয় না।

এ দেশের বিবাহপ্রথা পাশ্চাত্য পরিণয়প্রথা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। আমরা যেমন বিনানির্ব্বাচনে পিতা, মাতা, সোদর, সোদরা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ লাভ করি এবং প্রকৃতির অনতিক্রম্য বিধানে তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিখি, সেইরূপ বিনা নির্ব্বাচনে স্ত্রীলাভ করি ও অল্প বয়স হইতেই তাহাকে ভালবাসিতে শিখি। স্ত্রী-নির্ব্বাচনে আমাদের নিজের হাত থাকে না বটে; কিন্তু আমাদের কোনও বিশেষ হিতৈষী গুরুজন প্রায় ঐ ভার গ্রহণ করেন। আমি সমাজ-সংস্কারকের উচ্চ আসন গ্রহণেচ্ছু নহি এবং আমাদের বর্ত্তমান বিবাহপ্রথার দোষ গুণ বিচার এই প্রবন্ধের

উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি এই দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যদিও আমরা স্বয়ম্বর প্রথার কবিত্বে বঞ্চিত; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের বিবাহিত জীবনের সুখ মোটের মাথায় পাশ্চাত্য পরিণীত জীবনের সুখাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে. এবং বাল্যবিবাহ যতই দোষাবহ হউক না কেন, উহার দ্বারা দুইটি চিত্তের একীকরণ যত সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এমন আর কিছুতেই নহে। নদী যেমন সমুদ্রে পড়িলেই সমুদ্রের স্বভাব পায়, সেইরূপ বালিকার তরল হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত অতি সহজ ও সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। প্রেমের প্রথম সঞ্চার কি মধুর! একটি দীর্ঘনিশ্বাস উহার প্রধান পরিচায়ক, সুতরাং উহাতে যে যাতনা নাই, তাহাও বলিতে পারি না। একটি সরল-হৃদয়া বালিকা একবার বিশেষ পীড়াপীড়িতে স্বীকার করিয়াছিল যে, বিবাহের অল্পদিন পরে সে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার স্বামীর জন্য তাহার "মন কেমন" করিয়াছিল। ঐ বালিকাটি নিশ্চয়ই নবোদিত প্রেমের যাতনাময় সুখ অনুভব করিয়াছিল। কিশোরীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে প্রেম একটি ক্ষীণ দীপশিখারূপে উদিত হয় তাহাই আবার যুবতীর হৃদয়ে জ্বালামুখীরূপে প্রকাশ পায়। প্রেমের বিকাশ দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীদ্বারা ক্রমশঃ সংসাধিত হয়। দাম্পত্যজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি, একটি যুবক ও একটি যুবতী প্রেমে আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে। তাহাদের মুখ দেখিলেই বোধ হয়, তাহারা কল্পনা-রাজ্যের প্রজা, সংসারের সুখদুঃখে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। কয়েক বৎসর পরে দেখি, তাহারা আর কেবল পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া নাই; দুই জনে একটি পরম সুন্দর শিশুকে আদর করিতেছে, বারম্বার উহার মুখচুম্বন করিতেছে এবং উহাকে ক্রমান্বয়ে একজনের ক্রোড় হইতে অপরের অঙ্কগত করিতেছে। কিন্তু দুইজনের মুখ দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, এই নূতন জীবটি উহাদের প্রেমে ভাগ বসাইয়া তাহাকে শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে এবং উহারা এখন সমসুখে সুখী হইয়া পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে দেখি, সেই শিশুটি আর নাই, এবং তাহার বিয়োগে উভয়ে কাতর নয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করি-ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহারা দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে যেমন দুইটি মাত্র ছিল এখন আবার তেমনই; কিন্তু জীবনের সুখদুঃখ সমভাবে

ভোগ করিয়া তাহাদের যুগল হৃদয়ের বন্ধন এখন কত দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাদের প্রেম কত ঘনীভূত হইয়াছে! দাম্পত্য প্রেম কৃত্রিম পুষ্পের ন্যায় "গ্ল্যাসকেসে" সংরক্ষিত হইবার বস্তু নহে। উহা নিত্য "ঘর্ সরিবার" জিনিস। উহা যেমন জীবন-সংগ্রামের প্রধান সহায়, সেইরূপ উহা জীবনের সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া না যাইলে পরিপুষ্ট ও বলীয়ান্ হয় না। আমরা যেমন প্রথম বয়সে প্রেম-পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হই, সেইরূপ মধ্য বয়সে প্রেমের পরিণত ফল ভোগ করি এবং মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া শেষ বয়সের সম্বল করি।

প্রথম যৌবনে প্রেমের সহিত রূপজ মোহ মিশ্রিত হইয়া প্রেমের শুভ্র জ্যোতিকে বিবিধ রমণীয় বর্ণে রঞ্জিত করে। এ বয়সের প্রেম সেই জন্য অতীব মনোরম তাহাতে সন্দেহ নাই এবং উহার স্মৃতি কোনও কালে বিলুপ্ত হয় না। দম্পতী নিবিড় আলিঙ্গনে পরস্পরের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটি পর্য্যন্ত শুনিতে পায়েন ও অনুভব করেন, পরস্পরকে দেখিয়া ও পরস্পরের কথা শুনিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেন না এবং তিলেক বিচ্ছেদ ঘটিলে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়েন। কিন্তু মধ্য বয়সে হৃদয়ের যেরূপ পরিণতি হয় যৌবনে কদাপি সেরূপ হয় না। এই বয়সে রূপজ মোহের ঘোরও কাটিয়া যায়। সুদীর্ঘ পরিচয়ে হৃদয়ের আবরণগুলিও একে একে খসিয়া পড়ে এবং প্রেম স্নেহসারে পরিণত হয়। যৌবনের প্রখর প্রেম সৌর কিরণের ন্যায় দাহিকাশক্তি-বিশিষ্ট; মধ্য বয়সের প্রেম জ্যোৎস্নার ন্যায় হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও সুশীতল করে। আমি এই জন্য মধ্য বয়সের প্রেমের সমধিক পক্ষপাতী। বৃদ্ধ বয়সের প্রেম বড়ই বিরল ও বিঘ্নবহুল। যোটের পারাবতের একটি খসিলে অপরটির প্রাণ বাঁচান ভার। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রেমিকযুগলের একত্রাবস্থান প্রায় ঘটে না, কিন্তু যদি ঘটে, তবে সে দৃশ্য বড়ই মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ। বুড়া-বুড়ীর প্রেম দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রেম রূপ বা শারীরিক শক্তির অধীন নহে। উভয়েরই রূপ গিয়াছে, শরীরে শক্তি নাই এবং মৃত্যুও আসন্নপ্রায়; কিন্তু তবুও বুড়াবুড়ীর পরস্পরের প্রতি প্রেম কিরূপ অটুট ও অটল। তাঁহারা নবীন যৌবনের প্রেমের স্মৃতি বুকে করিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়েন। আমি এক প্রাতঃস্মরণীয় স্থবির-মিথুনকে জানিতাম। তাঁহারা পঁয়ষট্টি বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেম শেষ পর্য্যন্ত অটল ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

যাঁহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়াছে তিনি যেমন জ্ঞানবিষয়ক বৃথা বাগাড়ম্বর করিতে ভালবাসেন না, সেইরূপ প্রকৃত প্রেমিকের মুখে প্রেমের কথা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমরা পুরুষ জাতি প্রেমসম্বন্ধে যত কথা কহি তাহার এক সহস্রাংশও কি নারীর মুখে শুনিতে পাই? বলিহারি নারীর প্রেম! নারীর ন্যায় কে ভালবাসিতে পারে? পুরুষের প্রেম পুরুষের জীবনের ও হৃদয়ের একদেশমাত্র অধিকার করে। কিন্তু নারীর প্রেম নারী-জীবনের একমাত্র ব্রত এবং নারী-হৃদয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এই জন্যই বুঝি প্রেমের রাজধানী নারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত! কিন্তু অবলার কোমল হৃদয়ে বাস করিয়াও প্রেমের কি প্রবল প্রতাপ! প্রেমের অস্ত্র মৃদু হইলেও কি সাংঘাতিক! একটি কোমল কটাক্ষ, একটি মৃদু স্মিত, একটি মধুময় চুম্বন কত বিশ্ববিজয়ী বীরের হৃদয় ভেদ করিতে পারে! প্রেমের কণ্ঠস্বরও কি বিচিত্র। মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার বলেন যে, যখন প্রেম কথা কহে তখন সকল দেবতার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং সেই সঙ্গীতের প্রভাবে স্বর্গের নিদ্রাবেশ হয়। গল্প আছে যে, রডল্‌ফ্‌ নামক একজন জল্লাদের এরূপ হস্ত-লাঘব ছিল এবং তাহার অস্ত্রও এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, সে রাজাজ্ঞায় যাহার শিরশ্ছেদ করিত সে ব্যক্তি কোনও যন্ত্রণাই অনুভব করিত না! উক্ত ঘাতুক একদা এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলে সে বলিল, "আমার এখনও শিরশ্ছেদ হয় নাই, কারণ তাহা হইলে আমার মস্তক গ্রীবাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইত এবং আমিও যাতনা বোধ করিতাম।" এই কথা শুনিয়া রডল্‌ফ্‌ ঈষদ্ধাস্য করিয়া ছিন্নশিরের নাসাগ্রে এক টিপ নস্য ধরিল। যেমন একটি হাঁচি হইল অমনই ছিন্ন মস্তক গ্রীবা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল এবং দর্শককগুলী হইতে রডল্‌ফের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। একজন ভাবুক বলেন যে, রডল্‌ফ্‌ যেমন লোকের অজ্ঞাতসারে শিরশ্ছেদ করিত সেইরূপ কামিনীগণ আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লয়েন এবং আমরা তাঁহাদের প্রেমে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বপ্নেও ভাবি না যে, আমরা মরিয়াছি। কিন্তু আমি বলি, আমরা যেমন রমণীর প্রেমে প্রাণ হারাই তেমনই রমণী আবার তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কি যেন এক নূতন প্রাণের বায়ুমণ্ডল সৃষ্ট করেন। রমণী আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লয়েন বটে, কিন্তু উহার বিনিময়ে নিজের অমূল্য মধুভরা হৃদয়টি আমাদিগকে সমর্পিত করেন। এ বিনিময়ে কোন্ পক্ষের লাভ হয়, সে প্রশ্নের উত্তর

প্রেমিক দিবেন। রমণী-হৃদয়ের কি মূল্য আছে? এক একটি ভোগবিলাস-বিরতা রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যাহাকে হৃদয়সমর্পণ করেন তাহাকে ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা করেন। এরূপ প্রকৃতির নারীরত্নের প্রেম ধর্ম্মের উচ্চতম শিখরে উঠে এবং কিছুতেই বিচলিত হয় না। যিনি এরূপ প্রেম ভাগ্যক্রমে লাভ করেন, তিনি ধন্যাদপি ধন্য। আমার এক পরলোকগত বন্ধু এইরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলেন। সেই ললনাকুলললাম মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমি সকলের মায়া কাটাইয়াছি; কেবল তোমার মায়া কাটাইতে পারিতেছি না।" আমার আর একটি বন্ধুর পত্নীও স্বামীকে ইষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। একবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কিয়দ্দিবসের জন্য বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথা হইতে স্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে আহ্নিক পূজায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না, পূজায় বসিলেই আমার কেবল তোমাকে মনে পড়ে।" বাহুল্য-ভয়ে এরূপ অপর দৃষ্টান্তের আর উল্লেখ করিলাম না। রুগ্নশয্যায় নারী-হৃদয়ের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ পরিচয় আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেই দেবদুর্ল্লভ সেবা পাইবার লোভে রোগকেও আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।

একজন কবি নিজের ভাগ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে যত উৎপীড়িত করিতে চাহ কর, কেবল আমার প্রিয়তমাকে আমার করিয়া দাও।" বাস্তবিক যিনি বহুপুণ্যফলে একটি প্রেমময়ী গুণবতী রমণীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, তিনি সেই স্বর্ণতরীখানির সাহায্যে রোগ, শোক, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুস্তর সংসার-পাথারের সকল দুঃখই অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, বঙ্গসাহিত্যের চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্রচিত সূর্য্যমুখীর অমর চিত্রে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরিত্রের ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রেম সকল অবস্থায় অনুকূল হইলেও সম্পদের অপেক্ষা বিপদে বিশেষ সহায়। প্রণয়িনীর সহিত দিনান্তে এক ঘণ্টাকাল বিশ্রম্ভালাপে কাটাইতে পারিলে মানুষের সকল দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। হৃদয়ভরা সহানুভূতির কাছে কি কোনও কষ্ট তিষ্ঠিতে পারে? দুরবস্থা ঘটিলে লোক স্বভাবতঃ

এমনই অভিমানপরতন্ত্র হয় যে, কেহ তাহাকে সৎপরামর্শ দিতে আসিলেও সে আপনাকে অপমানিত বোধ করে। কিন্তু তাহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী যখন প্রণয়বিকম্পিত সুধামাখা স্বরে তাহার দুরবস্থা মোচনের উপায় বলিয়া দেন তখন সে বিনা বিতর্কে সে উপদেশ পালন করে।

আমি এতক্ষণ রমণী-হৃদয়ের যে সকল গুণ ব্যাখ্যা করিলাম তাহা সাধারণতঃ সকল দেশের পক্ষেই খাটে। কিন্তু চিরপ্রচলিত অবরোধপ্রথা-বশতঃই হউক অথবা জাতীয় প্রকৃতিপ্রভাবেই হউক আমাদের দেশের ললনাগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ শালীনতা তাঁহাদের প্রেমকে ব্রীড়াজনিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভূষিত করে। ভারতচন্দ্র এ দেশের গৃহলক্ষ্মীর কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

"নয়ন অমৃতনদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হ'লে মৌনভাব কেহ টের পায় না॥"

বাস্তবিক আমাদের কুললক্ষ্মীরা যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই সীমাবদ্ধ; কেবল তাঁহাদের প্রেমের কোনও অবধি নাই।

"সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্ণঃ পরং লক্ষ্যতে।"

আমাদের কুলাঙ্গনাদের লজ্জার কথা আর অধিক কি বলিব? একটি কুলাঙ্গনা বিবাহের পর অন্যূন তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শয়ন কক্ষের আলোক যতক্ষণ না নির্ব্বাপিত হইত ততক্ষণ স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এরূপ লজ্জাশীলতা ভালই হউক বা মন্দই হউক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে সেই সঙ্গে প্রেমের খর্ব্বতা হয়। সে ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করিতে পারিবে না। প্রেমের ন্যায় অমূল্য নিধি রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন। কখন এরূপ ঘটে যে, একখানি জাহাজ প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে তীরের অনতিদূরে আসিয়া জলমগ্ন হয়। সেইরূপ প্রেম অনেক গুরুতর কষ্ট বা অপমান অকাতরে সহ্য করিয়া কখন কখন অতি

তুচ্ছ কারণে ভগ্ন হয়। অপরের হৃদয়বীণার তারগুলি কখন কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা আমরা জানিতে পারি না বলিয়া আমরা কখন কখন একটি সামান্য শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া অথবা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রেমের কোমল প্রাণে এরূপ দারুণ আঘাত করি যে, তাহার অশুভ পরিণাম আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। যাঁহারা বিবাহিত জীবন সুখে কাটাইতে ইচ্ছা করেন আমি তাঁহাদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন প্রণয়িনীর দোষ সংশোধন করিতে গিয়া প্রেম-তরুর মূলে কুঠারাঘাত না করেন। একসঙ্গে ঘর করিতে গেলে দম্পতীর বড় একটা সাজগোজের দিকে লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং পরস্পরের দোষগুণ পরস্পরের অবিদিত থাকে না। ছোট ছোট দোষ প্রেমের ঔদার্য্যগুণে না ধরাই শ্রেয়ঃ। প্রণয়িনীর গুরুতর দোষ দেখিলে উহার সংশোধনের বিধিমত চেষ্টা অতি সন্তর্পণে ও বিশেষ সহৃদয়তার সহিত করিতে হইবে। কিন্তু সাতদোহাই প্রেমের, রসিকতার খাতিরেই হউক অথবা রোগ বা আকস্মিক বিরক্তিবশেই হউক, তোমার প্রাণের প্রাণকে কদাচ অবজ্ঞা বা ব্যঙ্গ করিও না। ব্যঙ্গ শয়তানের ভাষা, প্রেমের অভিধান হইতে একেবারে বর্জ্জিত। প্রেমের বীণা বড় দরদ করিয়া বাজাইতে হয়—

"তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।"

প্রেমের একাধিপত্যে ভাগ চলে না—

"প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ. সয় না কথার টান,
প্রেম সরু সুতায় বাঁধাবাঁধি, বাতাসের তো ভর সবে না।"

এক একজন লোক এরূপ আত্মপ্রিয় যে তাহারা যখন কাহারও প্রতি আসক্ত হয় তখন তাহার বিষয় যত না ভাবে তাহাদের নিজের প্রেমের কথা তদপেক্ষা অধিক ভাবে। এরূপ লোক কখনও প্রকৃত প্রেম লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রণয়িনীর নিকট আত্মগোপন করে এবং আপনাকে রহস্যজালে আবৃত রাখিতে ভালবাসে সেও কখন প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হয় না। হীরকের ন্যায় স্বচ্ছপ্রকৃতিবিশিষ্ট না হইলে প্রেম লাভ করা দুর্ঘট। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীপুরুষের কেহই যেন স্বাধীন চিন্তার অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত না হয়েন। দম্পতী পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রেমের একটি প্রধান প্রত্যূহ।

প্রকৃত প্রেমের লক্ষণই আত্মলোপ; যাহার আত্মলোপ হইয়াছে সে কখনই সন্দিগ্ধচিত্ত হয় না।

দম্পতীর কলহ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ সচরাচর উদাহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়-কলহ যদি এরূপভাবে নিষ্পন্ন হয় যে, উহাতে প্রণয়ের পূর্ণ মর্য্যাদা বজায় থাকে, তাহা হইলে দম্পতীর কলহে প্রেম বাড়ে বই কমে না। সেক্‌স্‌পীয়ারের একজন সমসাময়িক কবি বলেন যে, এরূপ কলহের পর চুম্বনে দম্পতী দ্রাক্ষার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন। কবি-কল্পিত অমর লোকে প্রেমে গতস্য শোচনা নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোনওরূপ উদ্বেগ নাই। কিন্তু মর্ত্ত্যমানবের হৃদয় এরূপ প্রেমে তৃপ্তিলাভ করে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমার বোধ হয় যে, কলহবিচ্ছেদাদি আছে বলিয়া মানব-প্রেম এত বিচিত্র ও মধুর। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দুই স্ত্রী-পুরুষের কখনও মনান্তর ঘটে নাই শুনিয়া একজন তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "এরূপ দাম্পত্য জীবন কি নীরস ও স্বাদবিহীন!"

কলহবিচ্ছেদাদি যেমন প্রেমের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে, সেইরূপ মৃত্যুর তামসরজ্জু প্রেমের রজতশৃঙ্খলের সহিত গ্রথিত হইয়া প্রেমকে প্রিয়-তমাদপি-প্রিয়তম করে। মৃত্যুঞ্জয় প্রেম মৃত্যুর স্পর্শে অমরত্ব লাভ করে। যিনি প্রেমের প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়াও আজীবন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারেন নাই তিনিই এই কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

কবিতা।

সেই এক শুভক্ষণে বাল্মীকির পূত রসনায়
স্বর্গ ত্যজি' পরদুঃখে প্রকটিত প্রথম ধরায়
সেই হ'তে পরদুঃখে নির্য্যাতিতে দিতে আশীর্ব্বাদ
হে কবিতা, নানাছন্দে বিলাইছ সান্ত্বনা—প্রসাদ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর।*

জীবের জীবন নলিনীদলগত জলের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। নিত্য শত শত মানব লোকলীলা শেষ করিয়া মৃত্যুর অধিকারে চলিয়া যায়। স্বজনগণ ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের স্মৃতি রক্ষা করে না, ইতিহাসে তাহাদিগের নামোল্লেখও থাকে না। কিন্তু জীবন যাইলেও কীর্ত্তি যায় না। তাই কীর্ত্তিমান পুরুষের তিরোভাবে সমাজ বা জাতি শোক প্রকাশ করে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন।

তিনি ধনবান ভূম্যধিকারিসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বংশের সমৃদ্ধি-সমাগম বহুদিনের কথা নহে। দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হইলেই কতকগুলি সমৃদ্ধ বংশের অধঃপতন ও কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে কতকগুলি পরিবার সম্মানে ও সম্পদে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এই সকল পরিবারের মধ্যে কাশীমবাজার, শোভাবাজার, নশীপুর, কান্দি (পাইকপাড়া)—এই সকল স্থানের রাজ-পরিবারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোভাবাজার রাজবংশের বংশপতি নবকৃষ্ণ ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন এবং দীন অবস্থা হইতে ক্রমে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশে রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন করাইয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজা কালীকৃষ্ণ, মহারাজ কমলকৃষ্ণ ও মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সমসাময়িক সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ও কমলকৃষ্ণ উভয়েই—রাধাকান্তের মত—হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ মহারাজ কমলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র।

অল্পবয়স হইতেই বিনয়কৃষ্ণ সভাসমিতিতে যোগ দিতেন ও জনহিত-কর অনুষ্ঠানে কার্য্য করিতেন। প্রধানতর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাসনাল লিগের" সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সভা কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। তাহার পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন ও একবার কংগ্রেসের ধনাধ্যক্ষের কার্য্যও করিয়াছিলেন। সার আলেকজাণ্ডার

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ম্যাকেঞ্জীর শাসনকালে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল—রাজা বিনয়কৃষ্ণ সে আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন; প্রতিবাদকারিগণের মন্ত্রণাসভার অধিবেশন তাঁহার গৃহেই হইত। তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। প্রকাশুভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা কখনও সমাজের প্রতি উপেক্ষায় বা সমাজ-শাসনের প্রতি ঘৃণায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও সমুদ্রযাত্রা প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য-সাধনের চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার সাফল্যবিচারের বিতর্কে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু যদি সে চেষ্টা সাফল্যলাভ না করিয়া থাকে তবে তাহার বিবিধ কারণ আছে। সমাজে একতার ও ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বের অভাব—সেসকল কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্প্রদায় বিশেষকে "জল আচরণীয়" করিয়াছিলেন। এখন সে অধিকার বা ক্ষমতা কাহারও নাই।

সমাজে রাজার সম্মান ছিল। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্যক্তি-বিশেষের, সভাবিশেষের, সংবাদপত্রবিশেষের যে উপকার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলনে বা সমাজসংস্কার-বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার কোন স্থায়ী নিদর্শন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব সাহিত্যে—কীর্ত্তি সাহিত্যক্ষেত্রে। সাহিত্য-সেবা তাঁহার পক্ষে মৌলিক না হইলেও কৌলিক বটে। কিন্তু তিনি যে বিলাস-ব্যসনে ব্যাপৃত না হইয়া সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ উপ-ভোগ করিতেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। তিনি সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যামোদী ছিলেন; এবং সাহিত্যসেবকগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং ইংরাজীতে কলিকাতার একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধও রচিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার আর একটি কার্য্যের উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শোভাবাজার রাজবংশের বংশপতি নবকৃষ্ণ ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন। নন্দকুমারের বিচারবিষয়ক পুস্তকে ঐতিহাসিক

বেভারিজ নবকৃষ্ণের চরিত্রে যে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছিলেন বিনয়কৃষ্ণ তাহার অপনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেভারিজ তাঁহার পুস্তক রচনাকালে নবকৃষ্ণের বংশধর রাজা সার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়নের নিকট বহু উপাদান চাহিয়াছিলেন, বহু বিষয়ের সন্ধান লইয়াছিলেন। রাজার ভাগিনেয় অগাধপাণ্ডিত্যশালী আনন্দ-কৃষ্ণ বসু মহাশয় সে সব উপাদান যোগাইয়াছিলেন, সে সকল সন্ধান দিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের নিন্দা করিতে হইয়াছিল বলিয়া পুস্তক রচিত হইলে বেভারিজ স্বয়ং আসিয়া আনন্দ বাবুকে নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য শুনাইয়া নবকৃষ্ণের সমর্থনে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। আনন্দ বাবু বলিয়াছিলেন, সমসাময়িক আদর্শে বিচার করিলে নবকৃষ্ণের অপরাধের গুরুত্বহ্রাস হইবে; তখন সকলে যেমন নবকৃষ্ণও তেমনই ছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ কিন্তু নবকৃষ্ণকে নির্দ্দোষ মনে করিতেন। সে কথা তিনি আমাকেও বহুবার বলিয়াছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষরচিত নবকৃষ্ণের চরিত সেই চেষ্টার ফল। নগেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থরচনায় রাজার নানারূপ সাহায্যের কথা তাঁহার বন্ধুবর্গের অবিদিত নাই।

রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে রাজার কৃত কর্ম্ম স্থায়ী হইবে কি না—ইতিহাসে তাহার কোন চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁহার কৃত কর্ম্ম যে স্থায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও পরে সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি।

পরিষদের মত সভাসংস্থাপনের কল্পনা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। একবার দেওঘরে অবস্থানকালে রাজা বাহাদুর রাজনারায়ণ বাবুর নিকট এই কল্পনার কথা জানিতে পারেন ও কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। তখন আমিও দেওঘরে। এই কার্য্যে মিষ্টার লিওটার্ড, পরলোকগত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজার সহকর্ম্মী। রাজা বাহাদুরের গৃহে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটরেচার প্রতিষ্টিত হইল। নাম ইংরাজী, কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে লিখিত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মধ্যে কে যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নাম স্থির করেন, ঠিক স্মরণ নাই। তবে পর-

বর্ত্তীকালে আবার পরিষৎ ও পরিষদ্ লইয়াও তর্ক হইয়াছিল। রাজা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবর্ত্তক। পরিষদ তাঁহারই গৃহে সংস্থাপিত ছিল।

ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক টেন লিখিয়াছেন, সাহিত্য ক্রমে পাঠকসম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে গঠিত হয়। সেক্সপিয়ারের নাটকে সমসাময়িক ইংরাজ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় আছে; ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমান শাসনের অবসানকালে বাঙ্গালার বিলাসী সমাজের বিলাসের চিত্র দেখা যায়। কিন্তু সকল দেশে ও সকল সমাজেই লেখকগণের আবির্ভাব পাঠকসম্প্রদায় সংগঠনের অপেক্ষা রাখে না; বরং অনেক স্থলে লেখকের আবির্ভাব পাঠকের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী—রচনা পাঠকসম্প্রদায় সংগঠিত করে। তাহার পূর্ব্বে অনেক স্থলে কমলার বরপুত্রগণ বাণীর সেবকদিগের সাহায্য করিয়াছেন। সাহিত্যিকদিগের রচনায় তাঁহারা যে অমরতালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধন বা প্রতাপ তাঁহাদিগকে সে অমরতা দিতে পারিত না। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশমাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নব প্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সতেজ; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী।" আমাদের বাঙ্গালায় বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত রাজসভায় থাকিয়া—রাজানুগ্রহে দারিদ্র্যদংশনমুক্ত হইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনও পাইকপাড়ার রাজাদিগের ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাভারতের ও রামায়ণের এবং সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের যে অনুবাদ করাইয়া গিয়াছেন তাহাতে এবং রাজা সার রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলনে এইরূপ সাহিত্যানুকূল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে জনসনের অভিধান প্রকাশ হইতে এইরূপ সাহিত্যানুকূল্যের শেষ। জনসন এই অভিধান প্রণয়নকালে কোবিদ-সুহৃদ লর্ড চেষ্টারফিল্ডের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন। লর্ড চেষ্টারফিল্ডও তাঁহাকে আনুকূল্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জনসন সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষকাল এই অভিধান প্রণয়নকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি লর্ড চেষ্টারফিল্ডের নিকট কোনরূপ সাহায্য পায়েন নাই। শেষে যখন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন গ্রন্থখানি যাহাতে তাঁহাকেই উৎসর্গ করা হয় সেই আশায় চেষ্টারফিল্ড উহার

প্রশংসা করিয়া 'ওয়ারল্ড' পত্রে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। জনসন তাঁহাকে যে পত্র লিখেন, ইংরাজী সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। কার্লাইল বলিয়াছেন, সেই পত্রে জনসন জানাইয়া দেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে আর ধনীর আনুকূল্য প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গালায় যেরূপ শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে ও বাঙ্গালার পাঠক-সম্প্রদায় যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি, বাঙ্গালায়ও আর সাহিত্যে ধনীর আনুকূল্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখনও বোধ হইতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সে আনুকূল্যপ্রদানের অবকাশ আছে। সমগ্র বাঙ্গালার যে ব্যয়ভার বহন করিবার কথা বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারকল্পে সেই ব্যয়ভার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় বহন করিতেছেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই দুইজনের সাহায্য স্মরণীয়। মহারাজ বহু সাহিত্যসেবকের আশ্রয়। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্কের কথা হইতে পারে; কিন্তু এ সত্য গোপন করিবার উপায় নাই। সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় ও পরিপোষণে রাজা বিনয়কৃষ্ণের কীর্ত্তিও স্মরণীয়। পরিষদকে তিনি যে বিশেষ স্নেহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পরিষদসম্পর্কেই আমার সহিত রাজা বাহাদুরের পরিচয়।

সন ১৩০৭ সালে আমি পরিষদের সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলাম। সেবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপণ্ডিত ও কোবিদসুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক। যতীন্দ্র বাবুর সাহিত্যপ্রীতি যেরূপ অধিক অবসর সেরূপ অধিক নহে। সেই জন্য তিনি অনেক সময় সহকারীদিগের উপর কার্য্যভার দিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় পরিষদ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বিচারার্থ আমাকেই সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। সাধারণ সভা ব্যক্তিবিশেষের গৃহে থাকিলে কিছু অসুবিধা-ভোগ অনিবার্য্য। আমাদিগকেও সময় সময় সেইসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেই কারণে পরিষদকে কোন স্বতন্ত্র ভবনে সংস্থাপিত করিবার প্রস্তাব হয়;—প্রস্তাবকারিগণের মধ্যে আমি ছিলাম। এ বিষয় লইয়া বিচার হয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া আমি পরিষদ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বিচারার্থ সভা আহ্বান করি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই স্থানান্তর কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও পরিষদকে স্থানান্তরিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। তখন রাজা বাহাদুর ও সম্পাদক যতীন্দ্রবাবু কেহই কলিকাতায় ছিলেন না।

১৮ই ফেবরারী (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) বুধবার অপরাহ্নে পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হয়। যতীন্দ্রবাবু সেই দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। পরিষদের অধিবেশনে যাঁহারা সাধারণতঃ যোগ দিতেন না এমন অনেক সভ্যও সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, রমানাথ ঘোষ ও হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ছিলেন। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সভাধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। এ সভাধি-বেশনের আহ্বানপত্র সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়ায় তাঁহারা আপত্তি করিলে যতীন্দ্র বাবু তাঁহার সহকারীর কৃত কর্ম্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৪৯ জন সভ্য সভাধিবেশনের পক্ষে ও ৩৯ জন বিপক্ষে মত দিলে সভার কার্য্য আরব্ধ হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত গ্রহণকালে বিপক্ষদল সভাগৃহ ত্যাগ করেন; প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা পরিষদকে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং পরিষদগৃহে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করেন। রাজাবাহাদুরের অনিচ্ছাহেতু শেষোক্ত প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আশা করি, পরিষদ এবার প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করিবেন।

রাজা বাহাদুর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার এই কার্য্যে যাঁহারা ব্যথিত হইয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে তাঁহাদের সে বেদনা অপনীত হইয়াছিল। পরিষদ রাজা বাহাদুরের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হইলে পরিষদের বন্ধুবর্গ গৃহনির্ম্মাণের জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া বাঙ্গালার ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিলেন। ধনবানদিগের বদান্যতায় সে পাত্র যে অল্প দিনেই পূর্ণ হইয়াছিল এমন শ্লাঘার কথা বলিতে পারি

না। কিন্তু যেরূপেই হউক কাশীমবাজারের মহারাজদত্ত ভূমির উপর পরিষদের স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। যদি তিনি কখন পরিষদের প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিয়া থাকেন, তবে সে দিন তিনি তাহা পরিহার করিয়াছিলেন।

এত দিন পরে—যখন কালের ভেষজে সকলেরই হৃদয়-ক্ষত দূর হইয়াছে এবং মৃত্যুর শীতল প্রলেপ সাময়িক উত্তেজনার তাপ নষ্ট করিয়াছে তখন ধীরভাবে বিবেচনা করিলে সাহিত্য সভার সংস্থাপনকার্য্য প্রতিহিংসা-প্রণোদিত না বলিয়া তাহাতে অন্যবিধ উদ্দেশ্যের আরোপ করাও অসম্ভব বোধ হয় না। হয়ত সাহিত্যামোদী রাজা বাহাদুর যে সাহিত্যিক সঙ্গ ভালবাসিতেন পরিষদ স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহার অভাব আশঙ্কা বা অনুভব করিয়াই তিনি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি যে সাহিত্য সভার কার্য্যপ্রবাহ ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়া পরিষদের সহিত সভার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে এই মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরিষদ পুরাবস্তুর সংগ্রহে, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় ও ইতিহাসের উদ্ধারে শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সাহিত্য সভা বর্ত্তমানকে অবহেলা না করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের আলোচনায় ও উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল।

রাজা বাহাদুরকে পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবে যোগ দিতে দেখিয়া কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন, মুক্ত বেণী আবার যুক্ত হইবে। কিন্তু পরিষদের ও সভার কার্য্য বিবেচনা করিলে উভয়ের সংযোগ অভিপ্রেত কি না বলা দুষ্কর হইয়া উঠে। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুতে যদি সাহিত্য সভার কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস না হয়, তবে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বোধ হয় সঙ্গত হইবে এবং তাহার সহিত রাজা বাহাদুরের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত রহিবে।

রাজা বাহাদুর অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সকল প্রকারের লোক সকল সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। কিন্তু তিনি সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক বিষয়ে তিনি বহু তথ্য অবগত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকায় তিনি জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম ছিলেন।

তাঁহার নানা সদ্‌গুণের মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতান্তরকে তিনি মনান্তরের কারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন না। পরিষদ স্থানান্তরিত করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিলেন তাঁহা-দিগের অনেকের সহিতই তাঁহার বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হয় নাই বা পুনরায় সংস্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহার সদ্‌গুণের স্মৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের স্মৃতিতে নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্য-সুহৃদদিগের মধ্যে তাঁহার নাম সমুজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিবে। পরিষদের পুণ্য পীঠে দাঁড়াইয়া আমরা এ আশা করিতে পারি যে, পরিষদ চিরস্থায়ী হইবে আর পরিষদের সহিত বিজড়িত রাজা বাহাদুরের নামও কালজয়ী হইয়া থাকিবে।



কামনা।

সাযুজ্য চাহি না ,নাথ, শুধু দাসীরূপে।
চরণ পূজিতে চাহি শুধু চুপে চুপে॥
চাহি ভালবাসিবারে ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়া।
চাহি, প্রভো, সর্ব্বজীবে তোমারে হেরিয়া
বিলাইতে সবাকারে স্নিগ্ধ অনাবিল
মৌন ভালবাসা। চাহি হেরিতে নিখিল
ভাস্বর তোমার প্রেমে, হে জগৎস্বামি,
তুমি থাক প্রভু হ'য়ে, দাসী থাকি আমি।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আজ যে বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন্ তাঁহার নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আপন সত্তা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে বহুল পরিমাণে ঋণী। ইহার প্রাথমিক গঠনকালে বিদ্যানিধি মহাশয় একজন প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন—অনেক উপাদান তাঁহার যত্নে ইহার দেহগঠনে তাঁহার হস্তেই সংযোজিত হইয়াছে। অনেক কাটা-চটা মেরামতেও তাঁহাকে সে সময় বিষম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যতকাল থাকিবে ততকাল বিদ্যানিধি মহাশয়কে আপনার অন্যতম গঠনকর্ত্তা বলিয়া স্মরণ রাখিতে বাধ্য এবং পরিষদের বর্ত্তমান হিতৈষিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত ইহার গঠনকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে কোন দিনই ভুলিবেন না,—ভুলিতে পারিবেন না। আর যাঁহারা পরিষদ্-গঠনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন দেখেন নাই তাঁহারা, (এই পরিষদের অপর গঠনকর্ত্তৃগণের সঙ্গে) সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নামটি স্মরণ রাখিতে বাধিত হইব। পরিষদের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে যাঁহারা পরিষদকে বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালীর সমাজের—এক কথায় বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল ও উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করেন, এই পরিষদের জন্মেতিহাসের সহিত একাত্মভাবে জড়িত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নাম যদি তাঁহারা স্মরণ না রাখেন, তাহা কেবল তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।

পরিষদের সম্পোষণার্থ সদস্যসংগ্রহ, পরিষদের পালনার্থ সহকারীসম্পাদক-রূপে নানাভাবে পরিশ্রম, পরিষদ্ পুস্তকাগারের জন্য পুস্তকসংগ্রহ, পরিষদ্ পত্রিকার উন্নতির জন্য লেখকসংগ্রহ, অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ-সংগ্রহ, অধিবেশনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ, অনুরোধ প্রভৃতি পরিষদের উন্নতিকর ও সদস্যগণের প্রীতিবর্দ্ধক সকল কার্য্যেই বিদ্যানিধি মহাশয় অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। তৎকালীন সাহিত্য-সংসারে ও সাহিত্যিক-সমাজে তাঁহার নানাবিধ কার্য্য ছিল। সেই সকল কার্য্যসূত্রে যাঁহারই সহিত, যে জন্য, যখনই দেখা হইত, প্রসঙ্গতঃ পরিষদের কথা উত্থাপিত করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার

চেষ্টা করিতে তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেষ্ট দেখিতাম। শ্রাদ্ধ-সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগমেও তাঁহাকে এরূপ চেষ্টায় বিরত থাকিতে দেখি নাই। সাহিত্য পরিষদ্ যখন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হয়, সেই দিন হইতে কোন সতীর্থ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি কিছু দিন পরিষদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইহার প্রতি প্রীতি ও স্নেহ বর্জ্জন করেন নাই। সাহিত্য তাঁহার চিরপ্রিয়; সাহিত্য তাঁহার আনন্দ—সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল। সাহিত্যানন্দদিগের সহিত আলাপে যাহাকে যে ভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতেন, তিনি তাহাকে সেই মার্গ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি মুখ্যতঃ সাহিত্যসভার গঠন-কার্য্যে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার ব্যাখ্যাত সাহিত্যসেবাপদ্ধতি শ্রবণ করিয়া অনেক সাহিত্যানুরাগী বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাহায্যসংশ্লিষ্ট সাহিত্য সভায় যোগদান না করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাহিত্যযাজক বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপে পরিষদের অনেক সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

সাহিত্য সভার গঠনযুগে বিদ্যানিধি মহাশয়ই তাহার উন্নতির কেন্দ্রশক্তি স্বরূপ কার্য্য করিতেন। পরিষদের ন্যায় সাহিত্য সভাও নিজ জীবনের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই। সাহিত্য সভার পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় নিজের আবাল্য সঞ্চিত বহু পুস্তক, পুঁথি, মাসিকপত্র তথায় দান করিয়াছিলেন। সাহিত্য সভার বর্ত্তমান পুস্তক-ভাণ্ডারের অর্দ্ধাংশ কেবল তাঁহার দত্ত বিপুল গ্রন্থরাশিদ্বারাই গঠিত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বিদ্যানিধি মহাশয় 'আর্য্যদর্শনে' প্রথমে লেখক ও পরে সহকারী সম্পাদক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত হয়েন। তিনি টোলে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীও জানিতেন। অনেক প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান পণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে স্বনামধন্য কৃতী ও সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় তিনি প্রথম হইতেই মৌলিকতা প্রকাশ করিয়া যশোলাভ করেন। হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কারকর্ত্তা হানিমানের জীবন-চরিত তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

একজন কাব্য শাস্ত্রের "টুলো" পণ্ডিত মাতৃভাষাসেবায় ব্রতী হইয়া ভাষাদেবীর চরণে প্রথম যে অঞ্জলী প্রদান করিলেন, তাহা একেবারে তাঁহার শিক্ষিত বিষয়ের বাহিরের বস্তু। ঐ সময় তিনি 'আর্য্যদর্শনের' সহকারী সম্পাদক। উহার সম্পাদক সুপণ্ডিত স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তখন গ্যারিবল্‌ডী, ম্যাটসিনী প্রভৃতির জীবন-চরিত প্রকাশ করিতেছিলেন। সহকারী সম্পাদক বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহারই প্রদর্শিত পথে (তবে সম্পূর্ণ নূতন দিকে) এক জন নববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাকারী চিকিৎসকের জীবন-চরিত লিখিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন ইহা অল্প বিস্ময়ের কথা নহে। তাহার পরে তাঁহার যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমরা পাই, তাহাও নবীনত্বে এবং মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ—সেখানি প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের বৃত্তান্ত। বঙ্গসাহিত্যের পাঠক ও ইতিহাসলেখক সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখেই এই পুস্তিকাখানিদ্বারা আমাদের বৈদিক কালের গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, ও পৌরাণিক কালের দেবহুতি প্রভৃতি বিদুষী মহিলার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই কিছু না কিছু মৌলিক গবেষণামূলক। আজ মদীয় সোদরপ্রতিম নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ করিতেছেন, তৎসম্পর্কিত বংশাবলীর আলোচনা যে বাঙ্গালীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'কল্পনা' নামক অধুনালুপ্ত তদানীন্তন সুপরিচিত মাসিক পত্রে প্রকাশিত পৌরাণিক ঋষি ও রাজবংশাবলীর আলোচনামূলক "বংশাবলী" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতেই যাহা প্রথম প্রকটিত হয়। বাঙ্গালা সাময়িক (মাসিক ও সাপ্তাহিক) পত্রের ইতিহাস সঙ্কলন, তাঁহার মৌলিক গবেষণার আর একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধ যদিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তদধিক আর কিছু কাহাকেও করিতে হইলে, তাঁহাকে বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া নূতন উপায়ে নূতন অনুসন্ধান করিতে হইবে। নতুবা তিনি আর বিশেষ কোন কিছু নূতন তথ্য সংযোগ করিতে পারিবেন না। বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর একটি মৌলিক গবেষণার কথা বলিব। তাহার বিষয়টি এমন অদ্ভুত ধরণের যে, সে বিষয়ে যে আবার জ্ঞাতব্য কিছু আছে, লেখ্য কিছু আছে, তাহার ইতিহাস যে

সমাজের কোন প্রয়োজনে আসিতে পারে বলিয়া রক্ষিতব্য, এ ধারণা তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহারও মনে উঠে নাই। সেটি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

বিদ্যানিধি মহাশয় যখন নাট্যশালার ইতিহাস অনুসন্ধানের কল্পনা করেন, তখন পর্য্যন্ত নাট্যশালা এই "কলির সহর কলকেতাতেই" ভদ্র শিক্ষিত লোকের নিকট আজকালকার স্থায় আদর পাওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘৃণ্যই ছিল। সেই সময়ে তিনি কলিকাতার প্রধান প্রধান নাট্য-শিল্পীর সহিত দেখা করিয়া উহার ইতিহাসসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অনেকেই তখন জীবিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত দেখা করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের এত চেষ্টা—এত উৎসাহ জাগিয়াছিল, দেশের লোকের নাট্যশালার প্রতি তখনকার ভাব অনুধাবন করিয়া তাঁহারাই অনেকে সে সময়ে তাঁহার আগ্রহে মনোযোগ করেন নাই। মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় এবং আদি নাট্য-মঞ্চশিল্পী ৺ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় তাঁহার অভিলাষ সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বিদ্যানিধি মহাশয় ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺মহেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট কথা প্রসঙ্গে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ সম্পাদিত 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এমনই কালের বিচিত্র গতি যে, এক দিন যাঁহারা এইসকল বিবরণ দিতে কিছুমাত্র উৎসাহ দেখান নাই, উত্তরকালে তাঁহাদেরই মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা উৎপন্ন হইয়া নাট্যশালার গঠন-যুগের ইতিহাসকে ইহারই মধ্যে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন হঠাৎ তাহা হইতে সত্যনির্ণয় করা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্যতীত বিদ্যানিধি মহাশয় 'নব্যভারতে' রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতখানিকে প্রায় পূর্ণতা দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল তথ্য সমসাময়িক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত করিয়া তিনি বাঙ্গালীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক; সকলগুলির উল্লেখ করিবার স্থল ইহা নহে। অতঃপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট

হইবে যে, তিনি গ্রন্থকার, মাসিক পত্রের সম্পাদক, সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, প্রবন্ধলেখক প্রভৃতি সাহিত্য-সেবকের সকল মূর্ত্তিতেই আমরণ মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত-খানি তখনকার কালে জীবন-চরিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক ছিল।

বিদ্যানিধি মহাশয় যখন 'বিদ্যানিধি' হয়েন নাই, তখন বাগবাজারে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষক তখনকার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল এল্‌, পি, ডি, ব্রাউটনের নামে "ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশন" নাম দিয়া এক প্রবেশিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। তখন তাঁহার 'হানিমান' কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি নিজে কেবলমাত্র বংশগত উপাধিদ্বারা মহেন্দ্রনাথ রায় নামেই পরিচিত। এই স্থানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় ও রাজা রামমোহন রায় একই বংশোদ্ভূত, মহেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ শাখার সন্তান এবং উভয়ের নিবাসও একই স্থানে—খানাকুল কৃষ্ণনগরে। এই ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশনেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও এই স্থানেই আমাদের গুরুশিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমি তখন ঐ স্কুলে পড়িতাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছেই আমার 'উপক্রমিকা ব্যাকরণ' হইতে সংস্কৃত শিক্ষার এবং 'যুধিষ্ঠিরের সততা' নামক ৫ম শ্রেণীর উপযুক্ত প্রবন্ধ রচনা হইতে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সে বোধ হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের কথা। তদবধি বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার চিরদিনের নিমিত্ত যে ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন বাঁধা হইয়াছিল, তাহা কোন দিন শিথিল হয় নাই; আর আজ তাঁহার দেহান্ত হইলেও আমার দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহা অটুট থাকিবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের শিষ্যত্ব আমার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই; কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধিক বেতনে অন্যত্র কর্ম্ম করিতে গমন করেন, আমিও শিক্ষার্থ ওরিএন্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হই ও ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশনও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কটন ইনিষ্টিটিউশন নামে অন্যত্র উঠিয়া যায়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কাজ করিয়াছি, এই পরিষদের গঠনকার্য্যে একত্র পরিশ্রম করিয়াছি, মাসিক পত্রাদি সম্পাদনে ও প্রবন্ধাদির গবেষণায় যখন একত্র খাটিয়াছি,—

তখন তাঁহার যে স্নেহ, যে প্রীতি এবং যে কার্য্যকুশলতা ও পরিশ্রম-ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা অপূর্ব্ব। তাহা অনেক সময় আমার আদর্শ স্বরূপ হইয়া আছে। তিনি তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুগণকে সাহিত্য-সেবায় যে ভাবে উৎসাহিত করিতেন, যেরূপে সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট পরিচিত করিতেন এবং যে ভাবে সাহিত্য-শিক্ষায় সাহায্য করিতেন, তাহাও অপূর্ব্ব এবং অতি মনোহর। এ বিষয়ে এত সহৃদয়তা অল্প লোকেরই দেখা যায়। তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট যেরূপ অমায়িক এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাহা আমায় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। আজ তাঁহার বিয়োগে তাঁহার শত শত বন্ধু তাঁহারা অন্য শত গুণের মধ্যে সেই গুণই স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় চিরদরিদ্র ছিলেন, কিন্তু পরিশ্রমের কষ্টার্জ্জিত উপার্জ্জন ব্যতীত তিনি অন্যভাবে বড় বেশী লোকের কাছে সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেন না। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হইয়া অশেষ প্রকারে তাঁহাকে পীড়ন করিয়াছে, এমন এক এক দিন গিয়াছে যে, দিনান্তেও তাঁহার অন্ন জুটে নাই। পারিবারিক সুখও তাঁহার ছিল না। তাঁহার পুত্র হয় নাই। তিনি অর্থাভাবে কন্যাগুলিকে দরিদ্র পাত্রে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মানসিক কষ্ট আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শেষে স্ত্রীবিয়োগে ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বৈধব্যে তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়াছিল। অবশেষে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শেষ কয়েক বৎসর তিনি সাহিত্যচর্চ্চাও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার অকালবিয়োগবেদনা তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দেয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় দুর্দ্দশার ও দুশ্চিন্তার ভারে জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যা লয়েন। অতঃপর সে দিন মৃত্যু আসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের সকল জ্বালার শান্তি করিয়া দিয়াছে। মাতৃভাষার এই একজন নিষ্ঠাবান চিরবিশ্বস্ত সেবকের স্মৃতিটুকু যাহাতে লোপ না পায়, তাঁহার কোন না কোনরূপ স্মৃতি তাঁহারই যত্ন ও পরিশ্রমের একাংশভূত ভাষাজননীর এই শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার আয়োজন করাই আমাদের কর্ত্তব্য; আর তাহা করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার অসংখ্য সাহিত্য-বন্ধু, ছাত্র ও সঙ্গীর দ্বারা তাঁহার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাচেষ্টা সফল হইবে।*

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সাহিত্যিক।

১

বাল্যকাল হইতে একটির পর একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বাধাগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে তাহাতেই যেন নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যেই যেন জীবনের সমস্তখানি আনন্দ—সমস্তটুকু সার্থকতা নিহিত ছিল; তাই এম্, এ, পরীক্ষার শেষে সংসারের লক্ষ্যহীন প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া জীবনটা কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হইতে লাগিল। এতকাল পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই শিখি নাই, পুস্তকের রাশি ছাড়া আর কিছুই ভালবাসি নাই,—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির হইতে বিদায় লইয়া নিতান্তই অসহায় হইয়া পড়িলাম। জগতের সঙ্গে সহানুভূতির অভাব প্রতি পদেই অস্তিত্বটা বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাই একটু নূতনত্বের আশায় পুরী গেলাম।

সমুদ্রতীরে বালুকাপ্রান্তরের মধ্যে আমার ছোট্ট বাসাটি—আর তাহারই সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি যায়, নীল বারিরাশি; আর তাহারই বক্ষে শ্বেতকুসুম-দামের মত শুভ্র ফেনপুঞ্জ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া কোন্ দেশ দেশান্তরের বাণী বহিয়া আনিতেছে! সে কি আকুল আবেগময় উচ্ছ্বাস—শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, বাধা নাই, বিরক্তি নাই, ঢেউএর পর ঢেউরাশি কি ব্যাকুল আগ্রহেই ধরাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিতেছে! সারাদিন জানালার ধারে বসিয়া আমি সেই দিগন্তপ্রসারিত নীল বারি-রাশির নৃত্য দেখিতাম আর কেন যেন প্রাণের মধ্যে প্রত্যাখ্যাত সাগরেরই মত একটা গম্ভীর হাহাকার ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত। হৃদয়ে কি যেন একটা মহাশূন্যতা সদাই অনুভব করিতাম, বিশ্বসংসার খুঁজিয়া তাহার কারণ পাইতাম না। উদার সাগরের তটে বসিয়া বীচিমালার সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে—উপরের নীল আকাশে নক্ষত্র-মালার শোভা দেখিতে দেখিতে কত সন্ধ্যায় মনে হইত, কি যেন আমার ছিল তাহা হারাইয়াছি, কি যেন আমার চাহি তাহা খুঁজিয়া পাই না। সম্মুখে নীল সাগর; উপরে নীল আকাশ, তাহারই গাত্রে চাঁদিনী রজনীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, আর তাহারই বিমল আভায় যখন নীল সাগরের সর্ব্বাঙ্গে

একটা স্বপ্নরাজ্যের শোভা দিগ্‌দিগন্তে মাখাইয়া দিত, তখন কেবলই মনে হইত, সবাই ত হাসে কেবল আমি কেন মন খুলিয়া হাসিতে পারি না? জগতের সহিত এমনই সহানুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মনের এমনই অবস্থায় বিমলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার বাসার নিকটেই একটা বড় বাড়ী হরিপদবাবু ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখিতাম, শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ সমুদ্রতীরে বসিয়া একমনে কি চিন্তা করিতেছেন। ভদ্রলোকটির প্রশান্তভাবপূর্ণ আকৃতি অজ্ঞাতে আমার শ্রদ্ধার অনেকখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। যাচিয়া আলাপ করিবার অভ্যাস বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধের পরিচয় লাভের ব্যগ্রতা দমন করিতে পারিলাম না। কয়েক দিন চেষ্টার পর এক দিন তাঁহাকে একাকী সমুদ্রতীরে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমি যাইয়া পাশে বসিলাম। সহজেই পরিচয় হইয়া গেল—তিনি নাগপুরে ওকালতি করেন, গ্রীষ্মের অবকাশ উপলক্ষ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, পথে পুরীতে কিছুদিন কাটাইয়া কয়েক মাস বাঙ্গালায় বাস করিয়া যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা। স্বাস্থ্য ভিন্ন যে তাঁহার দীর্ঘ অবকাশ লইবার অন্য কারণও ছিল তাহা প্রকাশ করিতে সরল হৃদয় বৃদ্ধ এতটুকু ইতস্ততঃ করিলেন না।

"আমার মেয়েটি—বিলিও বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা বিবাহের চেষ্টাও দরকার। দূরদেশে থাকি, নিজে না দেখিলেও হয় না—" বলিয়াই তিনি বাতি ঘরের দিকে চাহিলেন। দেখিলাম একটি বর্ষীয়সী মহিলা একটি চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা ও একটি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত ঝিনুক কুড়াইতেছেন। বালির উপর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ঝিনুক ছড়ান রহিয়াছে, বালিকা আঁচল পূরিয়া সেগুলি খুঁটিয়া তুলিতেছে। তাহার ত্রস্ত সলজ্জ ভাব, সতর্ক চপলতা এবং আনন্দোজ্জল মুখশ্রী আমার হৃদয় মরুভূমিতে হঠাৎ যেন এক মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া দিল। আমি বহুদিনপরে মনের মধ্যে যেন একটা ভাবের উন্মেষ অনুভব করিলাম—অনেক দিনের হারানো আমিকে যেন চকিতে ফিরিয়া পাইলাম। নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেরই হাসি পাইল; কিন্তু তাহাতে আনন্দিত ভিন্ন বিরক্ত হইলাম না। বুঝিলাম, এই বালিকাই বিলি। হরিপদবাবু তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন, আমাকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিলকধারী যুবক, আমার অধিক পরিচয় আবশ্যক হইল না।

সেই দিন হইতে হরিপদবাবুর বাসায় নিত্য অতিথি হইতে লাগিলাম। বিলি আমার সম্মুখে বাহির হইত, অথচ আমার সহিত কথা বলিত না। তাহার এই সলজ্জ নীরবতাই তাহাকে আমার কাছে আরও মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিল, মনে মনে তাহাকেই জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ করিলাম।

হরিপদবাবু একটু নব্যতন্ত্রের লোক হইলেও বাড়ীর মেয়েদের সহিত নিঃসম্পর্কীয় যুবকের স্বাধীন আলাপ পরিচয় পছন্দ করিতেন না; সুতরাং আমি বিলিকে দেখিতে পাইতাম বটে, হঠাৎ কখন তাহার মুখের দিকে চাহিলে সেও যে আমার দিকে সময় সময় চাহিয়া থাকে তাহাও বুঝিতাম বটে, কিন্তু আলাপের সুযোগ পাইতে একটি বিপদের অপেক্ষা রহিল।

সেবার রথযাত্রার সময় যাত্রীদের মধ্যে কলেরা দেখা দিল। এক দিন রাত্রিতে ঘুমাইতেছি, হঠাৎ হরিপদবাবুর কম্পিত আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গ হইল; শুনিলাম, বিলির কলেরা হইয়াছে। শশব্যস্তে উঠিয়া তখনই যাইয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম—তখন আর আত্মপর ভেদ রহিল না। আমার নিকট একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স ছিল, সেটি অসময়ে বড় কায দিল। অত রাত্রিতে অন্য ডাক্তার পাওয়া গেল না, আমারই ঔষধে বিলি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। পরদিন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলির মাতা বলিলেন, "বাবা, বিলি আমার বাঁচিয়া উঠিলে তোমাকেই লইতে হইবে।"

তখন বিলির বেশ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখিয়া আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। গৃহে জননীর শত অনুরোধে ও অশ্রুবর্ষণেও যে হৃদয় দ্রব হয় নাই আজ এক অজ্ঞাত মহিলার সামান্য প্রস্তাবেই যে তাহা উদ্বেলিত হইল তাহার মূলে অন্য কারণও ছিল। বিলির সহিত বিবাহে যে আমাদের কুলশীলে কোন বাধা ছিল না হরিপদ বাবু পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলেন।

অল্পদিনের আলাপেই বুঝিলাম, এই বয়সেই বিলি বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশেষ আনন্দ হইল। আমিও কয়েক বৎসর বঙ্গ-বাণীর চরণে অনেক অর্ঘ্য ঢালিয়াছি, কিন্তু সে অর্ঘ্য কোমল পুষ্পপত্ররচিত কবিতা নহে, কঠোর কণ্টকময়—গবেষণাপূর্ণ গদ্য রচনা। তদুপরি আমার কয়েকটি প্রতিবাদে তীব্র শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা

শক্তির পরিচয় পাইয়া 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' পত্রের সম্পাদক আমাকে তাহার সমালোচক শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন এবং "বেখাত্তির" নামে আমার যে সব কঠোর কশাঘাত নবীন গ্রন্থকারদের পৃষ্ঠে বর্ষিত হইত তাহা মাসান্তে অনেক পাঠকের নিকটই চাটনির মত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের মনে ব্যথা দিয়াই আমার তৃপ্তি হইত, তাই সমালোচকের লেখনীতে মনের বিষ ছত্রে ছত্রে ছড়াইয়া দিয়া নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করিতাম।

যে দিন হইতে বিলির কবিতার সহিত পরিচিত হইলাম, লেখিকার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তাহার কবিতার আবৃত্তি শুনিলাম, সেই দিন হইতে বাঙ্গালা কবিতাকে এক নূতন ভাবে দেখিতে শিখিলাম। বুঝিলাম, কবিতা হৃদয়ে উপভোগ করিবার জিনিস; যাহার হৃদয় নাই তাহার পক্ষে কবিতার রসাস্বাদন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি এমনই বিড়ম্বনায় অনেকবার পড়িয়াছি। তাহা মনে করিয়া অনুতপ্তও হইতাম। ক্রমে আমার মানস-রাজ্যেও একটু একটু কল্পনার চিত্র জাগিয়া উঠিতে লাগিল, নীরস গবেষণা ছাড়িয়া কবিতার চর্চ্চা আরম্ভ করিলাম। বিলি আমার ছন্দোহীন কবিতা পড়িয়া খুব হাসিত, আমিও হাসিতাম।

২

আমাদের বিবাহের আর এক মাস বাকি। মা'কে সব উদ্যোগ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছি। বিলি তখনও খুব দুর্ব্বল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র-তীরে দুই বেলা বেড়াইবার ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল। সে দিন ভ্রমণশেষে বাসার সমুদ্রধারের বারান্দায় বসিয়া আমি ও বিলি গল্প করিতেছি,—এমন সময় বিলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাণ চট্ করিয়া একখানা চক্‌চকে বাঁধান বই আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে বইখানির আবরণ দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম; মনের মধ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা চিন্তাপরম্পরা জাগিয়াই নিবিয়া গেল। তখনই সে ভাব দমন করিয়া বিলিকে আলো আনিতে অনুরোধ করিলাম। সে একটু হাসিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে লণ্ঠনটা সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উদ্বেগপূর্ণ আগ্রহে পড়িলাম, বইখানির নাম 'অশ্রুলেখা'—লেখিকা শ্রীমতী বিমলাবালা দেবী। আমার শিরায় শোণিত দ্রুত বহিতে লাগিল। মলাট উল্টাইয়া দেখিলাম, গোটা গোটা অক্ষরে বিলির হাতের লেখা—"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় শ্রীচরণেষু"। আমাকে বিলির সেই প্রথম

প্রণয় উপহার। আমি অতি কষ্টে মনের ভাব চাপিয়া হাসিমুখে কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে শত প্রশংসাবাদে বিলিকে অস্থির করিয়া তুলিলাম এবং তাহার এ উদ্যম আমার কাছে গোপন রাখিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিলাম। বিলি আনন্দোদ্বেলিত চিত্তে আমার প্রশংসা অতিরঞ্জিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। হায়, আমার সে সময়ের মানসিক অস্থিরতা কে বুঝিবে?

বিলিদের বাসা হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া ষ্টেশনে গেলাম। তখন রাত্রি আটটা। রিপ্লাইপ্রিপেড এক্স্‌প্রেস্‌ টেলিগ্রামে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' সম্পাদককে জানাইলাম,—"যেরূপেই হউক শ্রাবণের 'ব্রহ্মাবর্ত্তে' 'অশ্রুলেখার' বেখাতির সমালোচনা প্রকাশ বন্ধ করুন।" আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই 'অশ্রুলেখার'ই তীব্র সমালোচনা লিখিয়া 'ব্রহ্মাবর্ত্তে' পাঠাইয়াছি। তখন কে জানিত তাহা বিলির লেখা?

অনিদ্রায়—উদ্বেগে রাত্রি কাটিল, সকালে উত্তর পাইলাম, "অসম্ভব। ছাপা সব শেষ। ক্ষমা করিবেন।" পত্রিকাখানির ঠিক সময়ে বাহির হইবার সুনাম ছিল, আর চার দিন পরেই 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বিলির হস্তগত হইবে! নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কিছুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া রহিলাম; প্রাতে আর বিলিদের বাসায় গেলাম না। কিছুক্ষণ পরে বাক্স খুলিয়া সমালোচনার খাতাখানি বাহির করিলাম; তাহার পর সেখানি খণ্ডে খণ্ডে ছিঁড়িয়া সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। মনে একটু নিশ্চিন্ততার ভাব আসিল।

বৈকালে বিলির সহিত বেড়াইতে গেলাম, বিলির ভ্রাতা হারাণও সঙ্গে আসিল। আমাদের বাসার সম্মুখে সমুদ্রতীরে আমি ও বিলি একটু বসিলাম। হারাণ কি দেখিয়া ছুটিয়া গেল। আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; ব্যগ্র—ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, সে একতাড়া ছেঁড়া কাগজ হাতে ফিরিতেছে। কাগজগুলি যে আমারই খাতার পাতা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না, অকৃতজ্ঞ সাগর সেগুলি লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই; ঢেউ সরিয়া যাওয়াতে সেগুলি বালির উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আমি শশব্যস্তে "ফেলে দাও" "ফেলে দাও" বলিতে বলিতে কাগজগুলি বিলির হাতে আসিয়া পৌঁছিল। ঘৃণায়—লজ্জায়—ক্ষোভে আড়ষ্ট হইয়া আমি ভ্রাতাভগিনীর কৌতুক দেখিতে লাগিলাম। বিলি সতর্কতার সহিত

অনেক লেখাই প্রায় অবিকল পড়িয়া গেল ও আমার হস্তাক্ষরের সহিত সেই লেখার সাদৃশ্যে বিস্মিত হইয়া উঠিল। শেষে মলাটের পৃষ্ঠায় আমার নামও তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের অনুসন্ধিৎসা তবুও ক্ষান্ত হইল না, ক্রমে 'অশ্রুলেখা'র সমালোচনার পৃষ্ঠাও বাহির হইয়া পড়িল। দুই চারি লাইন পড়িতেই বিমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুরন্ত হারাণ আমার মর্ম্মঘাতী শ্লেষপূর্ণ সমালোচনাটি বিলিকে পড়িয়া শুনাইল। পাঠশেষে বিমলা তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদুটিতে আমার দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিল, "আমার লেখা আপনি এতই বিশ্রী মনে করিয়াছেন, তবে মিথ্যা প্রশংসা করিলেন কেন?" সে স্বরে করুণতা ও বেদনার ভাব জড়িত ছিল। আমি কি উত্তর দিব? নানা কথায় সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। আমার প্রতি কথায় একটা চেষ্টার ভাব প্রকাশ পাইতে পাইল। সে আর বেশী কথা কহিল না। বুঝিলাম, বালিকা বড় ব্যথা পাইয়াছে। সেই রাত্রিতেই তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বিশেষ বাড়িয়া উঠিল; চিকিৎসক তাহাকে খুব সাবধানে রাখিবার উপদেশ দিয়া গেলেন—কোন কারণেই যেন আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। আমি রোগিণীর ঘরে বসিয়া রহিলাম।

সে দিন শ্রাবণ মাসের ২রা তারিখ। প্রাতঃকাল হইতেই বিলি বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল; বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজকার ডাকে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' আইসে নাই? আজই ত আসিবার কথা।" আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম। পূর্ব্বদিন বৈকাল হইতে বিলি আর আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে নাই, একবার শুধু বলিয়াছিল, "আমি মিথ্যা ব্যবহারকে ঘৃণা করি।" তাহার অতিরিক্ত আগ্রহে বেয়ারা পাঠাইয়া পোষ্ট আফিস হইতে ডাক আনান হইল; 'ব্রহ্মাবর্ত্তে'র সুপরিচিত মোড়কটি দেখিয়াই চিনিলাম। কাগজ বিলির হাতে পড়িল, অধীর আগ্রহে সে সমালোচনাস্তম্ভ বাহির করিয়া ফেলিল। এক একবার মনে হইল সে পৃষ্ঠাটি ছিঁড়িয়া ফেলি; কিন্তু উঠিবার চেষ্টা করিয়াও নড়িতে পারিলাম না, সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। রুগ্না বিলি ছত্রে ছত্রে সমালোচনাগুলিতে চোখ বুলাইয়া গেল। শেষে 'অশ্রুলেখা'র সমালোচনা দেখিয়া সে মাতাকে পড়িতে দিল; বলিল, "মা, পড়ত।" সেই তীব্র শ্লেষ পড়িতে পড়িতে তাহার মাতার মাঝে মাঝে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল,

অর্দ্ধেক পড়িয়াই তিনি বলিলেন, "এখন থাকুক্।" অবাধ্য বিলি নিষেধ মানিল না, নীরবে সবটুকু শুনিয়া গেল। সমালোচক "বেখাত্তির"। তাহার পর—তাহার পর সে একবার আমার দিকে চাহিল, অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া গেল, কম্পিতকণ্ঠে বিলি বলিল, "তবে আপনিই বেখাত্তির ?—" সেই তাহার শেষ কথা—অতিরিক্ত উত্তেজনায় বালিকার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, সকলে কাঁদিতে লাগিল। 'ব্রহ্মাবর্ত্তের' সমালোচনার সাহিত্য হিসাবে স্থান অতি উচ্চে, তাই সে নিষ্ঠুর কশাঘাত বালিকার কোমল হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল।—আর আমি ?

পুরীর স্বর্গদ্বারে বিলির কুসুম কোমল দেহখানি শান্তিলাভ করিল—সে-ই আমার সাহিত্যিক জীবনের শ্মশান।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরি।

বিরহে

—ঃ—

(সংস্কৃত হইতে)

তনু তনু না পেয়ে সে
সুতনুর পরশন।
অশ্রুভারে নত নেত্র
বিনা তা'র দরশন।
কিন্তু এ চঞ্চল চিত্ত
কেন দুঃখনীরে ভাসে।
রয়েছে সতত সে ত
দিবানিশি প্রিয়াপাশে।

শ্রীমতী সু—ঘোষ।

অদৃষ্ট-চক্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

বৈশাখের প্রভাত। পূর্ব্ব গগনে উষার শোণিমা-সঞ্চারে দিবাগম সূচিত হইতে না হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্তভাব পরিলক্ষিত হইল। গৃহ পূর্ণ; বামাচরণ সপরিবারে গৃহে আসিয়াছে, শৈলজাকে ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া শৈলজার স্বামী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, রাধাচরণও সস্ত্রীক গৃহে আসিয়াছে। নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুদিন হইতে "হিসাব নিকাশ" করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার মনের আশঙ্কা যত বাড়িতেছিল, তিনি আপনার কায শেষ করিবার জন্য তত ব্যাকুল হইতেছিলেন। পাঁচ দিনের ব্যবধানে তিনি কন্যার ও পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তিনি জামাতৃদ্বয়কে আসিতে লিখিয়াছিলেন। শৈলজার স্বামী আসিয়াছেন। যতীশচন্দ্র এখনও আইসে নাই। বৈবাহিকের পত্র পাইয়া কাশী হইতে ধরণীধর নীরজাকে ও দেবীচরণকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; লিখিয়াছেন—তিনি আসিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত; তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার বৈবাহিক অবশ্যই তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

দেবীচরণের বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার মত মতই কার্য্য করিয়াছেন—কোন রূপ যৌতুক চাহেন নাই—নগদ অর্থও লয়েন নাই। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এমনই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, সংসারজ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞ পাত্রে কন্যাসমর্পণ অভিপ্রেত মনে করিয়া যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, সে চাকরী করিতেছে; পশ্চিমে বাস—পশ্চিমে চাকরী তাই বয়স কিছু অধিক হইয়াছে—বিবাহ হয় নাই।

আজ নীরজার গাত্র-হরিদ্রা। তাই আজ প্রভাত হইতে না হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্তভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিরজা প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া পূজা করিতে বসিল। এ উৎসবে যোগ দিবার অধিকার তাহার নাই। ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে ব্রজেন্দ্রের আলেখ্য পূজা করিল। আজ গৃহে এই উৎসবানন্দের মধ্যে তাহার হৃদয়

অব্যক্ত যাতনায় ব্যথিত হইতেছিল। পতির চিত্রপ্রণামকালে তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে চিত্রখানি চুম্বন করিল। দালান হইতে তারাচরণ ডাকিল "মেজ পিসীমা"। বিরজা দ্বার খুলিল; তারাচরণ একখানি রেজেষ্টারী করা পত্র আনিয়াছিল। বিরজার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ তাহার শ্বাশুড়ীর পত্র। সে রসিদে সহি করিয়া রসিদ-খানি তারাচরণের হস্তে দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল ও বাক্স হইতে কাঁচি লইয়া খাম কাটিয়া ফেলিল। পত্রমধ্যে এক শত টাকার নোট ছিল—তাহা রাখিয়া বিরজা সাগ্রহে শ্বাশুড়ীর পত্র পড়িতে লাগিল। শ্বাশুড়ীর পত্র বিরজার পক্ষে একাধারে বেদনা ও সান্ত্বনার কারণ। তাঁহার পত্রের প্রতি কথায়—প্রতি জিজ্ঞাসায় সে তাহার প্রতি শ্বাশুড়ীর আন্তরিক অপরিম্লান মাতৃস্নেহের পরিচয় পাইত। তাঁহার সমস্ত স্নেহ যেন এখন বিরজাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার কি দুর্ভাগ্য—সে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সে স্নেহ ভোগ করিতে পাইল না—তাঁহার সেবা করিতে পাইল না! আর সেই পত্রে যে স্নেহ আত্মপ্রকাশ করিত সে স্নেহে সে নিষ্ফল জীবনের বিষম বেদনায় কিছু সান্ত্বনা পাইত। তাই শ্বাশুড়ীর পত্র পাইলেই বিরজা সাগ্রহে তাহা পাঠ করিত—একবার নহে, বার বার পাঠ করিত। এ পত্রেও তিনি পূর্ব্বের সকল পত্রের মত বিরজাকে কত কথা জানাইয়াছেন—কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—কত উপদেশ দিয়াছেন। আর তিনি তাহার ভ্রাতাভগিনীর বিবাহে যৌতুকাদির জন্য এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিরজা দুই-বার পত্রখানি পড়িল—তাহার পর পত্র ও নোট বাক্সে রাখিয়া দালানে আসিল।

দালান দিয়া যাইবার সময় বিরজা দেখিল, পার্শ্বের কক্ষে সরোজা একা-কিনী বসিয়া আছে। আজ গৃহে উৎসবের সময় তাহাকে একাকিনী সেই কক্ষে দেখিয়া বিরজা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল;—দেখিল, সে একখানি পত্র হস্তে লইয়া কাঁদিতেছে।

বিরজা যাইয়া ভগিনীর নিকটে বসিল। ব্যথার ব্যথী ভগিনীকে পাইয়া সরোজার অশ্রু দ্বিগুণ ঝরিতে লাগিল। বিরজা পত্রখানি লইয়া পড়িল। পড়িয়া সে-ও কাঁদিল। দুই ভগিনীতে কিছুক্ষণ কাঁদিল। তাহার পর শান্ত হইয়া বিরজা পত্রখানি লইয়া পিতার সন্ধানে গেল। সেই পত্রে যতীশচন্দ্র সরোজকে লিখিয়াছিল, সে যখন তাহার কথা শুনে নাই—তখন সে আর

পতির কর্ত্তব্যে বাধ্য নহে। সে পুনরায় বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে। সেই দিনই তাহার বিবাহ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোয়াকে দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন এমন সময় বিরজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আজ গৃহে আনন্দোৎসব। এই উৎসবের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কেবল পত্নীকে ও ব্রজেন্দ্রকে মনে পড়িতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, বিরজার জননী তাঁহার অপেক্ষা কত পুণ্যবতী—তাঁহাকে কন্যার বৈধব্যদুঃখশেল বক্ষ পাতিয়া লইতে হয় নাই। সম্মুখে বিরজাকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি কন্যার বেদনায় আপনার বেদনা বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মা?" বিরজা পিতাকে যতীশচন্দ্রের পত্র দিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্র পাঠ করিলেন। তিনি রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন—কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। যেন তিনি বজ্রাহত—বাহ্যজ্ঞানহত। তাঁহার মনে হইল, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই কেন?

দেখিতে দেখিতে গৃহে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল—অন্ধকার গৃহ নির্ব্বাপিত দীপের ধূমে আরও অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ পিতাকে বলিল, তাহারা কলিকাতায় চলিল। পার্ব্বতীচরণ বলিল, সে যেমন করিয়াই হউক যতীশচন্দ্রের বিবাহ বন্ধ করিবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যাইতে চাহিলেন,—বামাচরণ বলিল, "আমরা তাঁহাকে পাইলে না লইয়া আসিব না। আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ আপনি আজ গৃহ হইতে যাইলে গৃহে সব বিশৃঙ্খল হইবে। এ দিকেও ত সব দেখিতে হইবে।"

বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ কলিকাতায় পৌঁছিয়া যতীশচন্দ্রের বাসায় গেল। যতীশচন্দ্র তথায় নাই। অমূল্যচরণ আশঙ্কা করিয়াছিল, এ বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তাহার পরামর্শে যতীশচন্দ্র আপনার বাসা হইতে যাইয়া তাহার বাসায় উঠিয়াছিল।

বাসায় যতীশচন্দ্রকে না পাইয়া বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ তাহার বন্ধু অমূল্যচরণের গৃহে গেল। তথায় যতীশচন্দ্রের সন্ধান চাহিলে অমূল্যচরণ তাহাদিগকে যেরূপে অপমানিত করিল—পূর্ব্বে কখনও তাহারা সেরূপ অপমান ভোগ করে নাই। বামাচরণ ক্রুদ্ধ হইল, ভ্রাতাকে বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে। এখন চল।" পার্ব্বতীচরণ ভ্রাতাকে শান্ত করিল; বলিল, "আমা-

দের অপমানে দুঃখ কি? যদি সরোজার সর্ব্বনাশ নিবারণ করিতে পারি, তবে কোন অপমানই অপমান মনে করিব না।"

দুই ভ্রাতা অনাহারে সমস্ত দিন অমূল্যচরণের গৃহের সম্মুখে রাজপথে দাড়াইয়া রহিল। বৈশাখের সূর্য্য অগ্নিময় কর বর্ষণ করিয়া রাজপথ দুঃসহ তাপে তপ্ত করিয়া দিল—পথিপার্শ্বস্থিত গৃহগাত্র হইতে দারুণ উত্তাপ নির্গত হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে বৈশাখের দীর্ঘ দিনও শেষ হইয়া আসিল; রাজপথে ছায়া পড়িল, বিরলপথিক পথে আবার পথিকের বাহুল্য লক্ষিত হইল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল। বামাচরণ বিরক্ত হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ স্থির—ধীর।

তাহার পর গৃহদ্বারে দুইখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কয়জন যুবক গৃহ হইতে আসিয়া একখানিতে উপবিষ্ট হইল। দুই ভ্রাতা গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্যচরণ গৃহদ্বারে বামাচরণের ও পার্ব্বতীচণের অবস্থান লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার আদেশে গাড়ির সহিস রূক্ষ কণ্ঠে—ভ্রাতৃদ্বয়কে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। বামাচরণের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছিল। এবার সে সীমা অতিক্রান্ত হইল। রাজপথে দাঁড়াইবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া সেও রূক্ষ কণ্ঠে উত্তর দিল। দুইজনে বচসা আরব্ধ হইল। পার্ব্বতীচরণ আর ভ্রাতাকে স্থির রাখিতে পারিল না।

এই বচসার সুযোগে অমূল্যচরণ যতীশচন্দ্রকে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিতপদে শকটে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিয়া গেল, সহিস গাড়ীর পশ্চাতে উঠিল। পার্ব্বতীচরণ উন্মাদের মত শকটের পশ্চাদ্ধাবনপর হইল; কিন্তু গাড়ী ধরিতে পারিল না। সে যখন শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন বামাচরণ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মুখ বৈশাখের ঝঞ্ঝাভীষণ অপরাহ্নের মত অন্ধকার; তাহার চক্ষুতে ক্রোধদীপ্তি।

সেই দিনই দুই ভ্রাতা কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রদিগের অবস্থা দেখিয়াই তাহাদের অসাফল্যের পরিচয় পাইলেন। পার্ব্বতীচরণ সব কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বামাচরণ কোন কথা কহিল না, বিষম বেদনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল।

কোনরূপে নিয়ম রক্ষা করিয়া নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ হইয়া গেল। মনে যখন সুখ থাকে না তখন গৃহে উৎসবে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে?

ভট্টাচার্য্য-পরিবারে দুর্দ্দশার ঘন মেঘ ঘনীভূত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল, যে বজ্র সরোজার বক্ষে পতিত হইয়াছে সেই বজ্রেই তাঁহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। বিরাজার বৈধব্য বিধাতার শাস্তি—অদৃষ্টের দণ্ড। কিন্তু সরোজার দুর্দ্দশা—এ যে মানুষের স্বকৃত বিষম বেদনা! হায় বিধাতার দণ্ড অপেক্ষা মানুষের দণ্ড কত অধিক বেদনাদায়ক!

সরোজা এ সংবাদ শুনিল। এ সংবাদ এমনই মর্ম্মভেদী যে, সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে উপলব্ধি সময়সাপেক্ষ—যত দিন যায় তত দুর্দ্দশার বেদনা পরিস্ফুট হয়—তত বেদনার স্বরূপ সপ্রকাশ হয়।

বিরহিনী।

সাঁঝের তারাটি গোধূলি-গগনে
নীরবে ফুটেছে হাসিয়া,
উপবনে ফুল হেসে পড়ে লুটে
মলয়-সোহাগে দুলিয়া,
বিহগ ফিরেছে আপন কুলায়ে
কাকলি থেমেছে কাননে।
ফেরে নিক বঁধু কেন গো এখনো
হাসিসুধা নিয়ে আননে?
সুনীল গগন ছাইয়া গিয়াছে
সুপ্ত জ্যোছনা-কিরণে,
কাননে কুসুম ঘুমায়ে পড়েছে
বিভোর প্রণয়-স্বপনে,
নিঝুম নিশীথ, ঘুমায় তটিনী
মলয়া পড়েছে ঢুলিয়া,
ছল ছল আঁখি নিরালা কুটীরে
বধুয়া কেবল জাগিয়া।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

জিন্নতুন্নিসা বেগম।*

জিন্নতুন্নিসা নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ'র একমাত্র কন্যা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জিন্নৎ বেগমের জীবনের বিশেষ গৌরবময় কাহিনী লিপিবদ্ধ না থাকিলেও তাঁহার জীবন নানাবিধ ঘটনার অধীন হইয়াছিল। সে ঘটনাগুলি সহজে পাইবার উপায় বড় কম। আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

যৎকালে মুর্শিদ কুলি খাঁ হায়দ্রাবাদের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার কন্যা জিন্নতুন্নিসার সহিত দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী সুজা খাঁ'র পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সুজা খাঁ খোরাসানাধিবাসী তুর্কজাতীয় 'আফ্সার' বংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি জিন্নতুন্নিসাকে বিবাহ করিয়া নবাব মুর্শিদ কুলির পরিবারমধ্যেই বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে শ্বশুরের যত্নে ও চেষ্টায় সুজা খাঁ উড়িষ্যার সুবাদারপদে অধিষ্ঠিত হয়েন; কিন্তু অত্যল্পকাল পরে শ্বশুরের সহিত তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। উভয়ের মনোভাব বিভিন্ন থাকায় ও শাসনকার্য্যে নানাবিধ মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সুজা শ্বশুরের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া, উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

সুজা খাঁ ন্যায়প্রিয় ও সদ্গুণালঙ্কৃত লোক ছিলেন ও কখনও ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত গুণই তাঁহাকে প্রজাপ্রিয় করিয়াছিল।

পিতার সহিত মনোবিবাদের জন্য ও স্বামীর চরিত্রহীনতার কথা শুনিয়া, সুজার সহিত ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা জিন্নতুন্নিসার বিবাদ আরব্ধ হইল। ইহারই ফলে বেগম সাহেবা স্বীয় পুত্র সরফরাজকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে† আসিয়া শান্তিময় প্রাণে পিত্রালয়েই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

সুজার উড়িষ্যায় অবস্থানকালে মীর্জ্জা মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। মির্জ্জা আফ্সার বংশীয়া সুজার কোন আত্মীয়াকে

---

* ইঁহার অপর নাম আজামুন্নিসা বা আজামাতুন্নিসা।

† মুর্শিদ কুলি স্বীয় নামানুসারে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন।

বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে দুইটি পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ হাজি অহম্মদ ও কনিষ্ঠ আলিবর্দ্দী। মীর্জ্জা মহম্মদ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দিল্লী হইতে পত্নীকে লইয়া সুজার নিকট ভাগ্য পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়েন। সুজা তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়া নিজাধীনে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর ঘটনাচক্রচালিত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁও উড়িষ্যার নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সাহস ও বুদ্ধিবলে সুজার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। দিন দিন আলিবর্দ্দীর উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাজি অহম্মদকে সাজাহানাবাদ হইতে সপরিবারে উড়িষ্যায় লইয়া আসিলেন। উভয় ভ্রাতাই যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে ও রাজ্যপালননীতিতে বিচক্ষণ ছিলেন। ইঁহারা নানা বাধা বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া সুজা খাঁ'র শাসনশক্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় প্রতিভাবলে সুজার অধীনে সর্ব্বোচ্চ রাজপদ লাভ করিলেন।

মুর্শিদ কুলি আপনার মৃত্যু নিকট দেখিয়া ও জামাতা সুজার প্রতি পূর্ব্ববৎ বিরূপ থাকায়, স্বীয় কন্যা জিন্নতুন্নিসার পুত্র সরফরাজকে বাঙ্গালার নিজামৎ প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করেন। এই কথা সুজার কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি আলিবর্দ্দী ও হাজি অহম্মদের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নিজামতি প্রাপ্তির জন্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট ন্যানাবিধ বিচিত্র উপঢৌকন পাঠাইলেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের জন্য আরজীও পেশ করিলেন।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই মহাপ্রতাপশালী নবাব মুর্শিদ কুলির নশ্বর দেহ শীতল সমাধিতলে বিশ্রাম লাভ করিল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বেই সুজা, আলিবর্দ্দীকে সঙ্গে লইয়া, মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন; পথিমধ্যেই তিনি দিল্লী হইতে পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলেন ও শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের পথ ধরিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্রই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্না হইয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন। সুজা খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। মুর্শিদাবাদের স্বর্ণখচিত মসনদ তাহার দেহভার বহন করিয়া সৌভাগ্য বোধ করিল;

যথাসময়ে এই সংবাদ সরফরাজের কর্ণে পৌঁছিল। জিন্নতুন্নিসা তখন মুর্শিদাবাদ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সরফরাজ তখনই পিতৃসকাশে আগমন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ও তাঁহার মসনদ

অধিকারে কোনরূপ বিষণ্ণচিত্ত না হইয়া বরং প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পিতাপুত্রে এই ভাবেই মিলন হইল।

এই সময়ে আজিমাবাদ (পাটনা) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার অধীনে আসিল, ও তাহার শাসনভার সুজার হস্তে পড়িল। সুজা খাঁ তাঁহার দুই পুত্র সরফরাজ ও তকী খাঁ'র মধ্যে কাহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জিন্নতুন্নিসা স্বীয় পুত্র সরফরাজকে পাটনায় পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু অসূয়াপরবশ হইয়া সপত্নীপুত্র মহম্মদ তকীকেও* প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধা দিলেন। সুজা পত্নীর অমতে কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি আলিবর্দ্দীকেই প্রতিনিধিরূপে পাটনায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। জিন্নতুন্নিসা এই প্রস্তাবের সম্যক্ অনুমোদন করিলেন। তিনি আলিবর্দ্দীর নিয়োগে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কক্ষদ্বারে ডাকাইয়া আনাইয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন ও তিনি নিজেই যেন তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, আভাসে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।†

নাদির শাহ যখন দিল্লীর দ্বারে উপস্থিত, সেই সময়ে বাঙ্গালার লোকপ্রিয় প্রজাহিতৈষী নবাব সুজা খাঁ পরলোক গমন করিয়া রোশনীবাগে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র সরফরাজ মসনদে অধিরূঢ় হইলেন। আলিবর্দ্দী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের শ্রীবৃদ্ধিতে সরফরাজের দরবারে তাঁহার কতকগুলি শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিনিয়ত সরফরাজকে মীরজা মহম্মদ, আলিবর্দ্দী, ও হাজি অহম্মদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ইহার ফলে হাজি অহম্মদকে প্রধান দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদ হইতে বিচ্যুত করা হইল ও তাঁহার জামাতা আতাউল্লা খাঁ'র হস্ত হইতে রাজমহলের ফৌজদারী গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে

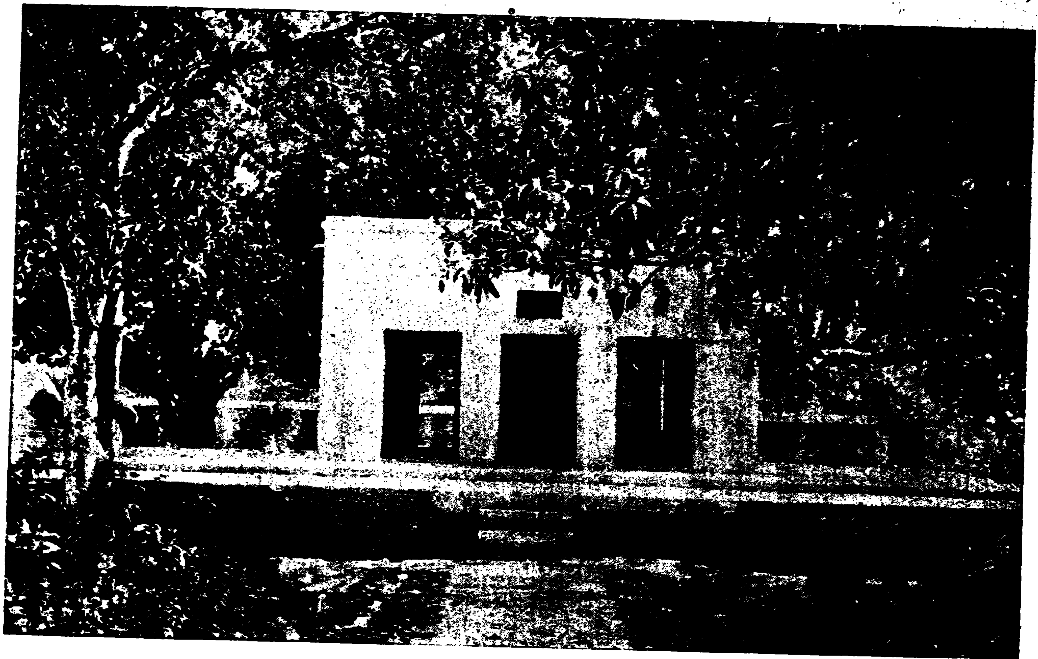
* Holwell বলেন—মহম্মদ তকী জিন্নতুন্নিসার গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ পুত্র।

† *She* appointed him to the government of Behar, as from herself.

এই স্থলের পাদটীকায় মুতাক্ষরীণকার লিখিয়াছেন:—

Zinet-en-nissa seems to have insisted on her husband recognising her as the heiress to the government, and considered him rather as the viceroy consort than viceroy in his own right.

Siyar-ul Mutakharin, Translated by John Briggs. Vol. I p. 385,



সুজার সমাধি।

Mohila Press, Calcutta.

পদচ্যুত করিবার মন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে হাজি অহম্মদ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রতীকার বিধানের জন্য স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে পত্র লিখিলেন।

আলিবর্দ্দী এই সংবাদ শ্রবণে ও সরফরাজের নানারূপ অত্যাচারে সসৈন্যে পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন ও গিরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে সরফরাজকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিলেন। যুদ্ধের দুই দিবস পরে আলিবর্দ্দী বিশেষ সমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মসনদে বসিবার পূর্ব্বে তিনি জিন্নতুন্নিসার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন ও সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বেগম সাহেবার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কহিলেন; পরে ধীর স্বরে বলিলেন—"অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে এবং এই হতভাগ্য গোলামের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্জ্বল্যমান রহিবে; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিব না। আশা করি, এই হতভাগ্য সন্তপ্ত গোলামের অপরাধ সময়ে আপনার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে।"

ইহা শুনিয়া জিন্নতুন্নিসা আর কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

ইহার পর বেগম সাহেবার বিষয় ইতিহাসে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

আজিমনগরের প্রাসাদ হইতে আধ মাইল উত্তরে, বেগম সাহেবা যে, মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মসজিদের অনতিদূরে তিনি সমাহিতা আছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

—:—

নীলাম্বরী*।

সকল দেশেই সময়ে সময়ে এক একজন শক্তিশালী লেখক আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রের যে দিকেই বিচরণ করেন, সেই দিকেই সোণা ফলাইতে পারেন। তাঁহারা ধূলামুঠা ধরিলে তাহা প্রতিভার পরশপাথরস্পর্শে সোণামুঠা হইয়া যায়। আমাদের দেশে ৺বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর লেখকের অগ্রণী। সাহিত্যের নানা বিভাগেই ইঁহারা উভয়ে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা দেখাইয়াছেন। জনসনের কথার উপর একটু রং চড়াইয়া একজন আধুনিক সমালোচক গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন (He was a very literary Midas; he could transmute to gold whatever he touched) তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলে কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও আরও কোন কোন লেখক আমাদের সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচিত্র কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র অতি অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যের নানা বিভাগে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনিও এই শ্রেণীভুক্ত হইবার বিলক্ষণ দাবী রাখেন। তিনি দর্শন-শাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপক। গত কয়েক বৎসরে তিনি যে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার বিদ্যাবত্তা, চিন্তাশীলতা, যুক্তিপ্রয়োগকৌশল ও ভাবপরিস্ফুটীকরণ-ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দেয়। তবে দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপকের পক্ষে দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব লাভ তাদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তিনি শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলনে একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, সেগুলিও তাঁহার চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তির পরিচায়ক। তাঁহার প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষজ্ঞের পুস্তককেও পরাস্ত করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় এমন

* নীলাম্বরী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আকর্ষণী-শক্তি, ইতিহাসের কাহিনী বলিবার তাঁহার এমন কৌশল যে, তাহাতে শিশু চিত্তে ত উৎসাহের সঞ্চার হইবেই, মাদৃশ মাতামহত্বপ্রাপ্ত জরদ্গবের হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে; একাসনে বসিয়া একমনে একধ্যানে গ্রন্থখানি আগুন্ত—আদ্যোপান্ত নহে, কেন না শেষ রাখি নাই—পড়িয়া ফেলিয়াছি। আবার তিনি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদসম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে ভাষাতত্বজ্ঞের প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

খগেন্দ্র বাবু যদি এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে কবিকল্পনাকুশল—এ অপবাদ লোক সাহস করিয়া দিতে পারিত না। কিন্তু তিনি 'আর্য্যাবর্ত্ত' 'মানসী' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে যে ছোট গল্পগুলি লিখিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, শুষ্ক দার্শনিক তত্ব তাঁহার হৃদয়কে ঊষর ক্ষেত্রে পরিণত করে নাই। ইহা ছাড়া অল্প অল্প স্মরণ হয়, 'মানসীর' পত্রের আবডালে তাঁহার দুই একটি কবি-কাকলীও শ্রুতিগোচর হইয়াছে, সেগুলির কেমন একটা মোহময়, স্বপ্নময়, ভাবের আবেশে চিত্ত মোহিত হয়। আবার এমন কথাও কাণাঘুঁষা শুনিয়াছি যে, খগেন্দ্র বাবু সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতকলাকুশল, তাঁহার গীতগোবিন্দ-গান রসিক সুজনের উপভোগ্য। বাস্তবিকই খগেন্দ্র বাবুর গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়
একাধারে এত গুণ বিরাজিত রয়।

যাক্, আর বাড়াবাড়ি করিব না, শেষে পাঠকবর্গ না ভাবিয়া বসেন যে, সমালোচকের অবস্থা 'নীলাম্বরী' গল্পের নায়কের ন্যায়!

সম্প্রতি খগেন্দ্র বাবু নানা মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বপ্রকাশিত আটটি গল্প একত্রে বাঁধিয়া, "বিচ্ছিন্ন পল্লবগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া", 'নীলাম্বরী' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, কালী, get-up, সমস্তই পরিপাটী। 'নীলাম্বরী' নীলাম্বরীতে মোড়া, সেই নীলাম্বরীর উপর আবার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের সোণার চুম্‌কি বসান। পাঠকদিগকে অনুরোধ করা বেয়াদবী হইবে, পাঠিকা-সুন্দরীরা—হেমবরণীই হউন আর শ্যামবরণীই হউন—এক একখানি

কিনিয়া পড়ুন (পরুন!)। পাঠিকাদিগকে লইয়া একটু রসিকতা করিলাম, কুরুচি হইল না ত!

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে—এ পুস্তকখানিরও দোষ আছে। এমন সুন্দর সুদৃশ্য পুস্তকে একখানি ছবি নাই। পাঠকবর্গ ডরাইবেন না, ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির কথা তুলিতেছি না। লাহা মহাশয়ের অঙ্কিত 'নীলাম্বরী সুন্দরী'র একখানি চিত্র থাকিলে ষোল কলা সম্পূর্ণ হইত। অনুকল্পে, গ্রন্থকারের ফুটফুটে চেহারাখানির একটি ফোটো থাকিলেও মন্দ হইত না। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে না কি?

পুস্তকখানি কাহার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, "তিনি হন কে= Who is S H E?" সে এষা—অর্থাৎ কি না, অন্বেষণ আমাদের অধিকারবহির্ভূত। আমরা কেবল—The greatest art is to hide art!

প্রথম গল্পটির নাম 'নীলাম্বরী'। সেই গল্পটির নামে গোটা বহিটার নামও নীলাম্বরী। মায়ের অনেকগুলি সন্তান হইলেও প্রথম সন্তানের নামেই আমাদের সমাজে মায়ের পরিচয় দেওয়া রীতি। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, পুস্তকের নামকরণে কোন অসঙ্গতি হয় নাই।

এই পর্য্যন্ত গেল মলাট সমালোচনা। এক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করি।

প্রথম গল্পটিতে ব্যঙ্গের একটি চাপা সুর বড় মিঠে বাজিয়াছে। প্রেমের পথে যাত্রী হইতে হইলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে অসঙ্গতি ঘটে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ কোন কোন কবিতায় ও 'গোড়ায় গলদে' সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। "নলিনীর মত হৃদয় তাহার, নলিনী যাহার নাম," ললিতমোহন নাম যা'র সে রমণীমনমোহন, আর নিমাই নামের নায়ক গড়ো গোয়ালা হইবেই হইবে, ইত্যাকার কবিত্বময়ী যুক্তির দুর্গতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে বিলক্ষণ ঘটিয়াছে। খগেন্দ্র বাবুও এই গল্পে, কল্পনা ও আসলে গড়মিল হইয়া কি বীভৎস কাণ্ডের সৃষ্টি করে, তাহা প্রকৃত দার্শনিকের মতই দেখাইয়াছেন। আশা করি, খগেন্দ্র বাবু নিজেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন এবং তাহার ফলে, তাঁহার নায়কের ন্যায়—তাঁহারও দাম্পত্য জীবন সুখময়—শান্তিময় হইয়াছে। ছার বাঙ্গালীজীবনে এই অসঙ্গতিই যে একটা নিষ্ঠুর Irony.

এ গল্পের অধিক প্রশংসা না করিলেও চলে, কেননা 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথরেও ইহাতে এক রতিও খাদ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় গল্প—'হতভাগ্য'—একটি করুণ কাহিনী। "যে যাহারে ভাল-বাসে সে যাইবে তা'র পাশে"—এই চিরন্তন বিধি ও সেই বিধির উপর বিধির চিরন্তন অভিশাপের কথা। সমাজতত্ত্ব হিসাবে এ গল্পে শিক্ষণীয় আছে।

তৃতীয় গল্প—'প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী'— আরও করুণ। রমণীপ্রেম ও বন্ধুত্বের মধ্যে নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষ ও তাহার ফলে নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

চতুর্থ গল্প—'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'—বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একটি মধুর চিত্র—idyll। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে একটু ভয় হইয়াছিল, বুঝি 'নীলাম্বরী'র ন্যায় এখানেও বাস্তব ও আদর্শের অসঙ্গতি একটা ঘোর বিড়ম্বনায় পরিণত হয়, অথবা শিল্পী নায়ক গ্রীকপুরাণোক্ত Pygmalion এর দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন এবং মধুর উপাখ্যানটির শুভদৃষ্টিতে মধুর উপসংহার হইয়াছে।

Soft eyes looked love to eyes which spake again,
And all went merry as a marriage-bell.

পঞ্চম গল্প—'আশার সমাধি'—আরম্ভে হাস্যরস, অবসানে করুণরস। পুরীতে সমুদ্র-বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে অতি সুন্দর ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকের মেশামিশি আমার ধাতে বড় সহে না। সুতরাং গল্পটি ভাল লাগিল না। তবে সে জন্য অবশ্য খগেন্দ্র বাবু অপরাধী নহেন—আমারই রুচির দোষ। (এই অধম সমালোচকের রুচির দোষ বিলক্ষণ আছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।) শিক্ষিতা যুবতীর নিকট শিক্ষিত যুবকের বিদ্যাগর্ব্ব কবিত্বগর্ব্ব ইত্যাদি ও অবশেষে দর্পচূর্ণ—এইরূপ আর একটি গল্প যেন কয় বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতীতে' পড়িয়াছিলাম মনে হয়। তবে এরূপ ঘটনা এমন অসাধারণ নহে যে, দুইজন লেখক পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই প্রকারের ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন না।

সপ্তম গল্প—'প্রত্যাবর্ত্তন'। এই নামে প্রভাত বাবুরও একটি গল্প আছে। তবে প্রভাত বাবুর প্রত্যাবর্ত্তন—পরকীয় সমাজ হইতে স্বকীয় সমাজে, ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে; আর খগেন্দ্র বাবুর—শ্রীবিষ্ণুঃ—রামশরণের প্রত্যাবর্ত্তন প্রবাস হইতে গৃহে! 'Home? What home? Had he a home?' গল্পটির Enoch Arden এর সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে,

অথচ যথেষ্ট অমিলও আছে। সুতরাং মৌলিকতার হানি হয় নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। রামশরণের কাহিনীটি করুণ নহে—নিষ্করুণ। আমরা এরূপ সামাজিক চিত্রের পক্ষপাতী নহি। জানি, জগতে আলো আছে, ছায়াও আছে; পূর্ণিমা আছে, অমাবস্যাও আছে; দেবী আছে, পিশাচীও আছে। কিন্তু কল্পনাকুশল কবির মুখে আমরা সে কঠোর সত্য শিখিতে চাহি না। আমরা নারীকে দেবীরূপে, গৃহলক্ষ্মী-রূপে, দেখিতে চাহি, তাঁহার পিশাচীমূর্ত্তি দেখিতে চাহি না; তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিকারিণী বলিয়া জানিতে চাহি, তাঁহার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে চাহি না। Enoch Arden এর কাহিনী বিলাতী সমাজে বেশ খাপ খায় কিন্তু আমাদের সমাজে এবংবিধ কাহিনী বড় বিসদৃশ লাগে। গ্রন্থকার সমাজতত্বজ্ঞ দার্শনিকের দিক্ হইতে কলঙ্কিনীর উপর যথেষ্ট অনুকম্পা বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলই ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই দুইটি গল্পসম্বন্ধে যে মন্তব্য করিলাম, তাহা হিন্দু-'কুসংস্কারের' বশবর্ত্তী হইয়াই করিলাম—কেন না আমার Personal idiosyncrasy সেই দিকে। সম্ভবতঃ মার্জ্জিতরুচি পাঠকবর্গ উভয় গল্পই উপভোগ করিবেন।

'ঘুমের পাহাড়' ও 'বাঁশীচোর' দুইটি গল্প জনপ্রবাদ অবলম্বনে লিখিত। যিনি ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষেত্রান্তরে কৃতিত্ব-লাভ করিয়াছেন, তিনি যে জনপ্রবাদ অবলম্বনে মনোমদ কাহিনী রচনা করিতে পারিবেন, সে আর বিচিত্র কি? কেন না জনপ্রবাদের মূলে অনেকখানি কবিত্বরস in a crude form সঞ্চিত থাকে। দুইটি গল্পই বড় করুণ, বড় মধুর। 'ঘুমের পাহাড়ে' প্রেমিক যুগলের জীবনের অবসান বড়ই মর্ম্মভেদী। গল্প দুইটির ভাষাও অপূর্ব্ব আবেশময়।

'বাঁশীচোর' গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর In small proportions we just beauties see—এই কবিবচন স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা একটি নিটোল মুক্তা, ভাষা ভাব রস সবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। গল্পটির ভাষা এমন পরিপাটী, বর্ণনার ভঙ্গী এমনই মনোহর, শব্দচয়নকৌশল এমন সুন্দর যে একটি শব্দ বা বাক্য বাদ দেওয়া যায় না। স্থানাভাবে নিদর্শনস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, বড় দুঃখ রহিল। তবে দুঃখের মধ্যে এই

সান্ত্বনা যে, একটু আধটু উদ্ধৃত করিয়া মনের খেদ মিটিত না, কোন অংশ ছাড়িবার যো নাই। মিলটন Simple, Sensuous Passionate বলিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে নির্দ্দেশ যদি যথার্থ হয়—তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব, 'বাঁশীচোর' গল্পে প্রকৃত কবিত্ব আছে।

'নীলাম্বরী,' ও 'বাঁশীচোর' পুস্তকের আদিতে ও অন্তে বসাইয়া গ্রন্থকার সুন্দর নির্ব্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এতক্ষণ গল্পগুলি ব্যষ্টিভাবে দেখিলাম। এক্ষণে সমষ্টিভাবে দেখিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম গল্পটি ছাড়া অন্য সমস্ত গল্প করুণরসে অভিষিক্ত। প্রথম গল্পেও হাস্যরসের মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় করুণরস রহিয়াছে। দর্শনের অধ্যাপক গল্প লিখিয়াছেন শুনিলেই পাঠকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে, বুঝি George Eliot বা George Meredith বাঙ্গালী সমাজে আবিভূ‌ত হইলেন—বুঝি রবিবাবুর 'গোরা' আবার সঙ্গীন খাড়া করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাঠকবর্গকে অভয় দিতেছি যে, এই আটটি গল্পে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা দর্শনের জটিল তত্ত্ব কাব্যাকারে প্রকটিত হয় নাই।

ছোট গল্পের রাজা রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পার্শ্বেই বোধ করি প্রভাত বাবুর স্থান। ইহা ছাড়া সাহিত্যাকাশের এই অংশে আরও অনেক জ্যোতিষ্ক কিরণ বিতরণ করিতেছেন। খগেন্দ্র বাবু এই আকাশের কোন্ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা বিচার করিতে পারি, এমন শক্তি আমাদের নাই। আমরা গল্পখোর। সকল শ্রেণীর সকল রসের গল্পই আমাদের ভাল লাগে। সাহিত্যফলাহারে আম, জাম, লিচু, গোলাপ জাম, কমলা লেবু, মর্ত্তমান কলা সবই আমরা নির্ব্বিকারচিত্তে উপভোগ করি। সাহিত্যরুচির এরূপ সার্ব্বভৌমিকতা বোধ হয় নিতান্ত দোষের নহে।

পুস্তকের ভাষাসম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থকার সাধু-ভাষার পক্ষপাতী। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার দত্তের পর, কালী-প্রসন্ন ঘোষ ও রজনীকান্ত গুপ্ত সাধুভাষার দিকে খুব ঝুঁকিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বর্ত্তমান কালে এই Schoolএর একমাত্র exponent; খগেন্দ্র বাবুও সেই পথ ধরিয়াছেন। তবে তিনি ও মৈত্রেয় মহাশয় প্রয়োজন-মত চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সাধুভাষা সামলাইয়া লেখা

একটু হুঁসিয়ারি কায। অনেকেই তাল' রাখিতে না পারিয়া 'মড়াদাহ' করিয়া বসেন। কিন্তু খগেন্দ্র বাবু পাকা ওস্তাদের মত কলমের রাশ ধরিয়া রাখিয়াছেন। কোথাও গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে নাই। তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার বিচিত্র লীলাময়ী ভাষার নিবিড় বন্ধন লিপি-কুশলতার পরিচায়ক।

* * * * * * *

এরূপ সমালোচনায় পাঠকবর্গ চটিবেন, তাহা জানি। সর্ব্বত্র আভাসেই সারিলাম, গল্পগুলির সংক্ষিপ্তসার দিলাম না; পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিলাম, কিন্তু তাহা নিবৃত্ত করিলাম না। তাঁহাদিগকে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে। গুরুতর অপরাধ বটে!

এরূপ সমালোচনায় সম্পাদক চটিবেন, তাহাও জানি! সত্যবানের স্থায় কুঠারহস্তে (সাহিত্যের) জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম না, দুই হাতে কুঠার উঠাইয়া কুবৃক্ষ স্থবৃক্ষ সাবাড় করিলাম না, গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় সর্ব্বজ্ঞতার ভান করিলাম না; শুধু নিজের কি ভাল লাগিল কি মন্দ লাগিল, ইত্যাদি নিতান্ত ঘরোয়া কথায় তাঁহার অমূল্য পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিলাম, ইহাও কম অপরাধ নহে।

এরূপ সমালোচনায় নিপুণ সমালোচক চটিবেন, তাহাও জানি। কেন না, আটটি গল্প পড়িয়া অন্ততঃ আট মাস না যাইতেই সমালোচনা করিয়া বসিলাম। 'অচলায়তনের' বেলায়ও এইরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম। নিপুণ সমালোচক সেজন্য লেখককে চপলতাদোষে দোষী করিয়াছিলেন। এবারেও খগেন্দ্র বাবুর দোহাই—তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ। একখানা কৌতুকনাট্য বা কয়েকটি ছোট গল্প সমালোচনা করিতে যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইত্যাদি দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী কঠোর সাধনার প্রয়োজন, বুদ্ধদেবের স্থায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা শুকদেবের স্থায় কঠোর গর্ভবাস না করিয়া সাহিত্য সমালোচনা 'পত্রস্থ করা' যে নিতান্ত হঠকারিতার কায,, এই সহজ কথাটা আজও প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বাকী রহিলেন—গ্রন্থকার। বর্ত্তমান সমালোচক গ্রন্থকারের নায়িকা মনীবালার স্থায় অনুকূল সমালোচক নহেন। তথাপি যদি গ্রন্থকার প্রীত হয়েন, তাহা হইলে বলিব—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আর যদি তিনি তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হয়েন, তবে বলিব—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতে

কোঽত্র দোষঃ ? কোন দিক্ দিয়াই অনুষ্টুপের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। আর যখন অনুষ্টুপ্ হইলেই শাস্ত্রীয় বচন, তখন শাস্ত্রের বাণী গ্রন্থকারকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতেই হইবে। ইত্যলং বিস্তরেণ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতার রূপ।

১

প্রেমে হয় ভাব-রস-বোধ,
জ্ঞানে হয় ভাবের বিকাশ ;
যেথা জ্ঞান প্রেমের মিলন,
সেথা ভাব-রসের প্রকাশ।

২

কবি হৃদি জ্ঞান পারিজাত,
মাখি' অঙ্গে প্রেম সুধাধার ;
ফুটে যবে সাহিত্য নন্দনে,
ধরে চারু রূপ কবিতার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যৌবনাবসান।

১

কোথা গেল সাধের যৌবন?
কোথা গেল সেই হাসি,
বিকসিত ফুল্লরাশি,
একি ঘোর অবসাদ-জড়তা-বেষ্টন!
প্রাণে আর নাহি সুর,
সে মত্ততা চুর-চুর
নাহি সে কল্পনা ভ্রান্তি, কবিত্ব-স্বপন।
কোথা গেল সাধের যৌবন!

২

সেই শশী, সেই রবি,
সেই সমুজ্জ্বল ছবি,
শ্যামল আঁচল পাতি' ধরণী তেমন;
নবীন নীরদ-কোলে,
তেমনি বিজলী দোলে,
তেমনি বসন্তে ফুল, ভ্রমর-গুঞ্জন।
কোথা গেল সাধের যৌবন!

৩

নদী সেই কূলে কূলে
জল-কল-তান তুলে
উছলি 'উছলি' চলে করিয়া নর্ত্তন;
সেই রৌদ্র পড়ে তীরে,
সোনালী কলসে নীরে,
সেই মেঘচ্ছায়া জলে নিকষ-বরণ।
কোথা গেল সাধের যৌবন!

৪

সেই প্রকৃতির হাসি,
বিশ্বভরা শোভারাশি
সেই মত ঋতুচক্র করে আবর্ত্তন।
সেই মধু, সেই পিক
মুখরিত করে দিক্,
আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে আকুল পবন।
কোথা গেল সাধের যৌবন!

৫

মোর তরে নহে কেহ,
কেন তবে এ সন্দেহ?
আমি বুঝি সেই নহি, কি পরিবর্ত্তন!
আপনার পানে চাহি—
সে হৃদয় আর নাহি;
জীবনে উৎসব বুঝি মোর সমাপন।
কোথা গেল সাধের যৌবন!

৬

ভাঙ্গিছে স্বপন-ভ্রান্তি,
বুঝে নিবে কড়া ক্রান্তি
যে দিয়েছে, হবে তা'রে করিতে অর্পণ;
মিছে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি,
মিছে আপনারে ছলি,
অ তীতের তীরে বসি' বৃথা এ ক্রন্দন;
কোথা গেল সাধের যৌবন!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

অরাজকতা।

ফরাসীরাজ বিদ্রোহ দমনকল্পে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুগ্রহ নিবন্ধন অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে ফরাসীজাতি পাশব শক্তিপ্রভাবে পরাজিত হইয়া অচিরে অবনত মস্তকে তাঁহার পদানত হইবে, ভাবিয়াছিলেন তাহারাই বাহুবলে রাজশক্তি পরাভূত করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান। সেইজন্য প্রগুক্ত ঘটনাপরম্পরায় ফরাসীদেশের রাজশক্তি এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু রাজশক্তির অন্তর্ধান মানব-সমাজের কল্যাণকর নহে। প্রজাপীড়ক ভূপতিবৃন্দের যথেচ্ছাচার এবং অরাজকতা উভয়ই তুল্য। বিদ্রোহিগণের সহিত গার্ড ডি ফ্রান্সের যোগদান, ইনভ্যালিড্ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ব্যাসটাইল দুর্গ বিজয় ইত্যাদি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরায় প্যারিস নগরের অশিক্ষিত ইতর সাধারণ যৎপরোনাস্তি প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপন সহজ ব্যাপার নহে। রাজা ফরাসী জাতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন; বিদেশীয় সৈন্যগণ স্থানান্তরিক হইয়াছে; ব্যাসটাইল দুর্গ ভূমিসাৎ হইতেছে—তথাপি ইতর সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে না। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক—অর্থাগমের চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সশস্ত্র যথাতথা ভ্রমণ করিতেছে; স্ত্রীপুত্র-গণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় চিন্তা না করিয়া অহোরাত্র রাজপথে জয়োল্লাস প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে। ব্যাস্‌টাইল দুর্গের নিবিড় তমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠা-বলী আগ্রহ সহকারে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও তাহাদের হৃদয়ের আবেগ নিবারিত হইতেছে না। রাজনীতিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া তাহারা জগৎ সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে।

উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র দেশ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম দেখিয়া স্বদেশসেবক নেতৃগণ অভিনব প্রকারে শাসন-শক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। প্যারিস নগর ৬০ ভাগে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক বিভাগের অধিবাসিগণ পঞ্চজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন। এইরূপে তিন শত প্রতিনিধি লইয়া নগরের মিউনিসিপালিটী

অভিনব প্রকারে সংগঠিত হইল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিভাগে একটি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। শাখা সমিতিগুলি প্রধান মিউনিসিপালিটীর সহিত সংস্রব রাখিয়া স্ব স্ব বিভাগসংক্রান্ত যাবতীয় শাসন-শক্তি পরিচালনে প্রবৃত্ত হইল। প্যারিস নগরের আদর্শে সমগ্র দেশে মিউনিসিপালিটী ও শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরে জাতীয় সৈন্যদলের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র শাসন-শক্তি ফরাসী রাজের হস্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া সমগ্র জাতির হস্তে ন্যস্ত হইল। জাতীয় সমিতি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকলাপের অনুমোদন করিলেন।

প্রাগুক্ত রূপে শাসন-শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল বটে; কিন্তু পিশাচ-প্রকৃতি ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ রাজনীতিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ইহারা যথেচ্ছাচারকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করিয়া মানব সমাজে ঘোরতর অনর্থ উৎপাদিত করে। প্যারিসের ইতর সাধারণ দুর্দ্দমনীয় রিপুবর্গের বশবর্ত্তী হইয়া উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যগ্রে ফরাসীরাজ সমরনীতিপরিচালিত হইয়া মন্ত্রিবর নেকারকে অবসর প্রদান পূর্ব্বক ব্রিটীলকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফুলন নামক অশীতিপর বৃদ্ধ তৎকালে অন্যতম বিভাগের মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ফুলন এবং ব্রিটীল উভয়েই অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুনর্ব্বার মহানুভব নেকার প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু তথাপি জনসাধারণের মনস্তুষ্টি হয় নাই। ব্রিটীল এবং ফুলনের প্রতি ইহাদের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। একদা অকস্মাৎ এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ফুলন জনসাধারণের প্রতি গালি বর্ষণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত ইতর সাধারণ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিবরকে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত মিউনিসি-পালিটী গৃহে বিচারার্থ লইয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইট কৌশলে বৃদ্ধের জীবন রক্ষার্থ বলিয়া উঠিলেন, "ফুলন এইক্ষণ কারাগৃহে অবস্থিতি করুন। তাঁহার সহিত এই অপরাধে অন্য কেহ সংসৃষ্ট আছে কি না দেখা যাউক। পরে সকলের বিচার একত্রে হইবে।" কিন্তু উন্মত্ত জন-সাধরণের তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব সহিল না। এক ব্যক্তি বলিল, "ইহারা শঠতা পূর্ব্বক ফুলনের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।" অপর একজন বলিল, "ফুলনের আবার বিচারের প্রয়োজন কি?" এই কথা শুনিয়া অপর কয়েক

ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বৃদ্ধকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। মিউনিসিপালিটীর শাসন-সমিতি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিবারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু পামরগণ ফুলনকে হত্যা করিয়াও তৃপ্ত হইল না। তাহারা তাঁহার জামাতা বার্থিয়ারকে ধরিয়া আনিল। অনন্তর বার্থিয়ারের হৃদয়ে বেদনা প্রদানের নিমিত্ত তাহারা ফুলনের ছিন্ন মুণ্ড তৎসমক্ষে রাখিয়া দিল। বার্থিয়ার শ্বশুরের ছিন্ন মস্তক দৃষ্টে সজল নয়নে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। মহানুভব বেলি ও ল্যাফাইট বার্থিয়ারের পরিণাম চিন্তা করিয়া অধীর হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন ক্রমে তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। উন্মত্ত ইতর সাধারণ বার্থিয়ারকে একটি আলোকস্তম্ভের নিকট ধরিয়া আনিয়া উদ্বন্ধনে তাঁহার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত রজ্জু প্রস্তুত করিতে লাগিল। বার্থিয়ার তদ্দৃষ্টে এক ব্যক্তির নিকট হইতে বল পূর্ব্বক একটি বন্দুক লইয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি বন্দুকের সাহায্যে সংখ্যাতীত ব্যক্তিকে নিরস্ত করা যায় না। বার্থিয়ার অচিরে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন পিশাচগণ ফুলন ও বার্থিয়ারের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া মহানন্দে রাজপথে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

শস্যব্যবসায়ীদিগের প্রতি ইতর সাধারণের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। ইহাদের বিশ্বাস যে, শস্যব্যবসায়ীরা অপরিমিত অর্থলালসাপ্রযুক্ত সমগ্র দেশের উৎপন্ন শস্য রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই জন্য অন্নাভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতেছে। এক দিন উন্মাদগণ স্যাভেজ নামক শস্য ব্যবসায়ীকে বন্ধন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিল :—

"রাজা এবং তৃতীয় সম্প্রাদায়ের আদেশক্রমে অদ্য বেলা তিন ঘটিকাকালে স্যাভেজের ফাঁসি হইবে।"

যথা সময়ে হোটেল ডি ভিলার সন্নিধানে সংখ্যাতীত লোক সমাবেত হইল। অচিরে তাহারা স্যাভেজকে একটি আলোকস্তম্ভে ঝুলাইয়া দিল। দেহের গুরুত্ব বশতঃ হতভাগ্য ব্যক্তি ছিন্নরজ্জু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কিন্তু তথাপি সে পাপাত্মাগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহারা অপর একটি রজ্জুর সাহায্যে তাহাকে পুনর্ব্বার সেই আলোকস্তম্ভে ঝুলাইল। তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহারা সঙ্গীন ও তরবারীদ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল। এইরূপে স্যাভেজের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল।

তখন পামরগণ তাহার হস্তপদাদি ও মুণ্ড লইয়া আনন্দে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

কেন্ এবং নরম্যাণ্ডি নগরের ইতর সাধারণ প্যারিস নগরের উচ্ছৃঙ্খলতার অনুসরণ করিয়া যথায় তথায় নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। বুর্বন নগরে বেলজন্স নামক তরুণবয়স্ক যুবক একদল রাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে সেই সৈন্যগণ এযাবৎ বিদ্রোহিদলের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই, সেই জন্য তৎপ্রতি বিপ্লবনেতৃগণের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। মুরাট নামক নেতৃপ্রবর একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বীয় সংবাদপত্রে বেলজোন্সকে উচ্চবংশসম্ভূত বংশমর্য্যাদাভিমানী দেশের শত্রু ইত্যাদি আখ্যা প্রদানে তৎপ্রতি ইতর সাধারণের ক্রোধ উৎপাদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই মুরাটের উদ্দেশ্য সফল হইল। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ উত্তেজিত হইয়া বেলজন্সের প্রাণ সংহারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। শান্তিরক্ষকগণ তাঁহার উপস্থিত বিপদ দৃষ্টে তাঁহাকে স্থানীয় হোটেল ডি ভিলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি প্রহরিবেষ্টিত হইয়া হোটেল ডি ভিলায় গমন করিলেন। কিন্তু তথায়ও বিপদাশঙ্কা দৃষ্টি করিয়া তিনি নগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সম্পাদকপ্রবর বেলজন্সের সংহারের নিমিত্ত পুনর্ব্বার লেখনি ধারণ করিলেন। চলচ্চিত্ত ইতর সাধারণ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষকে দুর্গের বাহিরে আনিয়া নগরের প্রকাশ্য স্থানে, শান্তিরক্ষকগণের সমক্ষে, তাঁহার প্রাণ সংহার করিল।*

ষ্ট্রাসবর্গ, ট্রয়, নিসমে প্রভৃতি নগরসমূহে বিপ্লবব্যাধিগ্রস্ত ইতর সাধারণ রুধিরপ্রবাহে ধরাধাম কলুষিত করিতে লাগিল। সেণ্টডেনিস নগরের শ্রমজীবিগণ নগরাধ্যক্ষের শিরশ্ছেদন করিল। তাঁহার পত্নী এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবলোকনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া একটি কূপের মধ্যে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ম্যান নগরে মণ্ডস্ নামক এক ব্যক্তি তদীয় শ্বশুর কুরিয়ামের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দুরাত্মগণ তাঁহাদিগকে ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কর্ণ ও নাসিকা এবং পরিশেষে তাঁহাদের

*কর্দ্দে নাম্নী পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া যুবতী বেলজন্সের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। বেলজন্সের মৃত্যু না ঘটিলে তিনি কর্দ্দের পাণিগ্রহণ করিতেন। কর্দ্দে কিয়ৎকালপরে মুরাটকে হত্যা করিয়া এই ঘটনার প্রতিশোধ হইয়াছিলেন।

মস্তক ছেদন পূর্ব্বক রুধির-লালসা পরিতৃপ্ত করিল। ষ্ট্রাসবর্গ নগরের হোটেল ডি ভিলা লুণ্ঠিত হইল। ট্রয় সহরের নগরাধ্যক্ষ ইতর সাধারণের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাস্রোতে উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইল।

সমগ্র জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এবম্বিধ যথেচ্ছাচারের ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মানবত্ববিবর্জ্জিত না হইলে, কোন ব্যক্তি সহস্র উত্তেজনায়ও নরপ্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া নরমুণ্ড লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে পারে না। একম্বিধ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের কারণ কি? ফরাসী দেশের ন্যায় ইংলণ্ড দেশেও মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ জাতি কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া বৃথা রক্তপাতে ধরা কলঙ্কিত করে নাই। ফরাসী দেশের ইতর সাধারণ দুর্দ্দমনীয় রিপুবর্গের বশীভূত হইয়া জাতীয় ইতিহাসে কালিমা লেপন করিল কেন? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে আমরা যাহাকে "পুণ্য" বা "সুকৃতি" বলি তাহা দ্বিবিধ কারণপ্রসূত—জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস। জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস একাধারে বিদ্যমান থাকিলে দেবে ও মানবে প্রভেদ থাকে না। কিন্তু তদ্রূপ সম্মিলন সর্ব্বত্র না ঘটিলেও অনেক স্থলে একটির অভাব অপরটির দ্বারা পূর্ণ হয়। কিন্তু অজ্ঞতাতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে যদি ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাব হয়,—যদি বিচারশক্তিবিহীন, হ্রস্বদীর্ঘবোধবিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ ভগবানের রাজ্যে বাস করিয়া ভগবানকে "নিশার স্বপন" জ্ঞানে নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক সুখের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়, তাহা হইলে মানবসমাজে বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কি দৃষ্ট হইবে? ইতঃপূর্ব্বে ভলটেয়ার প্রভৃতি ফরাসী দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মব্যবসায়ী অধর্ম্মাচারী মানবমণ্ডলীর প্রতি অবজ্ঞা উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। সেই অসাবধানতার বিষময় ফলে কোটি কোটি মানবের ধর্ম্মবন্ধন এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস উৎপাটিত হইলে সমাজে দুর্দ্দৈব ঘটিবে ইহার বিচিত্র কি?*

* "That the revolutionary movement while headed by Voltaire and his co-adjutors was directed against the Church and not against the State. Unfortunatly they at the very outset committed a serious error. In attacking clergies they lost their respect for religion." Buckle's *History of Civilisation.*

সমগ্র দেশে উচ্ছৃঙ্খলতাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে দৃষ্টি করিয়া ভূস্বামীরা ক্রমে ক্রমে দেশত্যাগী হইয়া য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা দেশে থাকিলেন, তাঁহারা বংশগত মর্য্যাদা ও বিশিষ্ট অধিকার পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বহু-সংখ্যক ধর্ম্মযাজকও স্ব স্ব বিশিষ্ট অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত ভূসম্পত্তি জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে সাম্যের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তি সংস্থাপনকল্পে জাতীয় সমিতি মানবাধিকারপ্রসঙ্গীয় ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন করিলেন—তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) মানব মাত্রেই তুল্য এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তুল্য অধিকার।

(২) সমগ্র জাতি রাজশক্তির আধার। সমগ্র জাতি হইতে (রাজ-নীতিক) সর্ব্বশক্তির উৎপত্তি।

(৩) অন্য কোন ব্যক্তির কোন অনিষ্ট না করিয়া যদৃচ্ছানুরূপে কার্য্য করার নাম স্বাধীনতা। যে কার্য্য হইতে সমাজের অনর্থ উৎপাদিত হয় ব্যবহার শাস্ত্র শুদ্ধ তাহাই নিবারণ করিতে পারে।

(৪) সর্ব্বসাধারণের প্রকাশিত ইচ্ছার নাম ব্যবহার শাস্ত্র বা আইন।

(৫) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অবস্থানুসারে রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য।

(৬) সভ্য নির্ব্বাচনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তুল্য অধিকার।

(৭) ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির তুল্য অধিকার; কিন্তু ফরাসী দেশের অধিবাসীরা প্রতিনিধিগণদ্বারা ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন করিবেন।

(৮) ব্যবহার শাস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তুল্যরূপে প্রযোজ্য।

(৯) যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

প্রাগুক্ত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত হইলেও, সকলগুলি তদ্রূপ নহে। মানব মাত্রেই সমান ইহা অর্ব্বাচীনের কথা। ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য্য। কোন ব্যক্তি সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস ও সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন এবং সুবর্ণ-

পাত্রে সুসংস্কৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পার্থিব সুখ সম্ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, কোন ব্যক্তি জরাজীর্ণ পর্ণকুটীরে অবস্থিতি এবং ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে শরীর পোষণ করিয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছে। কেহ বা জ্ঞানার্ণব মন্থন করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রসঙ্গীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জ্ঞানের অপূর্ব্ব রশ্মি বিস্তার করিতেছে, আবার কেহ বা হ্রস্বদীর্ঘবোধবিবর্জ্জিত "উত্তর দক্ষিণ"জ্ঞানবিরহিত মূর্খাদপি মূর্খ। কোন ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশীয় প্রথানুসারে প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, আবার কেহ বা নীচকুলোদ্ভব বলিয়া জনসমাজে অনাদৃত হইতেছে। কোন ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছেন; আবার কেহ বা সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হইয়া জনসমাজে তদুপযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সুতরাং সকল মানবই তুল্য এ কথাটি প্রকৃত নহে। তবে উন্নতিশীল জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে বংশগত পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গুণানুসারে ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সংগ্রহ।

বিবিধ।



বুদ্ধের জন্মস্থান।

—:—

কথিত আছে, বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক বুদ্ধের স্মৃতিপূত সকল তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ও প্রত্যেক স্থানে স্তূপনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। উপগুপ্ত তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। লুম্বিনী উদ্যানে স্তূপের অস্তিত্ব নাই; কিন্তু অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখনও কেহ কেহ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এই প্রাচীন স্তম্ভ দেখিতে যাইয়া থাকেন। অল্প দিন পূর্ব্বে কয়জন য়ুরোপীয় এই স্তম্ভ দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

পথে। গোরখপুর হইতে পথ রম্যদর্শন। পথে কয়েন্দা; তথায় গুরখা সৈন্য সংগ্রহের আড্ডা আছে। তাহার পর শালবন—শালবনে নীলগাঁই নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গোরখপুর হইতে যাইয়া নওগড়ে বিশ্রাম করিতে হয়। আবার প্রভাতে উঠিয়া যাত্রার আরম্ভ। ডাক বদলাইয়া বুদ্ধপুরে পৌঁছিতে হয়। পথ ঘনপল্লব তরুছায়াবৃত ও সুরক্ষিত। এই স্থান হইতে অদূরে নওগড়ের বাজার—বাজারে চাউলের যথেষ্ট আমদানী, মাড়োয়ারী মহাজনও যথেষ্ট। পথে একটি নদী আছে—নদীর উপর সুগঠিত সেতু। বুদ্ধপুরে চা-কর য়ুরোপীয়দিগের বাঙ্গলো আছে। সেগুলি অতি পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য। বুদ্ধপুর হইতে তুলা সাত মাইল পথ। রাস্তা কাঁচা; কিন্তু সুরক্ষিত —তিন ভাগে বিভক্ত, মধ্যভাগ উচ্চ, তাহা কেবল য়ুরোপীয়দিগের জন্য—দুই পার্শ্বে রাস্তায় ভারতবাসী যাত্রী ও যান চলে। তুলার সীমায় তেলার নদী। এই নদীর উপরও একটি সুগঠিত সেতু আছে। এইবার যানপরিবর্ত্তন করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিতে হয়। অদূরে ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত। তথা হইতে নেপাল রাজ্যের আরম্ভ। মধ্যে ৬০ ফিট জমী—কাহারও নহে। সীমান্তে কতকগুলি পিলপা গাঁথা আছে। এই স্তম্ভকে লাঠ্ঠা বলে—"লাঠ্ঠাপার" অর্থে নেপালের আরম্ভ।

তীর্থ। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ভগবানপুরে পৌঁছান যায়। পথে দ্রষ্টব্য বড় কিছু নাই। ভগবান পুরে কাছারী, মালখানা, জেলখানা ও থানা আছে। এই স্থানে কর্ম্মচারী বা সুবা আগন্তুকের ছাড়পত্রাদি পরীক্ষা করেন। আগন্তুকগণ এত কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া অশোক স্তম্ভ দেখিতে আসি-

ছেন, শুনিয়া সুবা বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। ভগবানপুর হইতে এক মাইল দূরে একটি অনুচ্চ পাহাড়। গিরিগাত্র ঘন বৃক্ষলতায় আবৃত। মোড় ফিরিলেই অশোক-স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভ দেখিবার জন্য কত চীনদেশীয়, তিব্বতীয়, জাপানী, শ্যামদেশীয় ও সিংহলী যাত্রী এই তীর্থে আসিয়াছে।

স্তম্ভাদি।

স্তম্ভটি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ। ইহার পরিধি প্রায় ৩৬ ইঞ্চ। পাদমূলে লিখিত আছে, বুদ্ধের জন্মস্থানে এই স্তম্ভ অশোকের আদেশে স্থাপিত। স্তম্ভের শিরদেশ ভগ্ন ও স্তম্ভটি ফাটিয়াছে—ইহা বজ্রপাতের ফল। যে অনুচ্চ গিরিতে স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বে উচ্চ পর্ব্বত ছিল; কালক্রমে তাহার উচ্চতার হ্রাস হইয়াছে। পর্ব্বতচূড়ায় একটি মন্দির, শ্যাম শোভার মধ্যে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রাঙ্গণে বেদীতে রক্তচিহ্ন—পশুবলির পরিচায়ক! এই মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলেরই নিকট সমাদৃত। মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। বেদীর উপর একটি ঘণ্টা; ঘণ্টাগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ। প্রাচীরগাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত ও লিপি উৎকীর্ণ।

মন্দির।

গর্ভগৃহ অন্ধকার। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়, প্রাচীর-গাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত। তন্মধ্যে মৎস্যের বাহুল্য বিস্ময়কর। আগন্তুকদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুরোহিত মধ্যস্থলের ক্ষোদিত ভাস্করকার্য্যের উপরিস্থিত আবরণ অপসৃত করিলে বুদ্ধের জন্মগ্রহণচিত্র দেখা গেল। জননীর কুক্ষীভেদ করিয়া বুদ্ধ বাহির হইতেছেন—একজন দাসী শিশুকে ধরিতেছে। মূর্ত্তিগুলি স্বাভাবিক আকারের ও সুগঠিত। কিন্তু পুরোহিত দেখিতে দেখিতে আবার চিত্রগুলি আবৃত করিয়া দিলেন। যে সকল শিল্পী এইরূপ মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিল, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কি কোন অবশেষই নাই?

সরোবর।

মন্দিরের পর দ্রষ্টব্য—অমৃত সরোবর। এই সরোবর বুদ্ধ-জননীর স্নানপুণ্যোদক। সরোবর স্বল্পায়তন—স্বচ্ছজলশালী—স্থির। সরসীবক্ষ তরঙ্গতাড়নে বিচলিত নহে—তাহাতে তীরতরুর প্রতিবিম্বও স্থির—অচঞ্চল।

যে ধর্ম্ম একদিন পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া কোটী কোটী মানবকে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর করিয়াছিল, সংসারীকে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল; যে ধর্ম্ম ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় শিল্প এসিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়াছিল—এই তীর্থ সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ বুদ্ধের জন্মভূমি। এখন এই লুম্বিনী উদ্যান পরিত্যক্ত—অযত্নবর্দ্ধিত লতাগুল্মে দুর্গম। কিন্তু এক দিন এই উদ্যান নৃপতির বিরাম স্থান ছিল—আর এই উদ্যান শাক্যসিংহের জন্মভূমি বলিয়া জগতের পুণ্যতীর্থ।

সে গেছে চলিয়া।

১

সে গেছে চলিয়া।
গেছে—না ফুরাতে বেলা অসমাপ্ত রাখি' খেলা
কোন্ নিরুদ্দেশ দেশে—কোন্ পথ দিয়া।
আছে সেই বসুন্ধরা ফুলফলশস্যভরা,
আছে সেই স্রোতস্বিনী, আছে সে বাতাস ;
আছে সেই কলগান বনের মর্ম্মর তান
সেই আলো সেই ছায়া—আছে সে আকাশ।
এ বিশ্বের কোন ঠাঁই কোন অপূর্ণতা নাই,
তবু যেন শূন্য সব,—শূন্য এই হিয়া।
সে গেছে চলিয়া।

২

সে গেছে চলিয়া।
ভুলে' গৃহে ফিরে যাই, আছে স্মৃতি—সেতো নাই,
অশ্রুর সাগর তাই উঠে উছলিয়া!
সে যে লতিকার সম ব্যর্থ এ জীবন মম
জড়ায়ে—ফুটায়েছিল মাধুরি বিমল ;
নির্ঝরের মত বহি' শত অনাদর সহি'
করেছিল এ হৃদয় সরস কোমল।
পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করি', দীপ তা'র
আমার কুটীরখানি ছিল উজলিয়া।
সে গেছে চলিয়া।

৩

সে গেছে চলিয়া।
জীবনের পর পারে অনন্তের কোন্ ধারে
কোথায় আশ্রয় তা'র—কে দিবে বলিয়া।
উষার হাসিতে আর মিশেনাকো হাসি তা'র
পাখীর সঙ্গীত সনে তা'র কণ্ঠস্বর।
ফুলদল ফুটে ঝরে, শোভে না তাহার করে,
মিশেনা ফুলের গন্ধে তাহার সৌরভ।
আর নাহি বাজে বীণা, ধরা যেন প্রাণহীনা,
যত শোভা—যত গান—সব হরি' নিয়া
সে গেছে চলিয়া!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।



যাত্রা।

Blocks by G. N. Mukherji, Pro. Mohila Press, Mohila Press, Calcutta.

রামটেক্।

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবার পূজার সময় রামটেক্ যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ত ছিলেনই, তাহার উপর ছিলেন, সোদরপ্রতিম—সদা হাস্যানন, সুধীশ ও সিদ্ধীশ; আর ছিলেন হাস্যরসের অবতার নেড়াদা। ফাউয়ের মধ্যে এক কাছাকোঁচা দেওয়া দাসী। তাহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে পাছে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর কোন কষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে যাত্রিশ্রেণিভুক্ত করা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সুধীশ কিছু গম্ভীরপ্রকৃতি, কিন্তু নির্ভীক্ ও স্পষ্টবক্তা; কথাগুলা ওজন করিয়া সব সময়ে ঠিকঠাক্ বলিতে পারে; তাহার উপর চরিত্রবলে সর্ব্বদা বলীয়ান্। আর কনিষ্ঠ সিদ্ধীশ বা খোকাবাবু বয়সে নিতান্ত কাঁচা হইলেও নামের সার্থকতা রাখিয়া রবারের বলের মত রাতদিন লাফাই-তেছে; তাহার অধরোষ্ঠে হাসি লাগিয়াই আছে। কোনও কাযে সে "না" বলে না। সে-ই আমার এই তীর্থযাত্রার প্রধান উদ্যোগী। মনে করিয়াছিলাম, নির্ব্বিবাদে ছুটীর বারটা দিন নাগপুরে বসিয়াই কাটাইয়া দিব; কিন্তু তাহার দৌরাত্ম্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সে আমাকে কেবলই তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে লাগিল; আমারও বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষীণ আশা তাহার অজস্র অনুরোধে মুকুলিত হইয়া উঠিল। বাড়ীর সকলেরই এ তীর্থদর্শন ঘটিয়াছে; হয় নাই কেবল আমার ও আমার স্ত্রীর। কাযেই প্রস্তাব উঠিবামাত্র আমাদের দুইজনের যাওয়া স্থির হইয়া গেল; তবে "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই" এই পুরাতন সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া জুটিলেন; কিন্তু নানারূপ অসুবিধায় কেহই শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না।

২৬এ অক্টোবর শনিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যাত্রা করা স্থির হইল। পৌনে সাতটায় গাড়ী ছাড়িবে; কাযেই শীতে হি হি করিতে করিতে সাড়ে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ না করিলে সে দিন যাওয়া সম্ভবপর হইত না। পূর্ব্বদিন হইতেই রসদের যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছিল। এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে হয় নাই; একা সিদ্ধীশ একশত; সে-ই

সমস্ত গুছাইয়া লইয়াছিল। কোথায় কাহার কাপড়, কোথায় কাহার ঘটি, কোথায় কাহার জামা,—এ সব একত্র করিয়া সে দুইটি বৃহদাকার পুঁটুলি বাঁধিল। শনিবার ভোর ৫ টায় উঠিবার কথা; কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্যে ৪ টার সময় সে আমার দরজায় ঘা মারিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া উঠিলাম, এবং সব ঠিক করিয়া লইলাম। ও দিকে গাড়ীর জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে ঘোড়ার সাজের কোন স্থান "টুটিয়া" যাওয়ায় কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িল। সহিস্ হিন্দু, সে বোধ হয় পূজার সময় তাহার প্রিয় বস্তুটিকে জীর্ণ সাজে লোকসমক্ষে আনিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। শেষে যখন কড়া হুকুম গেল তখন গত্যন্তর না দেখিয়া সে একেবারে বাঙ্গালার সম্মুখে গাড়ী আনিয়া হাজির করিল। তখন ৬টা বাজিয়া মিনিট দশ হইয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেসনে পৌঁছিয়া টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে; কিন্তু ষ্টেসনে পৌঁছিতেই আধ ঘণ্টা লাগিবে। যাহা হউক, রামজীর নাম করিয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া লইলাম। গাড়ী ছাড়িবার মিনিট চার থাকিতে আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাম্‌রায় ঢুকিলাম। তখন উত্তরের বাতাস প্রভাতী সূর্য্যকিরণে মন্দ লাগিতেছিল না। সহযাত্রী-দিগের মধ্যে মারহাট্টার সংখ্যাই অধিক, এবং একটি গুর্জ্জর পরিবারও সেই দলভুক্ত দেখিলাম। দুইজন গুর্জ্জর রমণী পার্শ্বের কাম্‌রায় বসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত অলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, তাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়া। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্ত্রী তাঁহাদের সহিত "দোস্তি বানাইয়া" লইলেন।

গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে কলিকাতার পথে ছুটিল; মাঝে এক বার ইতোয়ারী ষ্টেসনে হাঁফ্ ছাড়িয়া ইংরাজ সেনানিবাস কাম্‌টি সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কাম্‌টি সহরের মধ্য দিয়াই একটি পাকা রাস্তা বরাবর উত্তরে জব্বলপুরের দিকে গিয়াছে; মাঝে মান্‌সর হইতে একটি শাখাপথ রামটেকে গিয়া মিলিয়াছে। পূর্ব্বে এই পথ ধরিয়াই লোক এই দুর্গম তীর্থে আসিত। পথের দুই দিকেই নিবিড় জঙ্গল; সময় সময় দিবালোকেও "কোলের মানুষ" দেখা যায় না। স্থানে স্থানে বহু পুরাতন প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত মারহাট্টা অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, এ প্রশস্ত পথ ভোঁস্‌লা রাজাদিগের বিরাট কীর্ত্তি। রেলের পথে কাম্‌টি পার হইয়াই বিস্তৃত কান্‌হান্ নদীর

উপর যে সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে, তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যশিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেতুটি ছবির মত রেলপথের পার্শ্বে কান্হান্ নদীর উপর পড়িয়া আছে। জাফরীর মত উহার বৃতিগুলি সূর্য্যালোকে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার জীর্ণসংস্কার আরম্ভ হয় এবং চার বৎসর ধরিয়া ১২৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার সম্পূর্ণ হয়। ইংরাজ এই সেতুর সংস্কার করিয়াছেন মাত্র; রাজারাই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। ভারতে এরূপ সুদৃশ্য সেতু আর আছে কি না সন্দেহ। ইহার এক একটি প্রশস্ত খিলান দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সেতুর উপর দিয়া ক্রমাগত মানুষ ও গাড়ী নাগপুরের পথে যাতায়াত করিতেছে। আমরা দক্ষিণে এই সেতু রাখিয়া আরও কিছু দূর ডাকগাড়ীর রাস্তায় অগ্রসর হইলাম। পরে কান্হানে আসিয়া একটি শাখা রেলপথে গাড়ী রামটেকের দিকে ছুটিতে লাগিল। পথের দুই ধারেই অড়হরক্ষেত্র; মনে হইল, ক্ষেত্রের বুঝি সীমা নাই—শেষ নাই। স্থানে স্থানে কৃষকরা শস্য কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ হইল; আনন্দ ফসলের আতিশয্যে, আর দুঃখ—এমন দেশেও দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে! ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরায় কোন স্থানের লোককেই এত স্বল্পে পরিতুষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু এত অপর্য্যাপ্ত ফসল হইয়াও দৈববিড়ম্বনায় আমাদের "ডাইনে আন্তে বাঁয়ে কুলায় না।" ইহা কি কম আক্ষেপের কথা? যাহা হউক, পথে একবার ডুমরীখড়ে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ী রামটেকে যাইয়া পৌঁছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া বুঝিলাম, নাগপুর হইতে সাড়ে বার ক্রোশ আসিয়াছি। ক্রমে আমরা ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সহযাত্রী অধিক ছিল না; সর্ব্বসমেত ২০৷২৫টি হয় কি না সন্দেহ। বাহিরে কয়েকখানি গোশকট ছিল। এগুলি দেখিতে মন্দ নহে; জমী হইতে এক হাত ঊর্দ্ধে দুইখানি চাকার উপর ইহার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত; মঞ্চটি দৈর্ঘ্যে চারি হাত পরিমিত, আর প্রস্থে দেড় হাত। মাথায় কেবল দরমার আচ্ছাদন। কোন রকমে তিনটি লোক কষ্টে তাহার মধ্যে বসিতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া আমার স্ত্রীকে একখানি শকটে উঠাইয়া দিলাম; সঙ্গে তাঁহার দাসী রহিল, আর থাকিল সিদ্ধেশ। অবশিষ্ট আমরা তিন জনে

নানা বাগবিতণ্ডার পর স্থির করিলাম যে, শকটে ঝাঁকি খাইতে খাইতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, ষ্টেসন হইতে রামগিরি পাহাড়ের পাদদেশ দুই ক্রোশেরও কিছু অধিক হইবে। এতটা পথ রৌদ্রে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সুধীশ কিছু "একরোকা" লোক; সে আমাদের কথায় সম্মত হইল না। ইতোমধ্যেই বৈরাগ্যের অনেক চিহ্ন তাহাতে দেখা দিয়াছে। সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল; সমস্ত রাস্তা "আয় ভাই, আয় ভাই" করিয়া ডাকিয়া আমার গলা শুকাইয়া গেল; জলের জন্য আকুল হইলাম। পথিপার্শ্বে এক কূপ হইতে গ্রাম্য স্ত্রীলোকরা জল তুলিতেছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের নিকট জল ভিক্ষা করিলাম। তাহারাও সাদরে আতিথিসৎকার করিল। আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। পথে শ্রমাপনোদনের আশায় চালকের নানা সুরের গান শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা রামটেক্ সহরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। ১১২৯ বর্গ মাইলব্যাপী তহশীলের মধ্যে ইহাই প্রধান সহর।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটি মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছবির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার ১১ জন সদস্যই বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। আয়ের পরিমাণও বিশেষ আশাপ্রদ; মোটামুটি হিসাবে ১৯০১ সালের আয় ছিল ৮৪০০৲ টাকা, কিন্তু ছয় বৎসর পরে উহা ১৪৬০০৲ টাকা হইয়াছে; ইহার অধিকাংশ টাকাই octroi tax ও বাজার হইতে আদায় হইয়াছে। নগরে একটি হাঁসপাতালও আছে; শুনিলাম ইহার উন্নতিকল্পে স্থানীয় একটি ম্যাঙ্গানীস্ খনির স্বত্বাধিকারী যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। এ সব কীর্ত্তি লুপ্ত হইবার নহে; জরা মরণ যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিনই এই পুণ্যস্মৃতি মানুষের মনে জাগিয়া রহিবে। পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে ২।৩টি ইংরাজী, মারাঠী ও উর্দ্দু বিদ্যালয় দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা আসিয়া পড়িয়াছিল যে, আমরা ব্যতীত আর বুঝি কেহ স্ত্রীশিক্ষার বিপুল আয়োজনের পক্ষপাতী নহে। সে "জারী" এ পার্ব্বত্যদেশে নিমিষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল; স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই স্থানে যথেষ্ট আয়োজন দেখিলাম। বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীবর্গের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়াছে। বাঙ্গলায় থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষার কত আস্ফালনই না করিয়াছি, কিন্তু সে সমস্ত এখন অসার বলিয়া মনে হইল।

ক্রমে আমরা বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তথায় কেনাবেচা বেশ চলিতেছে দেখিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ডাউল,ঘৃত, কাঁকর মিশান চাউল ও তরীতরকারীর মধ্যে বেগুন ও বর্ব্বটি রাশি রাশি মিলিল। আমাদের আবশ্যকমত বেগুন, বর্ব্বটি ও কিছু আতা লইয়া আমরা আবার পথ চলিতে লাগিলাম। বাজারে নপাট্‌ বা ছাঁচি পানও যথেষ্ট দেখিলাম; এই পানের জন্যই রামটেক্‌ প্রসিদ্ধ। চতুর্দ্দিকে এই পান রপ্তানী হইয়া থাকে; পাতাগুলি বেশ মোলায়েম ও সুগন্ধযুক্ত। আমরাও আমাদের প্রিয়জনের জন্য একটি মোট পান লইলাম। স্থানীয় লোকের নিকট শুনা গেল যে, এই স্থানে আঙ্গুরের চাস আছে; কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই; দেখিলে বোধ হয় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিতাম না। এখন আমরা লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; বাড়িগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বোধ হয় দীপালী নিকট বলিয়া সকলগুলিতেই রং করা হইয়াছে: ঝক্‌ঝকে রাস্তায় অনেকগুলি "রেঙ্গী" এ গলি ও গলি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কিছু বুঝা গেল না। অদূরে রাস্তার বাম দিকে দুরারোহ পর্ব্বত রাখিয়া আমরা ক্রমশঃ লোকালয় হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম; শেষে দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। জনকোলাহল একেবারে থামিয়া গেল; মনে আশঙ্কা হইল, [illegible] হইতে পড়ি। তাহার পর দুই দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, মাঝে কেবল আঁকা বাঁকা রাস্তা। তথা হইতে কিছু দূর যাইয়া এক প্রকাণ্ড দরজা দেখা গেল; ইহাই আম্বালা পুষ্করিণীর দ্বার। প্রথমেই পুলীস প্রহরী আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইল। ইহার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না, বুঝিতে চেষ্টাও করিলাম না। আম্বালার কাছে কেবলই পাণ্ডাদিগের ঘর দেখা গেল। দোকান পসারের নামমাত্র নাই; এক পয়সার জিনিস কিনিবার দরকার হইলে এক ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া বাজারে যাইতে হইবে। মনে হইল, পাণ্ডাদের কি কোন অভাব নাই? ভাগ্যে আমরা বাজার হইতে রসদ যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা না হইলে সে দিনটা বোধ হয় অনশনেই কাটিত। দেখিলাম, পুষ্করিণীর পাহাড়ে মানুষের সহিত অসংখ্য বানর নির্ব্বিবাদে বসিয়া আছে। ক্রমশঃ উত্তরে আম্বালা রাখিয়া আমরা আমাদের নির্ণীত বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডামহারাজ আসিয়া আমাদিগের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কেবল আট আনা মুনাফায় যে এত হয় তাহা আমার ধারণা ছিল না।

বাসায় নেড়াদা ও সুধীশ খিচুড়ি রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিলেন; আমাদের সাহায্য তাঁহাদের আবশ্যক হইল না। আমি সস্ত্রীক, খোকাবাবু ও ঝি সমেত বাহির হইয়া পড়িলাম।

আম্বালা সরোবরে স্নান করিলে সকল পাপ বিধৌত হয় বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। কুষ্টরোগগ্রস্ত রাজপুত রাজা অম্বার নাম হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। জনশ্রুতি এই যে, পুরাকালে মৃগয়ায় তৃষ্ণাতুর হইয়া অম্বা এই স্থানে হস্তমুখপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন ও এই জল পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার কুষ্টরোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি এই সুদীর্ঘ সরোবর কাটাইয়া দেন। শুনিলাম, পাতাল হইতে নাকি ইহার সহিত ভোগবতী বা গঙ্গার যোগ আছে; সেই কারণে অনেকে এ তীর্থে আসিয়া মৃতের অস্থি জলগর্ভে নিক্ষেপ করেন। প্রেতাত্মার মুক্তির নিমিত্তই এ সমস্ত ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সরোবরে মাছ অজস্র; কিন্তু ধরিবার হুকুম নাই। আমরা স্নান করিতে নামিয়া গামছা ফেলিয়া রাশি রাশি মাছ তুলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই একজন মারহাট্টা ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে অপ্রস্তুত হইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিলাম। আম্বালার চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির ও সুদৃশ্য সোপানশ্রেণীতে সুশোভিত। তাহার উপর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। চারি দিকে পাহাড়, আর মধ্যে স্বচ্ছ সরোবর,—এ দৃশ্য বস্তুতঃই চিত্রশিল্পীর তুলিকায় প্রতিফলিত হইবার যোগ্য। জীবনে এ নৈসর্গিক চিত্র আর দেখিব কি না বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার স্মৃতি সত্য সত্যই আমার এক শ্লাঘার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বার পাহাড়ে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বাসা পশ্চাতে রাখিয়া সরোবরের কিছু উত্তরে যাইয়াই পাতরের বড় বড় ধাপ দেখা গেল। কত যুগ পূর্ব্বে যে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। কয়েকটা ধাপ বিচ্ছিন্ন হইয়া এ দিকে ও দিকে পড়িয়া আছে। এই পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম রামগিরি; বাল্যকালে 'মেঘদূতে' ইহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম; সে শ্লোক এখনও কাণে বাজিতেছে;

"কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

মন্দিরের পাণ্ডাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, ইহার আরও দুইটি নাম আছে—একটি সিন্দুরগিরি, অপরটি তপোগিরি। বিষ্ণু নরসিংহ-মূর্ত্তিতে এই স্থানে হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া পাহাড়ের রক্ত-বর্ণ হইয়াছে—তাই গিরির নাম সিন্দুরগিরি। আর সুতীক্ষের আশ্রম এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ইহার অপর নাম তপোগিরি হইয়াছে। লক্ষণের মন্দিরের কোন প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত বৃত্তান্ত হইতে এই তথ্য জানিতে পারিয়াছি। চতুর্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইলেও এখনও মন্দিরের মহারাজের সাহায্যে উহা পড়া যায়। অনেক অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পুরাতত্ত্ববিদ্ কেহ সঙ্গে থাকিলে হয় ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেন। পর্ব্বতশৃঙ্গটি ৫০০ ফিট উচ্চ; আর সাড়ে সাত শত সোপান লঙ্ঘন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। শুনিয়াই আমার "আক্কেল গুড়ুম্" হইয়া গেল। আমার স্ত্রী কিন্তু নাছোড়বন্দা; সকাল হইতে তিনি জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করেন নাই, আর এখন প্রায় একটা বাজিতে যায়। আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলাম; বলিলাম, আহারাদির পর পাহাড়ের উপর উঠিব। কিন্তু কে আমার কথা শুনে? তিনি দ্রুত সোপানাবলী লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। দেবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পুরুষ যতই কেন উদাসীন হউন না, হিন্দুরমণী কখনও "পিছপাও" নহেন। আমি খানিকটা ধাপের উপর বসিয়া রহিলাম, শেষে যখন তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন তখন আবার উঠিয়া সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ধাপগুলি সোজাসুজি উঠে নাই, বাঁকিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রশস্ত চাতাল; কিয়দ্দূরে গিয়াই খোকাবাবু ও আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম। তাঁহারা ধাপের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় দুই শত ধাপ অতিক্রম করিবার পর এক প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই জনশূন্য স্থানে এক সন্ন্যাসী একটি বিগ্রহ লইয়া বসিয়া আছেন, দেখিলাম। এই প্রথম তোরণের নাম—এক্রমজীউকি দরজা। শুনিলাম, উজ্জয়িনীর রাজা এক্রম সিংহ ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। আবার উঠিতে লাগিলাম; পর্ব্বতশৃঙ্গের কি অপূর্ব্ব শোভা! আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহার চতুর্দ্দিকে বিশাল পর্ব্বতরাজি, আর অরণ্যানীর ত কথাই নাই। পুস্তকে যাহা পড়িয়াছিলাম, "woods over woods in gay theatric pride," আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। খোকাবাবু ও আমি এক সুরে চীৎকার করিলাম, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল।

কেবলই আতাগাছ, ডালগুলি ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। খোকা বাবু পাকা আতাগুলি ক্রমাগত ছিঁড়িতে লাগিলেন, আর আমি আবশ্যকমত দুই চারটি বেল পাড়িয়া লইলাম। তীর্থে আসিয়াছি, একটা কিছু করা চাহি; খেদ থাকিবে কেন? বেল পাড়িয়াই তাহা মিটাইলাম। আবার কিছু দূরে গিয়াই পথের দক্ষিণে একটি আশ্রমসংলগ্ন জলাশয় দেখা গেল। প্রবাদ এই যে, হিরণ্যকশিপু বধের পর বিষ্ণু এত বেগে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, গদাঘাতে পর্ব্বতগাত্রে গর্ত্ত হইয়া এই জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তীরে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃশ্য স্তম্ভপরিবেষ্টিত একটি ধর্ম্মশালাও রহিয়াছে, দেখিলাম। দুই একটি পথশ্রান্ত যাত্রী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছে। এই স্থানে আমাদের সহযাত্রী সেই গুর্জ্জর রমণী দুইটির সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল। আমার স্ত্রী তাঁহাদের পাইয়া বেশ দুই দণ্ড গল্প জুড়িয়া দিলেন। অনন্যমনা হইয়া আমরা পার্শ্বে জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে খোকাবাবু "উঠুন" বলিয়া এক হাঁক্ দেওয়ায় আমি সচকিতে দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

আহ্বান।

"অসীমে সসীমটুকু করিবারে দান,
ত্যজিয়া পাষাণমূল
আয় ছুটি' নদীকূল;"
গরজি গম্ভীরে সিন্ধু করিছে আহ্বান।
"আমার প্রশান্ত অঙ্কে জুড়াইতে প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবগণ!
ক্ষান্ত দিয়ে, আয়, রণ;"
মরণ নীরবে স্নেহে করিছে আহ্বান।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।



চন্দ্রমণ্ডল।

সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থিত। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস ও নেপচুন এই আটটি গ্রহ এই বিশাল অগ্নিময় কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া শূন্যমার্গে নিয়ত ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলি স্বয়ং এক একটি গোলাকার পৃথিবীর ন্যায়। তাহার মধ্যে কতকগুলি আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বড়। সূর্য্যের আয়তন প্রায় ১৩,০০,০০০ গুণি পৃথিবীর আয়তনের সমান। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

গ্রহসকল যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তেমনই উপগ্রহসকল গ্রহগুলিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। বৃহস্পতির ৫টি, শনির ৮টি, উরেনসের ৪টি ও নেপচুনের ১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সৌরজগতের সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহাদির আবর্ত্তনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আছে। গ্রহসকল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করে। উপগ্রহসকলেরও আবর্ত্তন সেইরূপ। কেবল উরেনস ও নেপচুনের উপগ্রহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে আবর্ত্তন করে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, প্রায় ৪৯টি চন্দ্র একত্র করিলে একটি পৃথিবীর সঙ্গে সমান হইতে পারে। তথাপি অন্যান্য তারকা হইতে চন্দ্র বৃহত্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার কারণ, অন্যান্য তারকার অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২,১৬০ মাইল। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২,৩৮,৭৯৩ মাইল।

সহজ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই যে, চন্দ্রমণ্ডলের কতকটা অংশ অন্ধকারময় ও অবশিষ্ট অংশ উজ্জ্বল। এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশসকল বিশুষ্ক সমুদ্রতল এবং উজ্জ্বল স্থানগুলি গিরিশ্রেণী—ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাৎবেগে ভগ্ন এবং সহস্রধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান।

বস্তুতঃ কালে চন্দ্রমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীর ন্যায় আংশিকভাবে জল ও স্থলে বিভক্ত ছিল। সেই স্থলদেশ সুদীর্ঘ এবং উন্নত গিরিশ্রেণী, শষ্পাচ্ছাদিত অধিত্যকা ও অতি বৃহৎ আগ্নেয়পর্ব্বতে পূর্ণ ছিল। চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরির সহিত পৃথিবীর কোন আগ্নেয়গিরির তুলনা হয় না। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিসকল চন্দ্রস্থ আগ্নেয়গিরির হিসাবে অতীব ক্ষুদ্র।

সম্প্রতি ঐ সকল অগ্নিপর্ব্বত নির্ব্বাপিত হইয়াছে; সমুদ্রসকল লোপ পাইয়াছে; উপত্যকা তাহার উর্ব্বরতা হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; এমন কি এই ক্ষুদ্র উপগ্রহের চতুঃপার্শ্বস্থিত বায়ু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে। চন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে কখনও মেঘ দৃষ্ট হয় না। তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অতীব সূক্ষ্ম এক বায়বীয় আবরণ বিদ্যমান; সুতরাং, যে সুদৃশ্য উপগ্রহ এককালে নানারূপ জীব এবং উদ্ভিদের জন্মস্থান ছিল, তাহা বর্ত্তমানে জনশূন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্রের এইরূপ মৃতাবস্থা প্রাপ্তির যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কাণ্ট ও লাপ্লাস অনুমান করিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত জগৎ একটা উত্তপ্ত বাষ্পময় নিহারিকারূপে বর্ত্তমান ছিল। ক্রমশঃ তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের সৃষ্টি হইল। তাহার পর কি এক মহাশক্তির প্রভাবে সেই বিশাল নিহারিকা একটি গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এক আবর্ত্তগতিরও সৃষ্টি হইল। এই পিণ্ড ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার স্ফীত নিরক্ষদেশ হইতে কতিপয় অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যমার্গে প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তন করিতে করিতে সেই কেন্দ্রস্থ বিশাল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া এক একটি গ্রহে পরিণত হইল। এই গ্রহগুলি তাহাদের স্ফীত নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রা[illegible]রণবলে কতিপয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া উপগ্রহের সৃষ্টি করিল।

সুতরাং এই উপগ্রহ সকল, বিশেষতঃ চন্দ্র, আদিতে উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ডরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল। পরে যখন উহার পৃষ্ঠদেশ জীব ও উদ্ভিদের বাসের পক্ষে যথেষ্ট শীতল হইল, তখন উহার চতুর্দ্দিকস্থ জলীয় বাষ্প তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতির সৃষ্টি করিল। অধিত্যকা প্রদেশে ক্রমে উদ্ভিদরাজি জন্মগ্রহণ করিল।

অপরাপর গ্রহাদির অপেক্ষা চন্দ্র আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সুতরাং, ইহার তাপের পরিমাণও কম ছিল। সেই জন্য বহুকাল ধরিয়া তাপবিকিরণের পর এই উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এত শীতল হইল যে, জল ও বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পরাশি কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সমস্ত উদ্ভিদ এবং জীবশ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং আগ্নেয়গিরি সকল নির্ব্বাপিত হইল।

গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও আপনার অক্ষের উপর আবর্ত্তন করে। সমস্ত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের প্রায় ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, ১১½ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের অক্ষের উপর এক আবর্ত্তনেও প্রায় এইরূপ সময় লাগিয়া থাকে।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র ও সূর্য্যের কক্ষ এক সমতলে অবস্থিত নহে। চন্দ্রের কক্ষ সূর্য্যের কক্ষের সমতলের উপর ঈষৎ হেলিয়া রহিয়াছে এবং দুইটি বিন্দুতে সূর্য্যকক্ষের সমতলকে ছেদন করিতেছে। এই বিন্দুদ্বয়কে ইংরাজীতে node বলে।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, আবার চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সুতরাং, চন্দ্রও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের গতি মোটামুটি ভাবে সহজেই বুঝান যাইতে পারে। যদি একখানি চক্রের নেমিতে একটি পেন্সিল লাগাইয়া দিয়া চক্রখানি একটি দেওয়ালের গাত্রসন্নিকটে ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়ালের গাত্রে মালার আকারে কতকগুলি বৃত্তের চিত্র অঙ্কিত হইবে। সূর্য্যের হিসাবে চন্দ্রের গতিও ঠিক সেইরূপ।

মোটামুটি প্রায় ২৭ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই ২৭ দিনে এক চান্দ্রমাস ধরা যায়। এই সময়ের মধ্যে আমরা চন্দ্রের আকার নানারূপ দেখিয়া থাকি। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্র প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একই সময়ে এবং একই স্থানে উদিত অথবা অস্তমিত হয় না।

বহুকাল পূর্ব্বে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই। আমরা চন্দ্রের যে আলোক অনুভব করিয়া থাকি, উহা চন্দ্রের নিজের আলোক নহে। সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্বীয় গতি অনুসারে চন্দ্রের যে অংশ যেরূপে সূর্য্যের দিকে থাকে, সেই অংশ সেইরূপে আলোকিত হয়। সুতরাং, আমরা প্রতিদিনই চন্দ্রের এক এক নূতন আকার দর্শন করিয়া থাকি। চন্দ্র যখন সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করে, তখন উহার ঠিক যে অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে সেই অংশ সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গোলাকার দেখিয়া থাকি। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থায় অমাবস্যা হয়। ঐ তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়; অর্থাৎ

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। এই অবস্থায় চন্দ্রের অন্ধকারময় অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে বলিয়া অমাবস্যা তিথিতে আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। শুক্লপক্ষে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে থাকে এবং উহার আয়তনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে ঠিক উহার বিপরীত হয় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের নিকটে আসিতে থাকে এবং উহার আয়তনেরও ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী এই তিনই যখন এক সরলরেখাবর্ত্তী হয়, তখন গ্রহণ হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, অর্থাৎ পৃথিবী যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় এবং আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া থাকি। পরন্তু যদি অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী এক সরলরেখাবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ যদি ঐ সময়ে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যালোকের গতিরোধ করে। সেই কারণে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক ছোট এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষাও ছোট। সুতরাং এত ছোট চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের সমস্ত আলোকের গতিরোধ সম্ভবপর নহে। সেই জন্য সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ পৃথিবীর স্থান বিশেষে দেখা যায়; একই সময়ে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে উহা দেখা যায় না।

এইরূপে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সৌরজগতের ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। তাপ-বিকিরণ হেতু জগৎ হইতে তাপের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং প্রথমে ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে বৃহত্তম গ্রহ ও উপগ্রহাদি এবং এমন কি সূর্য্য পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যাইবে। এই উত্তাপনাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবকুলেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। উত্তাপের আধিক্য যেমন জীবের জীবনের প্রতিকূল, উত্তাপের অভাবও ঠিক সেইরূপ।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

সবজী

বেগুন।

পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই ২।১ বিঘা জমী আছে। সেইটুকু কেহ বা খুব কম হারে প্রজাবিলি করিয়া থাকেন—কাহারও বা তাহার উপর ২।১টা এরূপ গাছ আছে যাহা হয় ত কখন ফল দিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই—কেহ বা সেইটুকু ফেলিয়াই রাখিয়াছেন। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, "চাকরীলোলুপ" বাঙ্গালীকে চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া সংসারপ্রতিপালনার্থ একটা কিছু করিতেই হইবে।

সওদাগরী বা অন্য কোন আফিসে ১৫।২০ টাকা বেতনে প্রত্যহ প্রভুর তাড়নায় সন্তুষ্ট থাকিয়া "দেশের" "জায়গা জমীতে" অমনোযোগী থাকিলে আর চলিবে না। এমন অনেককে দেখা যায় যে, নিজের গ্রামের কথা এমন কি নিজের গ্রামের নাম পর্য্যন্ত বলিতে লজ্জা বোধ করেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ২।১ বিঘা জমী আমাদের গৃহস্থের সংসারে কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আলু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সবজী; ইহার পরেই বেগুন—আমাদের কথাতেই বলে "ঝোলে বেগুন, অম্বলে বেগুন।" ইহা হইতেই বেগুনের প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝা যায়।

এই প্রবন্ধে বেগুনের চাষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

দুই প্রকারের বেগুন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে—প্রথম বড় বেগুন ও দ্বিতীয় কুলি বেগুন—বড় বেগুনের মধ্যে "এলোকেশী" ও "মুক্তাকেশী" বেগুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের দেশে ইহাদেরই আবাদ অধিক হইয়া থাকে। কুলি বেগুন বড় বেগুন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মৃত্তিকা—উচ্চ উদ্ভিজ্জপদার্থঘটিত জমীই বেগুনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জমী এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য যেন তাহার উপর জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে। কারণ দাঁড়ান জল (Stagnant water) বেগুন গাছের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী। অনেকে নদীর তীরের জমী এই আবাদের জন্য পছন্দ করিয়া থাকেন—এবং শুনা গিয়াছে, এইরূপ জমীতে ফসলও যথেষ্ট হয়। কাদা জমীতে (Clay soil) বেগুন ছোট হইয়া থাকে;

কিন্তু সাধারণতঃ অধিক মিষ্ট হয়। বেগুনের জমীতে সার দিবার ব্যবস্থা অনেকে দিয়া থাকেন বটে; কিন্তু পরলোকগত কৃষিতত্ত্ববিদ্ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শিবপুর সরকারী কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে গোবর ও সোরার সারপ্রযুক্ত জমী অপেক্ষা বিনা সারযুক্ত জমীতে ফসল অধিক হইয়াছে। অন্য অন্য কৃষিতত্ত্ববিদ্‌রা এই কথার সমর্থন করেন না। বীজ রোপণের ও বীজ-জমী (seed-bed) হইতে চারা গাছ তুলিয়া পুতিবার সময় চুন (gypsum) ও ছাই দেওয়া খুব ভাল।

গোবর খৈল প্রভৃতি যবক্ষারজানঘটিত সার (Nitrogenous manure) বেগুনের জমীতে প্রয়োগ করিলে ফুল এবং ফলের পরিবর্ত্তে পাতাই অধিক উৎপাদিত হয়—সেইজন্য এই সারের সহিত অন্য ধাতুঘটিত সার মিশ্রিত করা উচিত।

আমরা যখন ২।১ বিঘায় চাষ করিতে বসিয়াছি তখন সারসম্বন্ধে এত কথা না বলিলেও চলিত। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গোবর ও ছাই যাহা আমাদের অনায়াসলব্ধ তাহা দেওয়াই উত্তম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বেগুনের বীজ গ্রহণ ও তাহার রোপণ প্রণালী।—গাছের প্রথমকার বড় ফলগুলি হইতেই বীজনির্ব্বাচন করা নিয়ম। বেগুন বেশ বড় হইলে ও পাকিলে তাহা গাছ হইতে লইয়া মাঝামাঝি কাটিতে হয়। এইরূপ অনেকগুলিকে এক সঙ্গে ২।৩ দিন ধরিয়া পচাইলে বীজ অনায়াসেই ছাড়িয়া আসিবে। সেগুলিকে পরে জলে পরিষ্কার করিয়া শুকান আবশ্যক।

বীজ জমী (Seed-bed)—যে স্থানে সূর্য্যতাপ প্রখর নহে সেইরূপ স্থানে করা উচিত। কারণ, বীজ রোপণের পর সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং এমনও দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যতাপে চারা গাছ আদৌ বাহির হয় নাই।

চারা গাছ (Seedling)—প্রস্তুত করিবার জন্য জমীর পাট বিশেষ ভাবে করা দরকার। আল্‌গা ও নরম মাটী না হইলে গাছ ভাল হয় না। আমাদের দেশী কোদালে ২।১ বিঘা জমী প্রস্তুত করা চলে; তবে যাঁহারা বেশী জমীতে বেগুন দিতে চাহেন তাঁহাদের লাঙ্গল ব্যবহার করাই উচিত। কারণ, লাঙ্গলে খরচ কম হয়। বীজ-জমীতে সার দিলে চারা গাছগুলি বেশ তেজী ও বলিষ্ঠ হয়। বীজ-জমীতে পচা গোবর, ছাই ও সামান্য পরিমাণে চুণ দেওয়াই বিধি। পৌষ, মাঘ মাস হইতে জমী প্রস্তুত আরম্ভ

করা উচিত এবং চৈত্র, বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে যদি এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায় তাহা হইলে আর জলসেচন করিয়া জমী ভিজাইয়া লইতে হয় না। বীজ বপন করিয়া সেগুলি মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করাই প্রথা। বপনের পর যদি মাটী ভিজা না থাকে কিম্বা বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে প্রতি সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে জল সেচন করা বিশেষ দরকার —কারণ, মাটী ভিজা রাখাই প্রয়োজন। বীজ-জমী যদি ঠাণ্ডা জায়গায় না হয় তাহা হইলে বপনের পর তালপাতা কিম্বা কলাপাতা দিয়া জমী আবৃত রাখা উচিৎ। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ নিবারণের ইহাই সহজ উপায়। ৩।৪ দিনের মধ্যেই চারা গাছ বাহির হয়। যদি বেশী বৃষ্টি হয় তাহা হইলে জমী হইতে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা প্রয়োজন। চারা গাছ বাহির হইলে অনেক পোকা আসিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে—ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছাই ও চুণের গুঁড়া গাছের ও জমীর উপর ছড়াইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

চারাগাছ উঠাইয়া অপর জমীতে রোপণ—(Transplantation)— যে জমীতে চারা গাছ লাগাইতে হইবে সেই জমীও পৌষ, মাঘ মাস হইতে প্রস্তুত না করিলে জমী বেগুনের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। এই স্থানে পলীহার করা নিয়ম। ছোট জমী হইলে কোদালী দিয়া প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু বড় হইলে লাঙ্গল দিতে হইবে—এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সময় হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত যদি মাসে এক একবার করিয়া জমীতে চাষ দিয়া রাখা যায় তাহা হইলে জমীর অবস্থা অতি সুন্দর, অর্থাৎ উর্ব্বর এবং আগাছা ও কীটশূন্য হইয়া থাকে। এইরূপ মাসিক একবার চাষ দিয়া জমী আল্গা ভাবে ফেলিয়া রাখিলে জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। বায়ু হইতে উর্ব্বরতাদায়ক কয়েকটি সামগ্রী আল্গা মাটীর মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিয়া ঐ মাটীকে আরও উর্ব্বর করিয়া দেয়। জমী মাসে একবার ওলট পালট করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়; বিশেষতঃ এরূপ করাতে আগাছা ও কীটের পুত্তলি (Pupa) সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। বৈশাখের মাঝামাঝি জমী চোস্ত করিয়া চারাগাছ পুঁতিবার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। জমীর চারিদিকে নালা রাখা আবশ্যক; কারণ, জমীতে জল দাঁড়াইলে এই নালাগুলির সাহায্যে অতিরিক্ত জল বাহির করিতে হইবে। ৩ ফিট্ অন্তর জুলি করিয়া এই জুলির মধ্যে ৩ ফিট্

অন্তর চারাগাছ লাগান দরকার—কারণ, বেশী ঘন করিয়া পুতিলে পরে অনিষ্ট হইতে পারে। গাছ লাগানর পর প্রত্যেক গাছের তলায় গুঁড়া খৈল, ছাই ও চুণ দিলে গাছগুলি শীঘ্র লাগিয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোবর ও খৈলে ফলের পরিবর্ত্তে পাতাই অধিক উৎপন্ন হয়। যাঁহারা জমীতে সার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে প্রতি বিঘায় ২ মণ খৈল, ১ মণ ছাই, ১২ সের চুণ গুঁড়া করিয়া ছিটাইয়া দিলে জমীতে যথেষ্ট সার দেওয়া হইল। এই সার প্রয়োগ করিলে ফসল খুবই ভাল হয়। ১০।১৫ দিন পরে গাছের মধ্যে জমীটুকুকে কোদালী দিয়া সমতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং আরও ১০।১৫ দিন পরে কোদালী দিয়া জুলিগুলিকে উঁচু করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

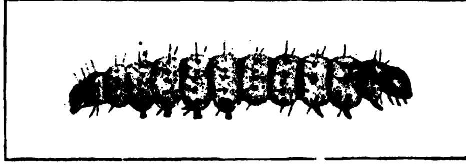
চারাগাছ লাগাইবার পর জলসেচন বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যদি বৃষ্টি হয়, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে জলসেচন না করিলেও চলে। জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব বৃষ্টির পর যদি গাছ রোপণ করা হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জলসেচন না করিলে চলিতে পারে। কিন্তু যদি চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে রোপণ করা হয় তাহা হইলে মাসে একবার করিয়া জলসেচন আবশ্যক। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার জল-সেচনই যথেষ্ট। শ্রাবণ মাসে গাছ ফল দিতে আরম্ভ করিবে এবং শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে গাছের তলায় একবার মাটী দিলে গাছ বেশ শক্ত হইয়া উঠিবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেগুন গাছ রোপণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা শীতকালের ফসল বলিয়া ধার্য্য হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে চারাগাছ প্রস্তুত হয় এবং মাঘ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল ফলিতে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে গাছ লাগাইয়া সারা বৎসর বেগুন পাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্ত আশ্বিন ও বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। আবার কখন কখন ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিয়া বৈশাখ মাসে চারাগাছ তুলিয়া রোপণ করা যায়। এই গাছগুলি ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফল দিয়া থাকে। যেসকল গাছ প্রথমে অর্থাৎ ফাল্গুনের প্রারম্ভে ফল দেয় নাই, সেগুলিকে ছাঁটিয়া তাহাদের তলায় সার প্রয়োগ ও মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।* কুলি

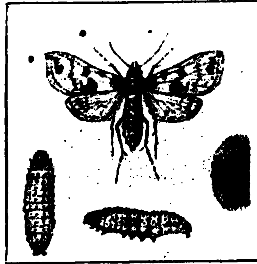
* Vide Mr. Sen's Report on Agriculture in the Burdwan District.

বেগুনের পোকা।



প্রথম চিত্র (তিনগুণ বৰ্দ্ধিত আকারে)।

বেগুনের পোকা।



দ্বিতীয় চিত্র।

Mohila Press, Cal.

বেগুনের বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপন করিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে চারা গাছ লাগাইতে হয় এবং তাহারা ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ফল দেয়।

বেগুন গাছ অনেকরূপ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়—এবং ইহাতে প্রায়ই ধসা (fungus) ধরিয়া থাকে। "তুলসীমারা" বলিয়া একরূপ রোগ ইহাকে আক্রমণ করে। যে গাছগুলিতে ধসা ধরে সেগুলিকে উপড়াইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। একরূপ জীবাণু হইতেই এই রোগের উৎপত্তি এবং দাঁড়ান জলে এই জীবাণু বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য বেগুনের জমিতে জল রাখা নিষিদ্ধ।

বেগুনের পোকা :—বেগুন গাছ প্রায়ই শুকাইয়া যাইতে ও বেগুন কাণা হইতে দেখা যায়। দুই প্রকার পোকার দ্বারা গাছ ও ফলের এই অনিষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতীয় পোকার কীড়া (caterpillar) ফল ও গাছের ডগা উভয়ই নষ্ট করে; তবে ফলের ক্ষতিই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। এই জাতীয় স্ত্রী প্রজাপতি ফল কিম্বা ডগার উপরে ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিবার পর কীড়াগুলি ছিদ্র করিয়া ফল ও ডগার ভিতরে প্রবেশ করে ও শাঁস খাইয়া ফেলে। প্রথম চিত্রে এই জাতীয় কীড়া দেখান হইয়াছে।

অপর জাতীয় পোকার কীড়া কেবল মাত্র গাছই নষ্ট করে। ইহার স্ত্রী প্রজাপতি গাছের ডাঁটার উপর ডিম পাড়িয়া যায়—ডিম ফুটিলে কীড়ারা ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং গাছের শাঁস খাইয়া গাছটিকে একেবারে মারিয়া ফেলে। দ্বিতীয় চিত্রে এই জাতীয় প্রজাপতি, কীড়া ও গুটী দেখান হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের চাষীরা শুষ্ক ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া কিম্বা কাণা বেগুনগুলি বাছিয়া ক্ষেত্রের ধারে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে পোকাগুলি না মরিয়া আবার প্রজাপতি হইতে পায় ও পুনরায় ডিম পাড়িয়া অনেক গাছ ও ফল নষ্ট করে। শুষ্ক ডগা ও কাণা বেগুনগুলি সময় মত তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। প্রথম হইতে এইরূপ করিলে তত অনিষ্ট হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া বেগুন গাছের আরও দুই একটি অনিষ্টকর পোকা আছে। তবে তাহারা এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

এক বিঘায় বেগুন আবাদ করিলে কত খরচ পড়ে ও তাহা হইতে কত

আয় হইতে পারে নিয়ে তাহা দেখান যাইতেছে। তালিকাটি মোটামুটি ধরা হইয়াছে—সুতরাং ইহা হইতে কিছু বেশী বা কিছু কম ব্যয় হইতে পারে—তবে ইহা হইতে পাঠকগণ আয় ব্যয়ের ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

বিঘা প্রতি আয় ও ব্যয়।

লাঙ্গল, চৌকী প্রভৃতির সাহায্যে জমী প্রস্তুত করিবার খরচ ...	২৲
জমীতে জুলি প্রস্তুত করিবার খরচ	১৲
জলসেচনের জন্ত নালী নির্ম্মাণের খরচ	॥০
চারাগাছ তুলিয়া পুতিবার খরচ	১॥০
সারের ব্যয়	৪॥০
গাছের তলায় মাটী দিবার খরচ	২৲
ঘাষ উঠাইবার খরচ	১৲
জমী উস্কানর ব্যয়	১৲
জলসেচনের ব্যয়	৩৲
ফল তুলিবার খরচ	৩৲

বাঙ্গালায় পারিশ্রমিকের হিসাব ধরিলে ব্যয় ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক হওয়া সম্ভব। মোটামুটি ২০৲ টাকা খরচ করিলে এক বিঘা জমী হইতে যথেষ্ট ফসল আশা করা যাইতে পারে।

এখন লাভের: পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখা যাউক। ৩ ফিট্ অন্তর গাছ রোপণ করিলে এক বিঘায় প্রায় ১,৬৫০টি গাছ পুতিতে পারা যায়। এই ১৬৫০টি গাছের মধ্যে আমরা ৩৫০টি গাছ ছাড়িয়া হিসাব করিব—কারণ, সকল গাছই যে ফল দিবে এবং সকল গাছই যে বাঁচিবে তাহার সম্ভাবনা নাই—কতকগুলিকে পোকা কিম্বা অপর জন্তু নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৩০০ গাছ হইতে আমরা ফসল পাইতে পারি।

দেখা গিয়াছে, গড়ে প্রত্যেক গাছ ৩ সের করিয়া ফল দিয়াছে। তাহা হইলে ১৩০০ গাছ হইতে আমরা ৩৯০০ সের অর্থাৎ ৯৭ মণ ২০ সের বেগুন পাইব—মোটামুটী ৯০ মণ পাইবার আশা সকলেই করিয়া থাকেন। আড়াই পয়সা করিয়া বেগুনের সের ধরিলে অর্থাৎ ১।/০ করিয়া মণ ধরিলে আমরা ৯০ মণ হইতে ১৪০॥/০ পাইতে পারি—ইহা হইতেও যদি আমরা

১০৲ টাকা ছাড়িয়া দিই—তাহা হইলে ১৩০৲ টাকা আসিবে। দেখা যাইতেছে, ২০৲ টাকা খরচ করিয়া আমরা ১৩০৲ টাকা পাইব এবং আমাদের খরচ বাদে ১১০৲ টাকা লাভ থাকিবে। গৃহস্থের সংসারে ১১০৲ টাকা আয় কম নহে।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে, অনেকের কিচেন্ গার্ডেন (গৃহস্থালী তরকারীর ক্ষেত্র) আছে—এবং ইহা হইতে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ লাভ করিয়া থাকেন। মহিলাগণই ইহার তত্ত্বাবধান করেন এবং অনেকে স্বহস্তে সেই বাগানে কায করিয়া "তরিতরকারী"গুলি বেশ তাজা পাইয়া থাকেন। সেগুলি যে বাজারের জিনিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থেরই এইরূপ বাগান করা উচিত এবং মহিলাদিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যেন তাঁহারা বাগান দেখিতে পারেন। আজকাল সহরে ও মফঃস্বলে অনেক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যদি এইরূপ বিদ্যালয়সংলগ্ন একটি করিয়া ছোট বাগান থাকে এবং তাহাতে আমাদের ছোট মেয়েরা কি করিয়া আলু, বেগুন, কপি, শাক প্রভৃতি রোপণ করিতে হয় তাহা শিখিতে পারে তাহা হইলে আমাদের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সে শিক্ষাপ্রণালীও আলোচ্য।*

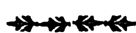
গভর্ণমেণ্ট কৃষিকলেজ, সাবোর, বিহার। } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* সাবোর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক ও আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, এম, এস, এ (Cornell) আমার এই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত দেখিয়া বহুস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। লেখক।

চিত্রগুলি Imperial Entomologist মহাশয়ের অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে। সম্পাদক।

অদৃষ্ট-চক্র।



তৃতীয় খণ্ড

বেদন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাণ।

যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ধরণীধর পাইয়াছিলেন। অমূল্যচরণ ইচ্ছা করিয়া—তাঁহার হৃদয়ক্ষতে বেদনার ক্ষার নিক্ষেপ করিবার জন্য কৌশলে সে সংবাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই কার্য্যের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই; উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। যে ধরণীধর পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিতে হৃদয় পূর্ণ রাখিয়া দীর্ঘ জীবন পুণ্যপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন; যিনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যেমন যত্নে অগ্নি রক্ষা করেন—তেমনই যত্নে প্রেমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন;—যিনি বিজনে পত্নীর ধ্যানে—নিশীথে নয়নজলে প্রেম পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে পুত্রের এই ব্যবহার যে কিরূপ ক্লেশের কারণ হইবে অমূল্যচরণের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। যতীশচন্দ্রও তাহা অনুমান করিতে পারিত না।

অমূল্যচরণ কৌশলে তাঁহাকে এ সংবাদ পাঠাইয়াছিল; আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ সংবাদ ধরণীধরের পক্ষে বজ্রাঘাতের মত হইল।

ধরণীধর যে দারুণ চেষ্টায় হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন, সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বিদেশে চাকরী করিবার সময় একজন ভৃত্য দীর্ঘ বিংশবর্ষকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সে তাঁহার সহিত শ্বাপদসঙ্কুল কাননে, প্লাবনভীষণ নদীকূলে, জনহীন গিরি-গাত্রে বিপদেও শঙ্কা বোধ করে নাই। কত অন্ধকার নিশায় সে প্রভুর শিবিরসম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া জাগিয়াছে! কতবার সে প্রভুর পীড়ায় তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে! সে ছায়ার মত প্রভুর অনুসরণ করিত। ধরণীধর যখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাহাকে তাহার বাস-গ্রামে কিছু জমী কিনিবার উপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। প্রভুকে

পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে সে কাঁদিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, যেন এত দিনে তাহার আর কোন কার্য্য নাই। সে প্রভুর সহিত যাইতে চাহিয়াছিল। ধরণীধর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত তাঁহাকে কক্ষ্যচ্যুত—লক্ষ্যহীন তারকার দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। সে অবস্থায় তিনি আপনার অনিশ্চিত অদৃষ্টের সহিত আর কাহাকেও জড়াইতে চাহেন নাই। কিন্তু বারাণসীতে আসিয়া যখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, যখন তিনি আবার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন প্রথমেই সেই পুরাতন ভৃত্য হরদয়ালের কথা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবার কারণও ছিল; সে মধ্যে মধ্যে প্রভুকে পত্র লিখিত এবং প্রতি পত্রেই তাঁহার নিকট আসিবার অনুমতি চাহিত। ধরণীধর যখন তাহাকে লিখিলেন, সে তাঁহার নিকট আসিতে পারে, তখন সে যেন স্বর্গ হস্তে পাইল। সে বারাণসীতে আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ প্রভুর সংসারের সকল ভার লইল—সে ভার বহনেই সে অভ্যস্ত। ধরণীধরও আবার তাহাকে পাইয়া অনেক বিরক্তিকর ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তিনি প্রভাতে ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া—অপরাহ্নে কোন ধর্ম্মশিক্ষকের নিকট ধর্ম্মালোচনার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন, তাঁহার আবশ্যক-সকল দ্রব্যই যথাস্থানে ন্যস্ত।

একদিন হরদয়াল তাঁহাকে দুইখানি পত্র আনিয়া দিল। সে দুইখানিতে যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ছিল। পত্র দুইখানি পাঠ করিতে করিতে ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। পত্রপাঠ শেষ হইল। তিনি কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহতের মত বসিয়া রহিলেন—যেন অতর্কিত দারুণ আঘাতে তাঁহার বেদনানুভবশক্তিও লুপ্ত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ধরণীধর আবার পত্র দুইখানি পাঠ করিলেন। পত্রে যে কথা লিখিত ছিল তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

ধরণীধর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বক্ষে বিষম বেদনা অনুভূত হইল;—সে বেদনা—যাতনা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হরদয়াল দাঁড়াইয়া ছিল। ধরণীধর তাহাকে শয্যারচনা করিতে বলিলেন। সে ক্ষিপ্রহস্তে প্রভুর শয্যারচনা করিয়া দিল। ধরণীধর ধীরে ধীরে যাইয়া সেই শয্যায় শয়ন করিল।

সে দিন ধরণীধর আর শয্যাত্যাগ করিলেন না, কেবল একবার

উঠিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া আবার শয়ন করিলেন। তিনি জলস্পর্শ করিলেন না।

হরদয়াল প্রভুর এই ভাবান্তরের কারণ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু বুঝিল—পত্রে কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে। সে রাত্রিতে সে ঘুমাইল না; দেখিল, সমস্ত রাত্রি ধরণীধরের নয়নপল্লব নিদ্রায় মুদ্রিত হইল না। প্রভাতে ধরণীধর উঠিতে চেষ্টা করিলেন। মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে বক্ষে কেমন বেদনা বোধ হইতে লাগিল। হরদয়াল প্রভুর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল।

অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সংসারই আর মানুষের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকিতে পারে না; যখন জীবনের পর মৃত্যুর কথা মানুষের মনে পড়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে পরপারের অনিশ্চিত কথা স্বতঃই হৃদয়ে সমুদিত হয়। তখন নাস্তিকের মনে আস্তিক্য বুদ্ধির সঞ্চার হয়—মানুষ মনে কেমন একটা আকুলতা অনুভব করে। এদিকে যৌবনাপগমে শারীরিক শক্তি যত ক্ষুণ্ণ হয়, সেই অনিশ্চিতের সন্ধানকামনা ততই প্রবল হইয়া উঠে। সে সন্ধানকামনার তৃপ্তির জন্য যে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন, তাহার সুবিধা বারাণসীর মত আর কোথায় আছে? আবার বারাণসী স্বাস্থ্যকর স্থান। তাই অনেক বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অর্থোপার্জ্জনচেষ্টায় কাটাইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। এই বারাণসীবাস মহাযাত্রার—মহামুক্তির সোপান। ইহাতে মানুষ সংসারী হইয়াও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শিখে—সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত হইতে দূরে আসিয়া ক্রমে সংসার ত্যাগ করিতে শিখে। এই সকল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আবার স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে দল গঠিত করেন; কয়েকজন একত্র ভ্রমণ করেন—ভ্রমণান্তে এক স্থানে উপবেশন করেন—একই মঠে বা আশ্রমে ধর্ম্মালোচনা করেন। এইরূপে যাঁহাদিগের সহিত ধরণীধরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রমাপ্রসাদ ও ভবদেব। রমাপ্রসাদ কোন জিলায় উকীল সরকার ও ভবদেব সবজজ ছিলেন। উভয়েই অবসর লইয়া আসিয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ও পরদিন প্রভাতে ধরণীধরের সাক্ষাৎ না পাইয়া প্রভাতে ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিবার সময় উভয়ে ধরণীধরের

গৃহে আসিলেন। তাঁহারা ধরণীধরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—এক দিনে মানুষের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়! কিন্তু কেন এরূপ হইল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ধরণীধরের নিকট বসিয়া চিকিৎসক ডাকাইতে পরামর্শ দিয়া উভয়ে উঠিলেন। হরদয়াল তাঁহাদের সহিত নিয়ে আসিল এবং তাঁহাদিগকে জানাইল, পূর্ব্বদিন দুইখানি পত্র ধরণীধরের হস্তগত হইয়াছে—আর সেই পত্র পাঠ করিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। শুনিয়া, রমাপ্রসাদ ও ভবদেব এ উহার মুখে চাহিলেন। ধরণীধর স্বীয় স্বভাবগুণে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ধরণীধরের জীবনের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন না—তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে বুঝিতে পারিতেন না। তাহার পর হরদয়াল সাশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে বলিল, "আপনারা বাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।" অপরাহ্নে পুনরায় আসিবেন বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন—ধরণীধরের কথার আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অপরাহ্নে তাঁহারা আবার আসিলেন। সে দিনও ধরণীধর জলস্পর্শ করেন নাই। তাঁহারা জিদ করিয়া তাঁহাকে সামান্য দুগ্ধপান করাইলেন। কিন্তু ধরণীধর শয্যায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—বিষম কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। ধরণীধরের অবস্থা দেখিয়া উভয়েই বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র হরদয়াল বিনিদ্র প্রভুর সেবা করিল।

পরদিন প্রভাতে রমাপ্রসাদ ও ভবদেব একজন চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া রোগীর প্রকৃত অবস্থা বলিবার জন্য ভবদেবকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় ধরণীধর বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার অবস্থা আমি অবগত আছি। আমাকে গোপন করিবেন না। আমার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আর ব্যবস্থা? এখন ব্যবস্থা—'নারায়ণ ব্রহ্ম'।"

ডাক্তার অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না। আমি পথ্যের ও শুশ্রূষার কথা বলিতে যাইতেছিলাম। অসুখ সামান্য। কেবল, হৃদয় কিছু দুর্ব্বল।"

ধরণীধর হাসিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার চলিয়া যাইলে ধরণীধর বন্ধুদ্বয়কে বলিলেন, "জীবনে আপনাদিগকে কষ্ট দিয়াছি, মরিয়াও একটু দিব। আমার একটু অনুরোধ

আছে। আমার উইল, রেজেষ্টারী করিয়া সরকারী আফিসে জমা আছে; আমার হাতবাক্সে তাহার নকল আছে। আপনারা আমার মৃত্যু সংবাদ যথাস্থানে দিবেন। আমার দাহের ও শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি—আর যাহা থাকিবে তাহা হরদয়ালকে দিয়া দিবেন। আর আমার মৃত্যু সংবাদ—"

ধরণীধর মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দুই দিনে সারিয়া উঠিবেন। এত ভয় পাইতেছেন কেন?"

ধরণীধর মৃদু হাসি হাসিলেন; বলিলেন, "জীবনে কখনও মৃত্যুকে ভয় করি নাই; আর শেষে কাশীতে আসিয়া মৃত্যুভয়! এখন মৃত্যুই ত মুক্তি।"

তাহার পর ধরণীধর বলিলেন, "আমার মৃত্যুসংবাদ আমার বৈবাহিককেও দিবেন—তাঁহার ঠিকানা আমার বাক্সে আছে।"

তিনি বন্ধুদ্বয়কে বাক্সের চাবী দিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহারা লইলেন না। তখন তিনি সে চাবী হরদয়ালকে রাখিতে দিলেন। ভবদেব তাহাতে অনেক আপত্তি করিলেন ও ধরণীধরকে অনেক আশ্বাস দিলেন। তাহার পর অপরাহ্নেই আসিবেন বলিয়া বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

বন্ধুদ্বয়ের গমনের পরই ধরণীধর হরদয়ালকে বলিলেন, "তুই স্নান আহার করিয়া আয়।"

হরদয়াল অতি অল্পক্ষণমধ্যেই স্নানাহার সারিয়া প্রভুর নিকটে আসিল। ধরণীধর বলিলেন, "দয়াল, দুই দিন ঘরের বাহির হই নাই। বারান্দায় একটা মাদুর বিছাইয়া দে।"

ধরণীধরের বক্ষে যাতনা বর্দ্ধিত হইতেছিল।

হরদয়াল বারান্দা ঝাঁট দিয়া তথায় একখানি মাদুর বিছাইয়া তদুপরি একটি বালিশ দিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল। ধরণীধর ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া অতি কষ্টে কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিলেন। বারান্দায় একটি টবে হরদয়াল একটি তুলসীগাছ রোপণ করিয়াছিল। ধরণীধর শয়ন কালে দেখিলেন, শিয়রে তুলসীতরু। তিনি হাসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "দয়াল, শেষ সময় বৈষ্ণবের বড় কায করিলি।" হরদয়াল প্রভুর কথার অর্থ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ।

ধরণীধর শয়ন করিলেন। হরদয়াল প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিল।

মুদ্রিতনেত্রে ধরণীধর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ধরণীধরের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল—বক্ষে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর যাতনাকুঞ্চিত মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল—তাঁহার গতপ্রাণ দেহ শয্যায় পতিত হইল। ধরণীধরের সকল বেদনার শেষ হইল।

যে জননীকে তিনি জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন সেই জননীর শুশ্রূষায় বঞ্চিত—যে পুত্রের জন্য তিনি দীর্ঘ জীবন শ্রম করিয়াছিলেন সেই পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত—ধরণীধর বিশ্বেশ্বরের পুণ্যভূমিতে আশাহত জীবনের সকল বেদনা হইতে মুক্তি পাইলেন। মণিকর্ণিকার মহা শ্মশানে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

সরোজা শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ পাইল। সে যখন স্বামীর পুনরায় বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল, তখন সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ক্রমে সে সেই দুর্দ্দশার স্বরূপ বুঝিতেছিল। এই সংবাদে তাহার সে উপলব্ধির সহায়তা হইল। সে বুঝিল, নারীজীবনে যে দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সে সেই দুর্ভাগ্য ভোগ করিবে। তবুও যত দিন শ্বশুর ছিলেন, তত দিন শ্বশুরগৃহে তাহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল—অধিকার ছিল, এখন সে স্থান গেল—সে অধিকার শেষ হইল! সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের স্নেহসিক্ত ব্যবহার মনে পড়িল; মনে পড়িল, তিনি পুত্রের ব্যবহারে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে যখন গৃহ হইতে দূরে বিদেশে এই মৃত্যুর সন্ধানে গিয়াছিলেন তখনও তিনি তাহার কথা ভুলেন নাই। তিনি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া তবে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সে বিরজাকে বলিল, "দিদি, আমার কপালেই তাঁহার মৃত্যু হইল।" সে শ্বশুরের জন্য অনেক কাঁদিল।

যতীশচন্দ্রের কলিকাতার ঠিকানা ধরণীধরের বাক্সে ছিল না। ভবদেব ও রমাপ্রসাদ শানগরের ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। পিয়ন ধরণী-ধরের জননীকে পত্র দিয়া গেল। তিনি অপরাহ্নে গ্রামের ছেলেরা যখন গ্রামের নিকটস্থ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতে ছিল, তখন তাহাদের

একজনকে ডাকিয়া পত্রখানি দিলেন; জানিলেন, পত্র কাশী হইতে আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে পত্র খুলিতে বলিলেন—বুঝি ধরণীধরের রাগ পড়িয়াছে। আহা! পড়িবারই কথা। যতীশের উপর সে কি রাগ করিয়া থাকিতে পারে? তিনি যতক্ষণ এইরূপ ভাবিতে-ছিলেন বালক ততক্ষণ খাম খুলিয়া পত্র পড়িতেছিল। সে তাঁহাকে পত্র পড়িয়া শুনাইল। বৃদ্ধার আর্ত্তনাদে প্রতিবেশিনীরা আসিলেন; সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে সচেষ্ট হইলেন। বালক ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গ্রামে এ কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। গ্রামের "ঠাকুরদাদা" হরিনাথ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া পত্রখানি—কলিকাতায় যতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

যতীশচন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইল। এই সংবাদ তাহার পক্ষে অতর্কিত আঘাতের মত অনুভূত হইল। সে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছে—করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছিল। সে মনে করিয়াছিল, সে পিতার সহিত সকল সম্বন্ধ কাটাইয়াছে। কিন্তু আজ যখন শোকের প্রবল বাত্যা তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত অভিমানের ও অবিমৃষ্যকারিতার মেঘ উড়াইয়া দিল, তখন তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে যে দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছিল তাহাও কেবল তাঁহারই ভরসায়। আজ তাহার সমস্ত হৃদয় কেমন একটা অব্যক্ত—অজ্ঞেয় বেদনায় একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা ভাবিতে লাগিল।

আজ যতীশচন্দ্রের মনে হইল, সে যে আশ্রয়ের আশায় এত দিন যাহা ইচ্ছা করিয়াছে ও করিতে পারিয়াছে সহসা সে সেই আশ্রয়চ্যুত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শানগরের ভবনে তাহার স্নেহশীলা পিতামহীর কথা তাহার মনে হইল। তিনি কেবল তাহারই জন্য পুত্রের সহিতও যাইতে সম্মতা হয়েন নাই। আজ তাঁহার কি দুর্দ্দশা! তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই শানগরে চলিয়া যাইবে।

সে দিন মধ্যাহ্নের পরই অমূল্যচরণ তাহার গৃহে আসিল। তখন যতীশ-চন্দ্র শানগরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। অমূল্যচরণ সকল কথা শুনিল—কপট বিলাপে যতীশচন্দ্রের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল। তাহার পর তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। সে বুঝাইল, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে কাশী যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ,

ধরণীধরের কোন নির্দ্দেশ থাকিলে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আবার তিনি সম্পত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহাও কাশীতে না যাইলে জানা যাইবে না।

শোকের আবেগে এ কথাটা এতক্ষণ যতীশচন্দ্রের মনে হয় নাই। সে স্বীয় কর্ম্মদোষে যে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছে—এইবার সে তাহা হইতে মুক্তি পাইবে।

সে সেই দিনই কাশীযাত্রা করিল। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল। অমূল্যচরণ মনে মনে বড় আনন্দিত, এইবার ধরণীধরের অর্থ যতীশ পাইবে। যতীশ তাহার হস্তগত।

পরদিন যতীশচন্দ্র কাশীতে পৌঁছিল ও খোঁজ করিয়া ভবদেবের বাসায় উপস্থিত হইল। ভবদেব তাহার পরিচয় পাইয়া সাদরে তাহাকে লইয়া তাহার হবিষ্যান্নের ও অমূল্যচরণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে সে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিল। জীবনে সে এ অভিজ্ঞতা কখনও লাভ করে নাই।

এ দিকে ভবদেব রমাপ্রসাদকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুগৃহে আসিলেন। উভয়ে যতীশচন্দ্রকে লইয়া ধরণীধর যে গৃহে বাস করিতেন সেই গৃহে চলিলেন। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল।

ধরণীধরের মৃত্যুর পর ভবদেব ও রমাপ্রসাদ তাঁহার শয়ন-কক্ষ চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁহারা তাঁহার দ্রব্যাদির কোন ব্যাবস্থাই করেন নাই। হরদয়াল প্রভুর সম্পতি আগলাইয়া সেই গৃহে বাস করিতেছিল। সে দ্বারেই বসিয়া ছিল। নগ্নপদ—বিশদবাস যতীশচন্দ্রকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর রমাপ্রসাদ ও ভবদেব যতীশচন্দ্রকে সকল কথা বলিলেন। উইলের কথা শুনিয়া অমূল্যচরণের কেমন চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল। ভবদেব হরদয়ালের নিকট হইতে চাবি লইয়া হাতবাক্স খুলিলেন। ধরণীধরের উইল উপরেই ছিল। রমাপ্রসাদ সেই উইল পাঠ করিতে লাগিলেন। উইলে যতীশচন্দ্রে নামোল্লেখও নাই! ধরণীধর লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর ভরণপোষণের আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থে তিনি কোম্পানীর কাগজ করিয়াছিলেন। সে অর্থে পরিমাণ যতীশচন্দ্রের অনুমানাতিরিক্ত। সেই অর্থ তিনি স্বগ্রামের উন্নতিকর

অনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি বিদ্যালয় ও মাতৃদেবীর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইবে। সমস্ত অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইবে; সরকার হইতে তাঁহার উইলের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করা হইবে। কাগজগুলি ব্যাঙ্কে জমা ছিল।

অমূল্যচরণ আর চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিল না জিজ্ঞাসা করিল—"পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া কেহ এরূপ উইল করিলে সে উইল কি টিঁকে?"

ভবদেব বলিলেন, "উইলের নির্দ্দেশ বিস্ময়কর বটে; কিন্তু উইল অসিদ্ধ বলিবার কোন উপায় ত দেখিতেছি না। সমস্ত অর্থই ত দেখিতেছি, ধরণীধরের স্বোপার্জ্জিত। এ অর্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল।"

যতীশ কোন কথা বলিল না। কিন্তু অমূল্যচরণ বলিল, "বাঙ্গালীর উইল—রথী মহারথীর উইলও ত দেখি শেষ টিঁকে না।"

ভবদেব হাসিয়া বলিলেন, "তাহা সত্য। আমরাও অনেক উইল নাড়াচাড়া করিয়াছি; কিন্তু এ উইল নাকচ করিবার কারণ ত দেখি না। ইহাতে যে একেবারেই কোনরূপ জটিলতা নাই—সবই সোজা। কি বল, দাদা?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "ইহা ত একরূপ দানপত্র"।

যতীশচন্দ্র ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে অবলম্বন ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—আজ সে সেই অবলম্বনচ্যুত। এইবার তাহাকে সত্য সত্য স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে হইবে। এতদিন সে সংসার-সংগ্রামের নামে ছেলেখেলা করিয়াছে; এইবার সে সত্য সত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহার হৃদয় শঙ্কাকুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় সে বিচলিত। ভবদেব যখন বলিলেন, "শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত আর প্রায় দুই শত টাকা রহিয়াছে। এ টাকা ধরণীবাবু ভৃত্য হরদয়ালকে দিতে বলিয়াছেন। দিব কি?" তখন যতীশচন্দ্র কেবল মস্তক-সঞ্চালনে সম্মতি জানাইল।

সেই অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় হরদয়ালের মনে হইল যেন সে শূন্য হৃদয়ে শূন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

ধরণীধরের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া যতীশচন্দ্রও সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া চলিল। সে যদি আপনার দুর্ভাবনায় আপনি অভিভূত না থাকিত,

তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিত, অমূল্য চরণের ব্যবহারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অমূল্যচরণ তাহার জন্য যেরূপ ব্যস্ততা দেখাইত এখন তাহার ব্যবহারে সে ভাবের অভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ধরণীধরের উইলের নির্দ্দেশ শুনিয়া এবং সেই উইল সম্বন্ধে রমাপ্রসাদের ও ভবদেবের মত জানিয়া অমূল্যচরণ বুঝিয়াছিল, আর যতীশচন্দ্র হইতে কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। বরং এতদিন সে যে তাহারই আশায় অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করে নাই সে জন্য সে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনি লজ্জিত ও যতীশচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইতেছিল।

কিন্তু যতীশচন্দ্র কপটবন্ধুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল না; সে কেবল ভাবিতেছিল। সে ভাবনার অন্ত নাই। সে এখন কি করিবে? এতদিন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র উপার্জ্জন করিতে পারে নাই—ঋণে ও পিতামহীর সাহায্যে সংসার চলিয়াছে। এমন—তাহার অবস্থা জানিলে কে তাহাকে ঋণ দিবে? পূর্ব্বের ঋণ শোধ করিবার ও সংসার চালাইবার উপায় কি? সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

ক্রমে ট্রেন কলিকাতায় পৌছিল। যতীশ গৃহে উপস্থিত হইলেই—অমূল্যচরণ বিদায় লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। যতীশচন্দ্র সেই দিনই শানগর যাত্রা করিল।

মানব-প্রহেলিকা।

(৪)

চৈতন্য ও দেহ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জীব-প্রহেলিকার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগের জড় বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত আত্মার নাস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধ্যাত্ম ব্যাপার জড়বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত। জড়বিজ্ঞান কেবল এইটুকু-মাত্র দেখিতে পায় যে, জড়কে অবলম্বন করিয়াই আত্মার শক্তি স্ফূরিত হইয়া থাকে। কারণ, দেহ ভিন্ন জীব নাই। জীব যতই ক্ষুদ্র, অনুবীক্ষণেরও অগোচর হউক কেন, উহার একটা দেহ আছে। সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া উহার চৈতন্য বিকাশ পাইতেছে। দেহ নষ্ট বা বিকৃত হইলে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। দেহ জড়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জড়-বাদীরা বলেন, যখন জড়ের অবস্থাবিশেষের সহিত চৈতন্যের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তখন চৈতন্য জড়েরই শক্তিবিশেষ। চৈতন্য-বাদীরা বলেন, চৈতন্য আত্মারই শক্তি; কেন না আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে আত্মার আস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কেন না এই জড়বিজ্ঞানপ্রধান যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে প্রকার প্রমাণ চাহেন, আমি সে প্রকার প্রমাণদ্বারা উহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করি নাই। আমি যে প্রমাণদ্বারা উহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সেইরূপ অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জড়বিজ্ঞানকেও অনেক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। নতুবা বিজ্ঞান এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। ইথার, আলোকতরঙ্গ, পরমাণুর (atom) মৌলিক উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মত (theory) এখনও অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যক্ষবাদমূলক, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বিষয়ীভূত তথ্যসম্মত জড়বিজ্ঞানকেই যখন আলোক, ইথার, তড়িৎ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক hypothesis বা অনুমান স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন অতীন্দ্রিয় ব্যাপারসম্পর্কে এরূপ অনুমান নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট কখনই অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

আত্মা একটি স্বতন্ত্র শক্তি (energy *per se*) বা সত্তা, ইহা স্বীকার

করিলে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি তাহা বুঝা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। দেহকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ চৈতন্যের কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। চৈতন্য আত্মারই শক্তি। আত্মা না থাকিলে চৈতন্য থাকে না। কিন্তু চৈতন্য না থাকিলে যে আত্মা নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। চৈতন্য যখন আত্মশক্তির বাহ্য স্ফুরণ, তখন কোন কারণে সেই বাহ্যস্ফুরণ স্তব্ধ বা রুদ্ধ হইলেই চৈতন্য লুপ্ত হইবে,—যাহাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য স্ফুরিত হইতেছিল, তাহা বিকৃত হইলেই চৈতন্যের বাহ্য প্রকাশ বন্ধ হইবে। আমার সম্মুখে যে আলোকটি জ্বলিতেছে উহার কাচাধারের মধ্যে দীপশিখা জ্বলিতেছে বলিয়াই উহার মধ্য দিয়া আলোক বাহির হইতেছে। দীপশিখা না থাকিলে ঐ আলোক প্রকাশ পাইত না। কিন্তু আলোক-প্রকাশ রুদ্ধ বা স্তব্ধ হইলেই যে মধ্যের দীপশিখাটি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। চিমনীতে অত্যন্ত কালি পড়িলে ভিতরের দীপশিখাটি সত্তেও আলোকনির্গমণ রুদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ বাহ্যতঃ চৈতন্যের লোপ দেখিয়াই অন্তরস্থ আত্মার অভাব অনুমান করা সকল ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে।

কিন্তু সাধারণতঃ চৈতন্যই দেহমধ্যে আত্মার অস্তিত্ব সূচিত করে। চৈতন্যের অত্যন্তাভাবই জীবের মৃত্যু। মৃত্যুতে চৈতন্য একেবারে লুপ্ত হয়, আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ জানিতে হইলে দুইটি পন্থা আছে। একটি পন্থা জড়বিজ্ঞান-সম্মত, আর একটি অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্মত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত নহে। সুতরাং জড়বিজ্ঞান জড়ের দিক হইতে জীবনী শক্তি বুঝাইবার চেষ্টা পায়। সচেতন জীবমাত্রই ক্রিয়াশীল। ক্রিয়া করিতে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি কোথা হইতে আইসে? জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, এঞ্জিন যে ভাবে শক্তি-সংক্রমণ করে জীবদেহও ঠিক সেই ভাবেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকে। এঞ্জিনের যেমন কয়লা ইন্ধন, জীবদেহের তেমনই খাদ্যই ইন্ধন। খাদ্যদ্রব্য দেহমধ্যে গৃহীত হইলে উহা উদরে পরিপাক হইতে আরব্ধ হয়। এই পরিপাকক্রিয়ার ফলে দেহমধ্যে অক্সাইড জন্মে। এই অক্সাইড উৎপত্তিক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হইয়া দেহকে সচল ও জীবকে ক্রিয়াশীল করে। অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যই রূপান্তরিত হইয়া জীবের শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অন্নই জীবনী শক্তি।

এঞ্জিনের সহিত জীবদেহের এই সাদৃশ্য কল্পনা সমীচীন নহে। খাদ্য-দ্রব্য হইতে মানবের শক্তি উপচিত হয়, এ বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে ক্ষয় পাইতেছে। কেরিংটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভুক্ত দ্রব্য হইতে জীবের বলাধান হয় না।* সম্পূর্ণ বিভিন্ন উৎস হইতে জীবনীশক্তি ও বল উদ্ভূত হইয়া থাকে। খাদ্য পরিপাকের সহিত দৈহিক শক্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান যুগে পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উপবাসে লোক দুর্ব্বল হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ব্বল রোগী এক মাস দেড়মাস উপবাসের পর সবল হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে রোগী দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হইত না, সে কয়েক দিন উপবাসের পর চারি পাঁচ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।† রোগ বিশেষ ও ক্ষেত্র বিশেষে উপবাসই যে উপকারী ইহা চিকিৎসকগণ চির-কালই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমরা নিজেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, জল পানমাত্র করিয়া উপবাস করিলে প্রথম তিন চারি দিন অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তাহার পর কষ্ট বোধ হয় না, বা অধিক পরিশ্রম না করিলে শরীর দুর্ব্বল হয় না। ইহাতে মনে হয় যে, খাদ্য ভিন্ন অন্য কোন উৎস হইতে জীবনীশক্তি ও দৈহিকশক্তি উচ্ছ্বাসিত হয়। খাদ্য জীবনী শক্তির উৎপাদক নহে, অংশতঃ দৈহিক বলের উৎপাদক, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। খাদ্য যদি জীবনীশক্তিরও দৈহিক বলের কেবলমাত্র উৎপাদক হইত, তাহা হইলে উপবাস করিয়া লোক অধিক দিন বাঁচিত না। সুতরাং কয়লা যে ভাবে এঞ্জিনের শক্তি উৎপন্ন করে, খাদ্য ঠিক সেই ভাবে জীবনী শক্তি ও দৈহিক শক্তি উৎপন্ন করে, এ উক্তি সত্য নহে।

সকলেই অবগত আছেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। ক্লান্তি সেই ক্ষয়ের সূচনা করে। ক্লান্ত লোক নিদ্রা চাহে,—নিদ্রার দ্বারা ক্লান্তি অপগত ও ক্ষয় উপচিত হয়। মানুষ আহার না করিয়া

* 'Vitality, Fasting and Nutrition by Hereward Carrington.

† "If the daily food supplied the strength of the body and its vital energy, it should weaken when this food is withdrawn, but the facts are that in all diseased conditions at any rate—that is not the case and that patients who enter upon a fast so weak and debilitated that they cannot walk down stairs, are strong enough to be walking at its conclusion and after having fasted forty or fifty days."

Death Appendix B.

কিছু দিন থাকিতে পারে,—নিদ্রা না যাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির নিদ্রা হয় না সে ভূরি ভোজন করিলেও দুর্ব্বল হয়। দেহ আপনা আপনি আপনার ক্ষয় পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, সেই ক্ষয় পূর্ণ করিবার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। সজীব জীবদেহের স্বশক্তি বলে ক্ষয়ের পূরণ করিবার শক্তি আছে—এঞ্জিনের তাহা নাই। নিদ্রাকালে দেহীর দেহক্ষয় পুষ্ট হইয়া থাকে, এঞ্জিনের তাহা হয় না। সুতরাং শরীর-বিজ্ঞান-বিৎগণ দৈহিক বলের সহিত এঞ্জিনের শক্তির যে তুলনা করিয়া থাকেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এ সম্বন্ধে মার্কিণে ও য়ুরোপে আবার নূতন করিয়া বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

নিদ্রাকালে দৈহিক ক্ষয়ের উপচয় হয়। যে শক্তিবলে ঐ শক্তির উপচয় হয়, তাহা দেহের শক্তি নহে, দেহীর শক্তি,—কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে দেহ আত্মার যন্ত্র। এই দেহ-যন্ত্র সাহায্যে জীবাত্মা জগতে তাহার শক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকে। আত্মা আপনার শক্তিবলে দেহ গঠিত করিয়া লয়; এই দেহ যদি বিকৃত হয়, অর্থাৎ জীবাত্মার শক্তিপ্রকাশের অযোগ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জীবাত্মাকে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। এই দেহপরিত্যাগের নাম মৃত্যু। দেহান্তর গ্রহণের নাম পুনর্জ্জন্ম। অধুনাতন পুনর্জ্জন্মবাদী য়ুরোপীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এই সত্য স্বীকার করিতেছেন,—কিন্তু ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা তাঁহাদের উক্তি আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ জীবদেহ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। যে জৈব উপাদানদ্বারা উহা গঠিত, রাসায়নিক উপাদান-সংযোগে তাহা প্রস্তুত করা যায় না। জীবদেহে অবিশ্রান্ত ক্ষয় (combustion) পাচন (fermentation) ও পুনর্গঠন (reconstruction) চলিতেছে। ইহার অনেকগুলি ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা মন্দিরে প্রদর্শিত হইতে পারে সত্য,—কিন্তু সমস্ত দৈহিক ব্যাপারটি যে ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে উহার সকল তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা কঠিন। অ্যামিবার ন্যায় ক্ষুদ্র এককোষ জীবের দেহমধ্যে যে প্রহেলিকা নিহিত রহিয়াছে,—তাহা বিংশ শতাব্দীর দাম্ভিক বৈজ্ঞানিকের নিকট ও

একটা বিরাট রহস্যরূপে বর্ত্তমান। আবার কোন কোন জীবের দেহে জটিলতার লেশমাত্র নাই,—অথচ তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, এককোষ জীবগুলি (protozoa) অমর। কিন্তু তাহাদের সেই অণুতুল্য দেহের কার্য্য প্রণালী এখনও মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত রহিয়াছে। সমুদ্রজলে জেলীফিস্ বা মেডিউসা নামে এক প্রকার জীব দৃষ্ট হয়। ঐ জীব অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লিবৎ আবরণে আবদ্ধ সাগর-জল মাত্র। দুইসের আড়াইসের ওজনের জেলীফিস্ ভূমিতে তুলিয়া রাখিলে যখন উহার জলীয় পদার্থ শুষ্ক হইয়া যায়,—তখন উহাতে দুই রতি আড়াই রতির অধিক অন্য পদার্থ থাকে না। অথচ এই জীবের ক্ষুধা আছে, ক্রোধ আছে, জিঘাংসা আছে। ইহারা অন্য জীবকে হনন করিয়া আপনা-দের উদর পূর্ণ এবং আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। হয়ত বা উহাদের সুখদুঃখ বোধও আছে। ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার তেজঃস্ফুরণ হইয়া থাকে। এই জীব জীববিজ্ঞানের এক বিরাট প্রহেলিকা। ইহাদের দেহ সাগর জল ভিন্ন প্রায় আর কিছু না হইলেও সেরকরা একরতি পরিমাণ জৈব উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়াফলেই ইহা এত বড় একটা বিরাট জীবে পরিণত হইয়াছে.—একথা যেন মন সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই ধরাপৃষ্ঠে এইরূপ অনেক বিস্ময়জনক জীব আছে। তাহা-দের গঠনের সহিত কার্য্যপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই জেলীফিস্ সম্পর্কে আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। জেলীফিস্ হইতে যে জীব জন্মে, তাহা ঠিক জেলীফিসের অনুরূপ নহে। উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব। ঐ জীব তাহার জন্মকালীন আকৃতি পরিবর্ত্তন করে না। আবার ঐ জীব হইতে যে জীব উৎপন্ন হয়, তাহাই জেলীফিস্। অর্থাৎ জেলী ফিসের এক পুরুষ অন্তর জেলী ফিস্ হইয়া থাকে। জীব বিজ্ঞানের ইহা একটি বিষম রহস্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকগণ জৈব প্রহেলিকার সমাধান করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত,—তাঁহারা কেবল জৈব পদার্থের উদ্ভব-তথ্য লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন। কিন্তু উহাও জড় পদার্থ। কালে রসায়ন শাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি হইলে হয়ত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে জৈব পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু উহার সংযোগফলে উদ্ভাবনী প্রতিভা, ব্যবস্থাজননী প্রতিভা, শাসন-বিধায়িনী প্রতিভা, উন্নতিজননী প্রতিভা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসাধিনী প্রতিভা

প্রভৃতি অশেষবিধ প্রতিভার কি প্রকারে স্ফুরণ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ হইবে না। জড়বাদীরা উহা জড় হইতে উদ্ভূত হয়, বিনা প্রমাণে ইহা কল্পনা করিয়া লয়েন। কিন্তু এই অহেতুকী কল্পনা করিয়াও তাঁহারা এই প্রহেলিকার সমাধানে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, একজন কর্ত্তার অধীনে পরিচালিত কারবার যেরূপ অখণ্ড-ভাবে পরিচালিত হয়, জীবদেহের কার্য্য ঠিক সেইরূপ অখণ্ডভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত নহেন। যেন উহা স্বীকার করিলে ঘোর প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি পাদটীকায় অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডস্ ও অধ্যাপক আর্থার টম্‌সনের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

সর্ব্ব যুগে ও সর্ব্ব সময়ে সাধারণ লোক আত্মার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই অধ্যাত্মতত্ব এক সময় এই দেশেই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। মনীষাসম্পন্ন মহর্ষিরা যোগগম্য জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভোগের জন্যই জীব শরীর ধারণ করিয়া থাকে। শরীর ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল দেহ, যদ্দ্বারা আমরা কার্য্য করিয়া থাকি,—ইহা অন্নময় কোষ। ইহা জীবের ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ। যন্ত্র বিকৃত হইলে ভোগে,বাধা ঘটে। চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিয়া থাকে, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া থাকে,—কিন্তু চক্ষু কর্ণ না থাকিলে জীবাত্মা জড়দেহে থাকিয়া কিছু দেখিতে পায় না। মনে করুন একজন লোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা কোন

---

* Indeed we may compare protoplasm to a successful firm which owes its success to an unusually fortunate combination of partners—of inventive organizing, administrating, pushing, competitive and other geniuses. But there is something more. The firm works as a unity, this is its essential secret. It is unified from within, whether by a common purpose or by the predominant will of its leading partners or by something of both. And the organism has likewise its secret, its internal unity, which we are still far from understanding.

বলা বাহুল্য, জড়ের purpose (উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়) বা will ইচ্ছা বা বাসনা থাকিতে পারে না। উহার ক্রিয়াসামঞ্জস্য ও অভিপ্রায় সাধনের অনুকূলতা যে আত্মারই অস্তিত্ব সূচনা করে, ভাবায় উহা ব্যক্ত হইয়া পড়িলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা উহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

দ্রব্য দেখিতেছে কিন্তু সেই অনুবীক্ষণের কাচখানি (lens) যদি কোনরূপ বিকৃত অথবা অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা আবৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দ্রষ্টা আর উহা চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। সে অন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই যন্ত্রটি যদি চক্ষু হইতে সরাইয়া লয়,—তাহা হইলে সে দেখিতে পায়; তবে অনুবীক্ষণসাহায্যে যেরূপ দেখিতে পায় ঠিক সেরূপ দেখিতে পায় না। সেইরূপ চর্ম্মচক্ষু অবিকৃত থাকিলে জীব তাহার সাহায্যে দেখিতে পায়, চক্ষু নষ্ট বা বিকৃত হইলে অন্ধ হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথাই প্রযোজ্য। যাহার দর্শন-শক্তি আছে সে-ই চসমা, দুরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা দেখিতে পাইয়া থাকে। সেইরূপ আত্মার দর্শনশক্তি আছে বলিয়াই সে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পায়। পাশ্চাত্য জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন,—মস্তিষ্কের সামান্য বিকৃতি হইলে যখন সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, স্নায়ুমণ্ডল বিকল হইলে যখন অনুভূতির শক্তি থাকে না,—তখন মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের বিনাশ হইলে আত্মার চৈতন্য বা অনুভূতির শক্তি থাকিবে কি প্রকারে! জড়বাদীদিগের ইহা একটী প্রবল যুক্তি। কেবল হিন্দুরাই এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—আত্মা নির্ব্বিকার কিন্তু সকল শক্তির উৎস। কর্ম্মফল প্রভৃতি লইয়া প্রকৃতি সেই আত্মাকে উপহত করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহত আত্মাই জীবাত্মা। জীবই সুখদুঃখের ভোক্তা। দেহই ভোগায়তন। দেহেই জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। দেহ ভোগেরই যন্ত্র। চৈতন্য আত্মারই শক্তি। কিন্তু আত্মা যখন জড়দেহকে আশ্রয় করে, তখন জড় মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া চৈতন্য সংজ্ঞারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। যেমন আলোকের চিমনী শ্বেত, লোহিত, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণে অনুরঞ্জিত হইলে তাহার ভিতর হইতে বিভিন্ন বর্ণের আলোক নির্গত হয়,—অন্ততঃ যে আলোক নির্গত হয়, তাহা কথঞ্চিত বিকৃত,—সেইরূপ আত্মা যখন জড়দেহের ভিতর অবস্থিতি করে,—তখন সে বিশ্বের স্বরূপ দেখিতে পায় না,—সে কতকটা উহা বিকৃত ভাবেই দেখিয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টির বৈকল্যহেতু, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম জন্মে,—সেইরূপ আত্মার দৃষ্টিশক্তি যখন জড় পদার্থ নির্ম্মিত নয়নের মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয়, তখন এই জগতের যাবতীয় বস্তুই তাহার নিকট একটা অলীক মূর্ত্তি ধরিয়াই প্রকাশ পায়। ইহাই মায়া। মস্তিষ্করূপ জড় পদার্থের ভিতর দিয়া যে চৈতন্য শক্তি স্ফুরিত হয়,—যাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত,—

তাহা আত্মার প্রকৃত চৈতন্যের বিকার বা বৈকল্যমাত্র,—সেইজন্য স্বপ্নের সহিত উহার তুলনা করা হইয়াছে। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ জীবনকে স্বপ্নময় বলিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখনই ঐরূপ বিকৃত জ্ঞান জন্মে। যখন উহা বিকৃত হয়, তখন সেই দৃষ্টি ও সেই জ্ঞান আরও বিকৃত ও ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। আবার যখন উহা অতিমাত্র বিকৃত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান একেবারেই জন্মে না। চক্ষু নষ্ট হইলে দৃষ্টি শক্তি লুপ্ত হয়,—মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে সংজ্ঞা লোপ পায়। কারণ জড়াধিষ্ঠিত আত্মার দৃষ্টি শক্তি ও সংজ্ঞা তখন স্ফূর্ত্তি পাইবার পথ পায় না। সুতরাং দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐ শক্তি থাকিলে উহা লুপ্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যখন আত্মা দেহ হইতে বিচ্যুত হয়, তখন তাহার ঐ শক্তি আবার প্রকাশ পায়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আত্মা যখন এই অন্নময় কোষ বা স্থুল শরীর ছাড়িয়া যান,—তখন তিনি কি নির্ম্মল আত্মরূপ পরিগ্রহ করেন? ভগবান ব্যাস শারীরিক মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, জীব পরলোকে গমন সময় পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বেষ্টিত হইয়া যায়! উহা তাঁহার ভাবী দেহের অপ্রকট বীজস্বরূপ। উহাই সূক্ষ্ম শরীর। উহার অন্য নাম প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ। ইহাতে জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি বীজরূপে নিহিত থাকে। দার্শনিকগণ বলেন,—"তস্মাৎ বীজৈর্ব্বেষ্টিত এব পরলোকং গচ্ছতীতি।" অর্থাৎ জীব স্বীয় ভাবী জন্মের স্থুল শরীরের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত পরিবেষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করে। অত্যন্ত স্থুল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেহভিন্ন আত্মা নিজের কর্ম্মফলাদি অর্জ্জিত শক্তি অনুসারে পুনরায় দেহ গঠন করিয়া লয়। দেহমুক্ত আত্মার শক্তি সেই সূক্ষ্ম দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।

হিন্দুর এই অধ্যাত্মতথ্য জড় বিজ্ঞানের গম্য নহে, সুতরাং জড়বিজ্ঞান দ্বারা এই তথ্য সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস নিষ্ফল। কথাটি পরে একটু কাজে লাগিবে বলিয়া এই স্থানে এইটুকু বলিয়া রাখিলাম।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আরতির শেষ।

(১)

মুন্‌সেফ্ প্রাণকৃষ্ণ বাবু দ্বিতীয় মুনসেফ্ শরৎ বাবুকে "রিলিভ" করিতে আসিলেন। সঙ্গে পত্নী কমলা, পুত্র সুধীরকৃষ্ণ ও কন্যা ঊষা।

সুধীর কিশোর বয়স্ক; একটু চিন্তাশীল; বোধ হয় একটু আধটু কবি। পিতামাতা সে খোঁজ রাখিতেন না; কিন্তু দুষ্ট ঊষা মাঝে মাঝে দাদার খাতা চুরি করিয়া পড়িত ও তাহার সঙ্গিনী 'ললিতা'কে শুনাইত। 'ললিতা' একটা কাবুলী বিড়াল! 'ললিতা' কবিতা না বুঝুক, ঊষার আদর বুঝিত। আর ঊষাও তার্কিক শ্রোতা অপেক্ষা এই মুক শ্রোতাই অধিক পসন্দ করিত।

দ্বিতীয় মুনসেফ বাবুর কন্যা সুহাসিনী, ঊষার চেয়ে বয়সে প্রায় এক বৎসরের বড়, অর্থাৎ প্রায় একাদশ বর্ষীয়া।

সুধীর তাহাকে একবার মাত্র দেখিল। কুঞ্চিত কালো চুলে আধ ঢাকা সুন্দর মুখখানি; মেঘান্তরিত শশাঙ্কের মত শান্ত পুলকোদ্ভাসিত। সে মুখশ্রীর একখানি নিখুঁৎ ফোটো বহু দিন পর্য্যন্ত কিশোর কবির তরুণ হৃদয়ফ্রেমে আঁটা রহিল!

তিন দিন পরে শরৎ বাবু পত্নীকন্যাসহ চলিয়া গেলেন। আর দুই দিন পরে ইঁহাদের কথা সকলেই এক প্রকার ভুলিয়া গেল, ভুলিল না শুধু ঊষা,—সে সুহাসিনীকে তিন দিনের পরিচয়েই নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

সুধীর সে দিন কলেজে চলিয়া গিয়াছে; ঊষা যথারীতি দাদার খাতা চুরি ও গোপন পাঠরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইল। কিন্তু এ কি? এ কি ছন্দ কবির হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে! ঊষা ভাল করিয়া বুঝিল না; তবু এটুকু বুঝিল, কবির হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! কতবার খাতা চুরি করিয়া আনিয়া ঊষা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নূতন সুর এমন করিয়া ত কোনও দিনই তাহার কাণে উঠে নাই! কাবুলী বিড়ালটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ঊষা জিজ্ঞাসা করিল—"বলিতে প্যারিস্, ললিতা, কি এ?"

সকালে ডাক আসিয়াছে; সুধীর কতকগুলি চিঠি হাতে করিয়া ভিতরে আসিল—বলিল "ঊষা তোর চিঠি আছে রে" আগ্রহের সহিত ঊষা চিঠি চাহিয়া লইল।

"কা'র চিঠিরে—নূতন হাতের লেখা দেখছি যে!" সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

"ইস্ তাই বলি আর কি; তুমি খাতায় কি লেখ,—আমায় বলে থাক?—কথাটা বলিয়া ঊষা একটু কেমন হইয়া গেল। হঠাৎ খাতার কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া ত ভাল হয় নাই! যদি চুরি ধরা পড়ে!

সুধীর জানিত, ঊষা তাহার খাতা চুরি করিয়া পড়ে; গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, তাহার যে একজন 'সমজদার' পাঠক আছে, সুধীর তাহা মনে করিয়া একটু গৌরব ও তৃপ্তি অনুভব করিত।

"আচ্ছা তোকে খাতা দেখাব—বল্ কে লিখেছে চিঠি!"

"চাই না আমি তোমার খাতা দেখ্‌তে" বলিয়া ঊষা ফিরিয়া দাঁড়াইল—চিঠি মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"ছিঃ, পরের চিঠি বুঝি দেখ্‌তে আছে!" আজ তাহার ধর্ম্মজ্ঞানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুধীর মনে মনে একটু হাসিল। পলকের মধ্যে ঊষা ছুটিয়া রান্নাঘরে মাতার কাছে উপস্থিত হইল, এবং "মা—'সু—র' চিঠি এয়েছে" কথাটা এমন ভাবে বলিল যে, বাহিরে সুধীর স্পষ্টই তাহা শুনিতে পাইল। তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত কেন যে আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

চুরি করিতে যাইয়া, একজন চোর নাকি অন্য একজন চোরকে ধরাইয়া দিয়াছিল। সুধীর আজ তাহার দেরাজের তালা চাবি বদলাইয়া ফেলিল; কি জানি যদিই বা ঊষা চুরি করিতে আসিয়া চোর ধরাইয়া দেয়।

(২)

সুধীর স্থানীয় কলেজের ছাত্র। কলেজে "Little Brothers of the Poor" নামে একটি ছোট সমিতি ছিল। প্রতি বৎসর 'সেশন্' আরম্ভের সময়ে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইত। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্রগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। সমিতির সভ্যগণের কর্ত্তব্য ছিল, পীড়িতের সেবা ও দুঃস্থের অভাব-মোচন। সমিতি ছোট হইলেও, সভ্যগণ এক গুরু কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। সহরে সাধারণ গৃহস্থ স্রোতের জল ব্যবহার করে। রাস্তার পাশে পাশে অপরিসর পয়ঃপ্রণালী চলিয়া গিয়াছে; পয়ঃপ্রণালীগুলি নদীর সহিত সংযুক্ত; এবং প্রত্যেক পুষ্করিণী এই প্রণালীসমূহের সহিত যুক্ত। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই জোয়ার ভাঁটায় জল বাড়ে ও কমে। তাই সহরটিতে প্রায় প্রতি বৎসরই কলেরার প্রকোপ দেখা যায়। যিনি এই সমিতির সম্পাদক

বা প্রাণ সহরের কেহ কলেরায় আক্রান্ত হইলে, তাঁহার নিকট সংবাদ আসিত। সকলেই জানেন, কলেরা রোগীর সেবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। যে স্থানে লোকাভাব বা যে সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করিত, সম্পাদক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে তথায় 'সেবক' পাঠাইতেন। কলেজের যুবকগণই স্বেচ্ছায় এই সেবাভার গ্রহণ করিত।

সুধীর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সে তাহার নাম "কলেরা শাখায়" লিখাইয়া দিল। সমিতির দুইটি শাখা ছিল। একটিকে আমরা "কলেরা শাখা" বলিতে পারি। যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ভীক তাহাদিগকেই কলেরা শাখায় গ্রহণ করা হইত। অন্য শাখার সভ্যগণকে জ্বর ইত্যাদি সাধারণ রোগেই সেবা করিতে হইত। কে কোন্ শাখায় প্রবেশ করিবে তাহা ছাত্রদের নিজের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিত। কলেজ হইতে আসিয়া সুধীর বলিল "বাবা, আমি 'Little Brothers of the Poor' সমিতির কলেরা শাখায় নাম দিয়াছি।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু পত্নী কমলার মুখের দিকে চাহিলেন।

"তোর ভয় করবে না ?"—কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুধীরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভয় কি, মা ? তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে কিছু গ্রাহ্য করি না।"

"শুন, পাগল ছেলের কথা—"বলিয়া কমলা হাসিলেন। কমলার মুখের সে হাসিতে জগন্মাতার করুণ মুখের হাসিরাশির এতটুকু আভাস বুঝি ফুটিয়া উঠিল।

"তা বেশ, আমার কিছু অমত নাই, তবে খুব সাবধানে কাজ করিস্। মানুষ অনর্থক ভয় পায়—কলেরা ছোঁয়াচে নহে।" প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথায় একটা বিশ্বাস ও নির্ভীকতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সমিতির নিয়ম অনুসারে সুধীর প্রথম প্রথম রোগের প্রথমাবস্থায় সেবা করিতে যাইত, তাহার পর সে ক্রমে ক্রমে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কঠিন অবস্থাতেও যাইতে আরম্ভ করিল। সেবাকার্য্যে সুধীরের তৎপরতা অতুলনীয় ছিল ; রোগগ্রস্তকে একটু আরামে রাখিবার জন্য তাহার প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহ অপর সেবকগণের আদর্শ হইয়া উঠিল। কত রোগীর শিয়রে বসিয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে! প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন সুধীর দেখিত, রোগীর মুখে শান্তি ও আরামের চিহ্ন ধীরে ধীরে

ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে দিন তাহার অন্তর তৃপ্ত হইয়া উঠিত,—তাহার প্রসন্ন অন্তরে দেবতার আশীর্ব্বাণী যেন সেদিন নিতান্ত সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিত।—আর আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দনরোলের মধ্যে যে দিন রোগগ্রস্তের অবিনশ্বর আত্মা মৃত্যুর চির-রহস্যময়-রাজ্যে প্রবেশ করিত, সে দিন তাহার নয়নযুগল অশ্রুতে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

(৩)

সুধীর এফ্, এ, পাশ করিল; বিশ্ববিদ্যালয় ছেলের মুখের দিকে চাহে না; বাঙ্গালীর ছেলের মাবাপও বুঝি বড় একটা চাহেন না। ভদ্রলোকের ছেলের পরীক্ষায় পাশ করা দরকার; সুধীরও প্রশংসার সহিত পাশ করিল।

মা কমলা চাহিয়া দেখিলেন, সুধীর পাশ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের কতকটা অবনতি হইয়াছে।

উষা পিতার কাছে 'আব্দার' করিল, "বাবা, দাদার বে' দাও—আমার সইয়ের সঙ্গে"—

সই,—সুহাসিনী, শরৎ বাবুর কন্যা।

বাবা হাসিলেন। মা চুপ করিয়া রহিলেন।—কারণ, উষার কথাটা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার মৌনাবস্থা অনুমোদনসূচক। সুহাসিনী মেয়ে ভাল, তিন দিনের পরিচয়েও সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু আর একটু হাসিলেন; সেটুকু পত্নীর মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া। তিনি বলিলেন, "সুধীরের শরীরটা একটু খারাপ দেখ্ছি, একবার পশ্চিম বেড়িয়ে আসুক্;—কালই যাবে, বন্দোবস্ত করেছি।"

ত্রস্তভাবে উষা বলিল,—"বাবা, আমার কথাটার উত্তর?"

যেন দাদার বিবাহ সরিয়া গেল, ভাবটা এমনই!

"দিচ্ছি;—দাওতো টেবিলের উপর থেকে একটা চিঠির কাগজ, আর পেনটা"—প্রাণকৃষ্ণের ওষ্ঠাধর হাস্যরঞ্জিত করিয়া উঠিতেছিল।

কমলা বুঝিলেন চিঠির কাগজে কি হইবে। উষা উৎসুক দৃষ্টিতে মা'র ও বাবার মুখে চাহিয়া ভাবিল "ব্যাপার কি?"—

প্রায় দশ মিনিট কাল প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি লিখিলেন; তার পর চিঠিখানা উষার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই নে তোর উত্তর!"

উষা চিঠি পড়িল; আনন্দে তাহার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল!

"বাবা, এই আমি তোমায় 'আশীর্ব্বাদ' কচ্ছি"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও কমলা হাসিয়া উঠিলেন।

"না বাবা 'প্রণাম' কচ্ছি"—পিতার পায়ের কাছে 'টিপ' করিয়া এক প্রণাম করিয়া উষা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভুলের লজ্জা ও প্রার্থিত-লাভের আনন্দ তাহাকে চঞ্চল, অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

"পাগলি মা আমার"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

কমলা সব বুঝিয়াছিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গা!"

"এই শরৎ বাবুর কাছে তাঁর মেয়েটির জন্য প্রস্তাব করে পাঠালুম—হ'ল ত? এখন বোধ হয় রেতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দেবে?"

কমলা হাসিলেন। প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর প্রথম সূর্য্যরশ্মিপাতের ন্যায় সে হাসিটুকু বড় উজ্জ্বল—বড় মধুর।

পত্নীর তৃপ্তি দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু তৃপ্ত হইলেন।

(৪)

যথাসময়ে সুধীর পশ্চিমে চলিয়া গেল। স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সুধীর দেশভ্রমণদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সে ইচ্ছা ছিল, এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্তও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। সুধীর এক স্থানে বসিয়া রহিল না, পশ্চিমের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে শরৎ বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। শরৎ বাবু এই বিবাহ-প্রস্তাবে যেন অনুগৃহীত হইয়াছেন, এমনই কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

"জানি আমি শরৎ বাবুকে, অমন উদারপ্রকৃতির লোক দুটি দেখিনি; দেখেছ চিঠি?"—প্রাণকৃষ্ণ হাসিয়া চিঠিখানি পত্নী কমলার হাতে দিলেন।

কমলা চিঠি পড়িলেন; উষা পিতার পশ্চাৎ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পূর্ব্বেই চিঠি পড়িয়াছিল; এখন বলিল—"তবে এই মাসেই দাদার বে' দাও"—

প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিলেন, কহিলেন, "সে বটে—কিন্তু তার যে এক বাধা রয়েছে; দুবার তো আর খরচ করে পেরে উঠ্‌বো না—একেবারেই—"

কমলার চক্ষু দুইটি প্রসন্নতাপূর্ণ হইয়া হাসিতেছিল। উষা কথাটা বুঝিল, কি বলিবে 'দিশা' না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার মাথার সামনে ক' গাছি চুল পেকেছে দেখ্‌ছি—তুলে দিই?"

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই উষা পাকা চুল তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

(৫)

মানুষ কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু সে কল্পনাকে সার্থকতা দিবার ভার ভগবানের হাতে !

কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট একটু হাসিয়াছিল, তাহা আর উভয় পক্ষের কেহই জানিতেন না। বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির করিয়া ফেলিবার জন্য উভয় পক্ষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহা আর এখন এক প্রকার কাহারও অবিদিত ছিল না যে, সুধীরের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ এক প্রকার স্থিরই হইয়া গিয়াছে। তবু আজ কাল করিয়া পুরা দুই বৎসর কাটিয়া গেল, আর সুহাসিনী চতুর্দ্দশ বৎসর পার হইয়া পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাকে শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় উভয় পক্ষেই এমন বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু এমন সময়ে দেবতার বজ্রের মত আকস্মিক ও নিষ্ঠুর এক বিপদপাৎ হইল! সে বিপদ এতই অপ্রত্যাশিত যে, উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণই একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সেদিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু বারাণ্ডায় বসিয়া হাতমুখ ধুইতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল; মুখে চক্ষুতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও ক্লান্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। প্রাণকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নী কমলাকে সঙ্কেত করিলেন; কমলা স্বামীর অবসন্ন দেহ জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু সাধ্বী পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সেই বারাণ্ডায়ই শুইয়া পড়িলেন। উষা মাতার চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছিল; পিতার অবস্থা দেখিয়া জল ও পাখা লইয়া আসিল। কিন্তু জলসেক ও পাখার বাতাস ব্যর্থ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে অমূল্য ডাক্তার আসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিলেন—আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "Eh—past hope !"—কমলার মূর্চ্ছিত দেহলতা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন ধরণীর উজ্জ্বল শোভা ম্লান করিয়া দিতেছিল, তখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু মহাপ্রস্থান করিলেন।

(৬)

গ্রামের বাড়ীতেই শুদ্ধিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুকালে সুধীর কাছে ছিল না, এই ক্ষোভ তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। পল্লীর শান্ত মধ্যাহ্নে যখন সুধীর জননী কমলার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে দূর আম্রকুঞ্জের শ্যামপল্লব-শোভার দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন তাহার চক্ষুর কাছে পিতার স্নেহদীপ্ত মুখখানির স্মৃতি জাগিয়া উঠিত।—তখন আর অশ্রু কোন মতেই বাধা মানিত না। জননী তাঁহার স্নেহহস্ত পুত্রের ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত; উভয়ের তীব্র শোক, যে পবিত্র নিস্তব্ধতার সৃষ্টি করিয়া তুলিত—তাহা অপার্থিব। যে শোকে গুঞ্জন নাই, ভাষা নাই, প্রকাশ নাই, সেই শোকই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র।

যেদিন উষা কাছে থাকিত, সে দিন সেই বুদ্ধিমতী বালিকা আবদারে কথায় মা'র ও দাদার শোকের দারুণ নীরবতা ভঙ্গ করিত।

শোক-প্রবাহ যখন হৃদয়মধ্যে একান্তই উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন সান্ত্বনা লাভের জন্য বুকের কাছে একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে। কমলার ও সুধীরের স্নেহ উন্মুখভাবে উষাকেই বুকের কাছে টানিয়া আনিল; উষা প্রলেপের মত এই দুই শোকদিগ্ধ হৃদয়ে লাগিয়া রহিল।

কিন্তু এই শোকের তীব্র আঘাতে পুনরায় সুধীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। আতপতপ্ত কমলপত্রের মত সুধীর শোকের তীব্র সন্তাপে ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছিল। কমলা অস্থির হইয়া উঠিলেন,—সুধীরকে পুনরায় পশ্চিম প্রদেশে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ধরিলেন;—কিন্তু সুধীর মা'কে রাখিয়া আর কোনও মতে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন সুধীর মা'কে ও উষাকে লইয়া পশ্চিমে কিছু কাল বাস করিয়া আসিবে, এমনই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

তাঁহারা কোথায় কিছু অধিক দিন বাস করিবেন, তাহা আর স্থির হইল না; যে স্থান জননীর ভাল লাগিবে সুধীর সেই স্থানেই কিছু দীর্ঘকাল বাস করিবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রাখিল।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে সুধীর মাতা ও ভগিনীকে লইয়া পশ্চিম চলিয়া গেল।

কালাশৌচের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া শরৎ বাবু এই শোকের সময়ে বিবাহসম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতিসূচক চিঠি লিখিতেন; সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যে চিঠি লিখা যায়, তাহার প্রত্যেকখানির উত্তর কেহই আশা করে না; কারণ, শোকের কাছে ভদ্রতার তুচ্ছ খুঁটী নাটী হিসাবগুলি প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। শরৎ বাবু প্রায়ই সুধীরের পারিবারিক সংবাদ পাইতেন না; সুতরাং কবে তাহারা পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে, সে সংবাদ শরৎ বাবু পাইলেন না।

শরৎবাবু যখন ছুটী লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়ীতে সুধীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তখন তাহারা তথায় ছিল না। প্রতিবেশী কেহই তাহাদের সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না। শরৎ বাবু ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমের নানা স্থানে সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়াও, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাইলেন না।

সুহাসিনী এখন আর ছোট্টটি নহে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, আর কত দিন রাখা যায়? শরৎ বাবুর আত্মীয়গণ বলিলেন, "আর মেয়ে রাখা চলে না, সুধীরের যখন খোঁজই নাই, তখন সে অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। ভাল ছেলে দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেল।"

শরৎ বাবু প্রথম প্রথম কথাগুলিতে কাণ দিলেন না, কিন্তু যাঁহারা আত্মীয়তা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা সহজে পরামর্শদানে বিরত হইবেন কেন?

এমনই করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল; শরৎ বাবুর পত্নী চারু আসিয়া বলিলেন, "ও গো মেয়ের দিকে তো আর চাওয়া যায় না। সুধীরের আশায় আর কত দিন বসিয়া থাকিবে? মেয়ের অদৃষ্টে সুখ থাকিলে হইবে; একটা ঠিক করিয়া ফেল।"

শরৎ বাবুর কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, সুহাসিনীর প্রতি সুধীর বোধ হয় একটু আকৃষ্ট। সেই পিতৃহীন যুবক, সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গেলে যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপটুকু পাইবে, তাহা মনে করিয়াও শরৎ বাবু বুকের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু সুধীরের পক্ষে এই মনস্তাপ ও হতাশার পরিমাণ কতটুকু, তাহা শরৎ বাবু বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা করিতে পারি না; সুতরাং পত্নীর কাতর নিবেদন ও

আত্মীয়গণের অযাচিত পরামর্শ তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিলেও, সাংসারিক হিসাবে তিনি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

পুরুষ পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, বিশ্বের চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহার একটা কিনারা করিতে চাহিবার স্পর্দ্ধাও রাখিতে পারে ; কিন্তু এতটুকু বালিকার কোমল হৃদয়ের মধ্যেও যে আকর্ষণ, যে বিশ্ববিপ্লাবী প্রেম গোপন রহিয়াছে, তাহা পুরুষের নিকট চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। শরৎ বাবু ভাবিলেন, সুহাসিনীর হৃদয়ে যদি সুধীরের জন্য এতটুকুও আকর্ষণ থাকিয়া থাকে, তাহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতে সুহাসিনীর বিবাহের চেষ্টা ও আয়োজন সবেগেই চলিতে লাগিল।

আর সুহাসিনী ? হিন্দুকন্যার 'বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না'—সুতরাং সে নীরবেই সব সহ্য করিতেছিল।

(৫)

"আর কোন তীর্থে যাইবে, মা ?"

"কোথায়ও আর যাইব না, বাবা বিশ্বেশ্বর চরণে স্থান দিন, এখানেই কিছুদিন থাকিয়া যাইব। আর যদি তুই বাড়ী ফিরিতে স্বীকার করিস্, চল। কাশীও বুঝি আমার বাড়ীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে—যদি তুই ফিরিস্!"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুধীর ডাকিল, "মা!"

মাতা কমলা বুঝিলেন, কোথায় পুত্রের আঘাত লাগিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল তিনি বলিলেন,—"কি বাবা!"

"মা, তুমি যদি বল আমি বাড়ী ফিরিব ; যেখানে তুমি, সেখানেই আমার কাশী।"

কমলা সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহকোমল স্বরে কহিলেন, "না বাবা আমি কাশীতেই থাকিব, তোর যদি গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা হয়, তাই ও কথা বলিতেছিলাম"—মাতার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল।

সুহাসিনীর বিবাহ-সংবাদ সুধীর ও কমলা পাইয়াছিলেন।

সুধীরের শোকদুর্ব্বল হৃদয়ে এই আঘাত তীব্র ভাবেই লাগিয়াছিল।

মাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া গিয়া সুধীরের বিবাহ দেন, —কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। গ্রামে

ফিরিবার প্রস্তাবের অর্থই যে সুধীরের বিবাহে স্বীকার হওয়া, এটা সুধীর বুঝিত।

কত দিন অকারণ অশ্রু আসিয়া সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়াছে; মাতার অঙ্কবর্গে সুধীর বালকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; মাতা কমলা শোকের সে নীরবতা ভঙ্গ করেন নাই। বুক ভাঙ্গিয়া যখন দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিত, তখন নীরবে সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতেন।

মাতার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ এমনই করিয়া নীরবে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া, সকল দুঃখ ও কষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিত। হায়, মাতার স্নেহ!

সে দিন অপরাহ্নে মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; দিনের আলো নিবিয়া যায় নাই; তবু এক বিষাদমাখা ম্লান আলোকে সমস্ত কাশী সহরটি আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

বাহিরের ঘরে বসিয়া সুধীর একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সদর দরজা হইতে একটা লোক ডাকিল, "বাবুজি, এ বাবুজি—"

সুধীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, টেলিগ্রাফ্ অফিসের একটা পিয়ন; হাতে টেলিগ্রামের খাম।

সুধীর খামখানি গ্রহণ করিয়া দেখিল, তাহার নামেই আসিয়াছে। কে এ টেলিগ্রাম করিল? কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া সুধীর পড়িল। মর্ম্ম এই,—

"মা'কে লইয়া তীর্থে আসি, স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত, তুমি নিকটে আছ। শীঘ্র আইস।

বিজয়।"

নাম সহি করিয়া দিয়া সুধীর বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল—

পিয়নটা বলিতেছিল—"বাবুজি বক্‌সিস্,"—তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে চাহিয়া দেখিল, 'বাবুজি' অদৃশ্য হইয়াছেন। "খবর তো জরুরি হ্যায়"—বলিতে বলিতে পিয়ন চলিয়া গেল,—আজি আর সে কিছু পায় নাই—'সিদ্ধির' কটা পয়সাও নহে!

"আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত বিজয়, তাকে তোমার মনে আছে ত, মা!

তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সে প্রয়াগে এসেছে, স্ত্রীর কলেরা, আমাকে যাওয়ার জন্ত তার করেছে,"—সুধীর এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ, তারা ত বিদেশে ভারি বিপদে পড়েছে,—তা, তুই যাচ্ছিস্ ত ?"—কমলা দেবীর কথার মধ্যে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

"তা,' মা, তুমি বল্‌লেই যেতে পারি"—

—"ও মা, তা আর বল্‌ব না। এ বিদেশে তা'দের দেখ্‌বে কে ?"

কুন্তীদেবী যে বিশ্বাস লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন, কমলার পক্ষে অবলম্বন করিবার মত ততটুকু বিশ্বাস ছিল কি ? তবু কি প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি একমাত্র পুত্রকে, রাক্ষসের অপেক্ষাও নির্ম্মম ও ভীষণ এক অদৃশ্য দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন! তাঁহার মাতৃহৃদয় সুধীরের সহপাঠীর বিপদ সংবাদে ব্যগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠিল। রমণীর এ মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। ইহার তুলনা অসম্ভব।

যথা সময়ে মাতার আশীর্ব্বাদরূপ অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সুধীর তাহার সংগ্রামক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

(৮)

প্রয়াগে আসিয়া বিজয়ের বাসা খুঁজিয়া লইতে সুধীরের প্রায় রাত্রি দশটা বাজিল।

"বড় বিপদে পড়েছি, সুধীর,—মা'রও বোধ হয় কলেরা হয়েছে।"—ঘরের বাহিরে আসিয়া সুধীরের হাত ধরিয়া বিজয় কহিল।

"তোমার স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ, বিজয় ?"—সুধীরের স্বর সহানুভূতিপরিপূর্ণ।

"এখনও বেঁচে আছে,—তবে বোধ হয়, শেষ অবস্থা। আমি মা'র কাছে যাই; তুমি তা'র কাছে যাও। সঙ্কোচ ক'রোনা সুধীর, শুধু তুমি আর আমি! দেখ, যদি রক্ষা কর্ত্তে পার। এমন বিপদে আর আমি পড়িনি!"

"কলেজে পড়বার সময় 'Little Brothers of the Poor' সভ্য হয়ে যে শিক্ষাটা হয়েছিল এবার দেখ্‌ছি তা' কাজে লেগে গেল!"

সুধীর চির দিনই একটু লাজুক প্রকৃতির; কিছু সেবাকার্য্যে যখন সে ব্রতী হইত, তখন তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা কোথায় চলিয়া যাইত; রোগীর অবস্থার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের উৎসাহ বাড়িয়া চলিত।

কলেজে থাকিতে বিজয় ও সুধীর কত কলেরা রোগীরশয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; তখন তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, কলেজের বাহিরেও এমন একটা দিন তাহাদের জীবনে আসিবে, যে দিন সুদূর প্রবাসক্ষেত্রে তাহাদেরই আপন জনের সেবায় তাহাদের দুই সতীর্থকে এমন ভাবে মিলিত হইতে হইবে।

সুধীর ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একখানি ছোট চৌকির উপর ঔষধের শিশিগুলি সাজান রহিয়াছে। পার্শ্বে কয়েকটা কাচের বাটীর মধ্যে প্লেট্ দিয়া ঢাকা, কিছু লেবু, বেদানা ইত্যাদি। আর একখানি কাগজে কখন্ কোন্ ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে এবং খাওয়াইতে হইবে, তাহারই একটা 'চার্ট' লিখিত রহিয়াছে। একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সুধীর বুঝিল, সবই ঠিক আছে; বিজয় "সেবা সমিতির" সেবাপ্রণালীর এতটুকুও ভুলিয়া যায় নাই!

সেই অতীত দিনের মত আজ আবার সুধীর সেবা করিতে পাইবে, ইহা মনে করিয়া, তাহার প্রাণে তেমনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল।

একটা ওয়ালল্যাম্পের মৃদু আলোকে গৃহটি অনুজ্জ্বল ভাবে আলোকিত ছিল,—সুধীর আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ভূনত জানু হইয়া উপবেশন করিল; নাড়ী দেখিবার জন্য রোগিণীর হাতখানি তুলিয়া লইল। সে হস্ত শীতল দেখিয়া সুধীর সেকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিল।

অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে "প্রাণ যায়—মা গো—জল"—বলিয়া রোগিণী একবার মস্তক চালনা করিল।—তখন তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখখানির উপর সুধীরের দৃষ্টি পড়িল; একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ যে সুহাসিণী!

কিন্তু তখন ত আর তাহার বিস্ময় প্রকাশের অবসর নাই!

আপনাকে সংযত, স্থির করিবার জন্য যে শক্তিটুকু সে তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করিল, সেই শক্তিই তাহাকে যেন মূর্চ্ছাতুর করিয়া তুলিতেছিল।

তাহার পদতল হইতে যেন হর্ম্মতল সরিয়া যাইতেছিল; সে একটা আল্‌নার কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। হায়, কি সংগ্রাম তাহার বুকের মধ্যে

এই এক মুহূর্ত্তকাল চলিয়াছিল, কে তাহা বুঝিবে? বিশ্বের ঠাকুর কি মানুষের এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা করিবেন?

"জল,"—আবার রোগিণীর মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল।

সুধীর চমকিয়া উঠিল; অনুতাপ ও লজ্জা আসিয়া যেন তাহাকে কশাঘাত করিল। বন্ধুপত্নী,—এবং বন্ধু বিশ্বাস করিয়া, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ না করিয়া তাহার উপর মৃত্যুপথযাত্রিণী পত্নীর শুশ্রূষা ভার অর্পণ করিয়াছেন,—ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? বড় একটা গর্ব্ব, একটা সংযত আত্মবোধ তাহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আজ তাহাকে এ সংগ্রামে, এ পরীক্ষায় জয়লাভ করিতেই হইবে।

একটু লেবুর রস করিয়া সে রোগিণীর মুখের নিকটে লইল—রোগিণী প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা; কি বলিয়া সে ডাকিবে?

সুধীর দন্তে আপনার ওষ্ঠ চাপিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল —তাহার পর হৃদয়ের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া বলিল—"খাও ত লক্ষ্মী দিদিটি আমার।"

ঐ একটি আহ্বানেই যেন তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা কাটিয়া গেল;— তখন সে সহজ শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিবার অধিকার পাইয়া, যেন একটি পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিল।

সুধীর যখন লেবুর রসটুকু সুহাসিনীর মুখে ঢালিয়া দিতেছিল, তখন সে একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, স্বামী নহে—আর কেহ,—কে সে?

সেই আধ জাগরণ, আধ তন্দ্রার মধ্যে, সেই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও সুহাসিনী চিনিল, সে কে।

সে যে সুধীরকে চিনিতে পারিল, সে অপরাধ তাহার নহে। তাহার দীর্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরালে, যে মূর্ত্তিখানি সে বিস্মৃতির নিম্নে সবলে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই মূর্ত্তি, তাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া, বিস্মৃতির স্তূপ ঠেলিয়া, বাহির—হইয়া আসিয়াছে কি? সে শুনিয়াছে, বিকারের মোহে মানুষ নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখে, স্বপ্ন দেখে; তবে কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

তন্দ্রার ঘোরে তাহার চিন্তার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তবু সে বুঝিতেছিল, স্বামীর হস্ত হইতেও সেবানিপুণ দুইখানি হস্ত তাহার শুশ্রূষায় প্রাণপণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

দুইবার সে নিষেধ করিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু তখনই রোগ-যাতনার আকুলতায় সে ভুলিয়া গিয়াছে, কি বলিবে।

শুধু পিপাসা;—আর সেই পিপাসার শান্তির জন্য জল—একটু জল। —ইহা ব্যতীত তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না!

শেষ রাত্রিতে সুহাসিনীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল। বিজয় মৃদুস্বরে আসিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, ডাকিল, "সুধীর!"

সুধীর তখন একটা কেট্‌লিতে সেক্ দিবার জন্য জল গরম করিতেছিল—ফিরিয়া উত্তর দিল—"কি, বিজয়?"—তাহার পর ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল "মা'র অবস্থা কেমন?"

"বুঝিতে পারিতেছি না, একবার যাইও।"—পীড়িতার কাণে কথা না যায় এমনই মৃদুস্বরে বিজয় কথা কহিল।

সুহাসিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল; স্বামীর অস্পষ্ট কথার স্বর তাহার কাণে গেল। সংজ্ঞালুপ্তির আবেশ তখনও তাহার দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান।

এই স্বামী—কি প্রেমময় তাঁহার হৃদয়! বিবাহিত জীবনের এই বৎসরাধিক কাল সে তাঁহাকে তাঁহার আদর ও যত্নের এতটুকুও প্রতিদান করে নাই! স্বামী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ডাকিয়াছেন, তখন সে কতবার কাযের 'অছিলা' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, কেন সে গিয়াছে? সে নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীর হৃদয়ের পরিপূর্ণতা তাহাকে একান্ত ভাবে কুণ্ঠিতই করিয়া তুলিয়াছে—তাহার হৃদয়ের দৈন্য আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে অকপট চিত্তে স্বামীকে সবটুকু দিতে পারে নাই! কেন পারে নাই, কোথায় তাহার বাধা, তাহা ত বলিবার নহে!

জীবন ও মরণের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহার দুর্ব্বল হৃদয় আরও কাতর হইয়া উঠিল; সুধীর কাছে আছে, আজই স্বামীকে সবটুকু দান করিবার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—ইহার পরেই হয় ত পৃথিবীর সঙ্গে তাহার সব সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইবে; তাহা হইলে এ জীবনে ত আর স্বামীকে সবটুকু দেওয়া হইল না!

সুহাসিনী একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; ক্লান্তির আবেগে

তাহার চক্ষুর পাতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তবু সে আবার স্বামীর মুখে দৃষ্টি স্থির করিল। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল।

ঘরের আলোটা যেন নিভিয়া গিয়াছে; এমনই ভাবে একটা কালো ছায়া তাহার চক্ষুর উপর নাচিয়া উঠিল!—এই বুঝি মৃত্যু!—

ওগো, তাই কি? তবে ত আর অবসর হইল না!—সুহাসিনী প্রাণপণ করিয়া ডাকিল—"বড় পিপাসা, একটু জল দিন্ দাদা!"—

তাহার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছে? তখন তাহার তন্দ্রার মোহ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল!

চমকিত সুধীর শয্যার পার্শ্বে সরিয়া আসিল; তাহার চরণ, টলিতে-ছিল—মাথা ঘুরিতেছিল; সে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া,—বলিল, "এই জলটুকু খাও, লক্ষ্মী, দিদি আমার,"—

সুধীরের দেওয়া জল এবার সুহাসিনীকে তৃপ্ত করিল,—তাহার নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিল; তাহার মুখে চক্ষুতে একটা আরামের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

বিজয় কহিল "সুধীর, ও ঘরে একবার মা'কে দেখ্‌তে যেও"—তার পর সেই দেবপ্রকৃতি যুবক মাতার সেবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল!

সুধীর ও সুহাসিনীর হৃদয়ের উপর দিয়া যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে বিজয় তাহার কিছুই জানিল না;

প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবী যেমন শান্ত, স্থির হইয়া নবোদিত সূর্য্যকে অভিনন্দন করিতে থাকে, সুধীর ও সেদিনকার প্রভাতকে তেমনই করিয়া অভিনন্দন করিল। আজ তাহার হৃদয় শান্ত, স্থির, সম্ভ্রমময়।

(৯)

চার দিন পরে সুধীর বারাণসী ধামে ফিরিয়া আসিয়া জননীর চরণে প্রণাম করিল, কহিল, "মা বাড়ী চল।"—

জননী কমলা মনে মনে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিলেন—তবে কি অনাদিনাথ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

জননী বলিলেন "বাবা, সুধীর"—বাড়ী কি আমার বারাণসী হবে?"—

"তা' তুমি জান, মা। আমার মা যেখানে, সেখানেই আমার বারাণসী"—বলিয়া সুধীর একটু হাসিল!

"আর আমার মা,"—জননীর তৃপ্ত কণ্ঠের বাণী শেষ হইবার পূর্ব্বেই উষা কোথা' হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল "দাদা, বিজয় বাবুর স্ত্রী কেমন?"

"আরাম হয়েছে,—সে যে সুহাসিনী, উষা,"—সুধীর একটু হাসিল।

উষা ও কমলা দেবী চমকিতা হইয়া উঠিলেন;—জননী আর একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সে মুখ নির্ম্মল, প্রশান্ত, গরিমাময় হাস্যদীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

চীনের ভারত আক্রমণ।

—:•:—

অনেকেই হয়ত প্রাচীন ভারতে দারিয়সের, আলেকজেণ্ডার, হুন, শক প্রভৃতি সিন্ধু পরপার্শ্বস্থিত বৈদেশিকের আক্রমণ বিবরণ ও তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চীন দেশীয়গণ যে এক সময় হিমাদ্রি অতিক্রম করতঃ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন একথা সর্ব্বজনবিদিত নহে।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—"There's Reason to think that the Chinese who doubtless had been formerly Master of Industan had left some Pieces of which it's impossible to discover the Antiquity." *

কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অন্য সমস্ত ঐতিহাসিকই প্রায় নীরব। অনেকে বলেন, ভারতের সহিত চীনের এককালে বাণিজ্যাদি চলিত এবং এই দুইটী মহারাজ্যের অধিবাসীরা "হিমানীমণ্ডিত হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্গ তুচ্ছ করিয়া" পরস্পরের দেশে গমনাগমন করিতেন। এমন কি আসামের আবিষ্কৃত বারুদ চীনে যাইয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।*

চীনের রাজধানী পিকিন নগরে রাজপরিবারের সমাধি প্রাসাদের তোরণে একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি বহু শতাব্দী হইতে বিরাজিত দেখা যায়। প্রবাদ আছে, "ভারতের "অর্জ্জুন" নামক নরপতি চীন সম্রাটের সামন্ত-নৃপগণ মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহারই স্মৃতি ও সম্মানের নিমিত্ত এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।"

ডাক্তার বুশেল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে "তাং" বংশের দুইখানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখেন যে, ঐ দুইখানি গ্রন্থেই চীন সেনাপতির দ্বারা ভারত আক্রমণের বিষয়ের উল্লেখ আছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক

* See Manouchi's General History of the Mogol Empire. (Bangabasi Edition P. 136.)

† See Tavernier's Travel in India, (*Bongabasi* Edition. Book III. P. 453.)

রেভিনস্ বোধগয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটি প্রাচীন তাম্র লিপি প্রাপ্ত হয়েন ও ঐ সকল তাম্রলিপি পাঠে জানিতে পারেন যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একজন চীন সেনাপতি ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সকল তাম্রলিপি তাঁহার দ্বারাই লিখিত।

কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ড যখন তিব্বতে অভিযান করেন, সেই সময় তাঁহার সহিত ডাক্তার ওয়াডেল গমন করেন। তিনি লাসাতে কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থপাঠ করিয়া অবগত হয়েন যে, চীন ভারত আক্রমণ করে এবং তিব্বতীয় ও নেপালী সৈন্যের সহায়তায় সেই আক্রমণ সফল হইয়াছিল। ডাক্তার ওয়াডেল এই আক্রমণের একটি বিবরণ Asiatic Quaterly Reviewতে প্রকাশিত করেন।

পূর্ব্ব লিখিত সন্ধানকারীদিগের ও আধুনিক ঐতিহাসিকবর্গের বাক্য একত্রিত করিলে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হই।

সম্রাট হর্ষের সময় চীনের সহিত ভারতের সখ্যতা ছিল এবং তজ্জন্যই চীন ও ভারতের মধ্যে গতায়াত চলিত। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন একবার চীন সম্রাট সমীপে কোন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। এই ব্রাহ্মণ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট প্রেরিত দূত সহ সম্রাট হর্ষের পত্রের উত্তর লইয়া আগমন করেন। এই চীন দূত ভারতে বহুকাল যাপন করিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাগমন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে ওয়াং-হিয়েল-শি চীন-সম্রাট প্রেরিত হইয়া ৩০ জন অশ্বারোহী সহ ভারতের সম্রাট হর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি মগধে আসিতে না আসিতেই সম্রাট ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন (৬৪৮ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতি ভীষণ। চারিদিকেই প্রবলের হুঙ্কার, চারিদিকেই দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ।

অর্জ্জুন নামে হর্ষবর্দ্ধনের একজন মন্ত্রী অবিলম্বে প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিলেন। যখন চীন দূত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন তখন অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে শত্রুবৎ গ্রহণ করিলেন। ওয়াং-হিয়েনশির শরীর রক্ষকবর্গ নিহত হইল ও তাহাদের বাহিত ধনাদি লুণ্ঠিত হইল। তিনি কতিপয় সহযোগী সহ সৌভাগ্য ক্রমে রাত্রিযোগে নেপালে পলায়ন করিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ তিব্বত রাজের গোচর হইল। তিব্বত রাজ স্রোং-সান-গ্যাম্পো চীনরাজ জামাতা ছিলেন। তিনি চীনরাজ দূতকে উদ্ধার করিলেন ও প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী প্রদান

করিলেন। নেপাল রাজদূত ও তাঁহাকে সপ্ত সহস্র সৈন্য দান করিলেন। এই সৈন্য লইয়া চীনরাজ দূত ওয়াং-হিয়েন-শি ভারতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ও তিন দিবস যাবৎ তীরহুত (তীরভুক্তি) অবরোধ করিলেন। তথাকার দুর্গের তিন সহস্র রক্ষী মৃত্যু মুখে পতিত হইল এবং দশ সহস্র লোক গণ্ডকনদ সলিলে লুপ্ত হইল। অর্জ্জুন পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এবারও হিন্দু সৈন্য পরাজিত হইল এবং দ্বাদশ সহস্র রাজপুরবাসী বন্দী হইয়া চীনে নীত হইলেন। কিন্তু চীনরাজ দয়া পরবশ হইয়া অর্জ্জুনকে পুনঃ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অর্জ্জুনও আপনাকে চীন সম্রাটের অধীন সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন।*

এই অর্জ্জুনকে চীন ভাষায় "অ-লো-না-সোয়েন" বা "ওলো-না-সোয়েন" বলিত।†

চৈনীক ঐতিহাসিক বর্গ বলেন,—"এই যুদ্ধ সমস্ত ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে ৫৮০টি সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর শত্রুপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল, আসাম ও পূর্ব্বভারতের (কামরূপ) রাজা চীন রাজদূতকে কর প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

ডাক্তার ওয়াডেল বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে চীন রাজ দূতই মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। যদি চীনসেনার হস্তে মগধ ধ্বংস না হইত, তাহা হইলে আজ ভারতের অবস্থা হয়ত অন্যরূপ হইত। অর্জ্জুন যদি চীনরাজদূতের লাঞ্ছনা না করিতেন তাহা হইলে বিক্রমাদিত্য সমুদ্রগুপ্তের ও হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সিংহাসনে মোগল বাদসাহগণ উপবেশন করিতে পারিতেন না।

এই চীন অভিযানের পূর্ব্বেও ভারতে আর একবার চৈনিক আক্রমণ হয়।

৯০—১০০ খ্রীঃ মধ্যে চীনে "উইচি" নামক একজন ভূবন বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে কাশী পর্য্যন্ত ভারতে রাজ্য বিস্তৃত করেন।

---

* See Vincent A. Smith's *Early History of India.*

† I bid P. 302.

এই ভারত আক্রমণের বিষয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, —" * * Yuechi's dominion was gradually extended (90-100 A. D.) all over North Western India, with the exception of Southern Sind, probably as far as Benares. The conquered Indian Provinces were administered by military viceroys, to whom apparently should be attributed the large issue of coins known to numistmatists as those of the Namders King. These pieces,mostly copper,but including a few in base silver are certainly contemporary with Kadphises II (officer to adminster the Indian territory), and are extremely common all over Northern India from the Kabul valley to Benares and Gazipur on the Ganges.*

এই উইচির ভারত আক্রমণ ভারত রাজ্য ও রোম রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রচলিত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীতারানাথ রায়!

See Vincent A. Smith's *Early History oj India.*

চিত্র।

১

সবে নব যৌবনের মধুর আবেশে
ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন;
আধ ফোটা ওষ্ঠাধরে সরাইয়া কেশে
এঁকেছিনু একটি চুম্বন।
সেইটুকু সঙ্গোপনে তুলিতে চতুর
তুলেছিনু সুখে চিত্র-পটে;—
আজি তাই যৌবনের প্রমাণ প্রচুর,
এল জরা যদিও নিকটে!

২

শুষ্ক-দল মধুহীন হেরি' বাসি ফুল
কলি-ভাব নাহি পড়ে মনে,
যবে সে সৌরভে মোরে করিত আকুল
বৃন্ত-পরে ফুটি ফুল-বনে।
গৃহিণী করেছে গ্রাস প্রেমিকার লাজ,
চন্দ্র-করে গোপন মিলন;
কবিতার ছত্রে শুধু সঞ্জীবিত আজ
প্রণয়ের চিত্র পুরাতন।

৩

গেছে সব প্রেম-খেলা যৌবনের সনে
যায় যথা জোয়ারের জল;
আছে মাত্র নিশিদিন কলহ দু'জনে,
পদে পদে অভিমানছল!
একি তব নিন্দা-কথা করিনু প্রচার?
যাও তাই বাঁকাইয়া গ্রীবা?
রূপ পুষ্প উপচিয়া হৃদয়ে তোমার
ফলরূপে উদিয়াছে কিবা?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সংগ্রহ।

ধূমপান।

তাম্রকূট সেবনের অপকারিতার কথা লইয়া বৈজ্ঞানিকমহলে অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে অনেকে নানারূপ স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হয়েন, ইহাই অনেকের ধারণা। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণও প্রায় এই মতের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, তামাকে নিকটিন (nicotine) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে; উহা মানব-শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ফলেই তামাকের ধূমপায়ীদিগের বুক ধড়্‌ফড়ানি (Palpitation), স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ঐকমত্য জন্মে নাই। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া যে কত সন্দর্ভই লিখিত হইতেছে,—তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সম্প্রতি বিলাতের একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় ধূমপানসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ পাইতেছে। এ দেশে 'গুড়ুক খোরের' অভাব নাই, চুরুট, 'বাদসাই' প্রভৃতিও এ দেশে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেছে,—তাহার উপর 'খৈনী', 'পানে তামাক' নস্য প্রভৃতি ত আছেই,—সুতরাং, তামাকের এই বৈজ্ঞানিক কথা জনসমাজের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে, এবং হয় ত কচিৎ কাহারও উপকারে আসিবে এই ভরসায় আমরা নিম্নে সেই সন্দর্ভের সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

অধ্যাপকের পরীক্ষা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্থির করেন যে, ধূমপানের ফলে জরা শীঘ্র মানব শরীরকে আক্রমণ করে। মানুষ বৃদ্ধ হইলে শরীরের শিরাসকল যেরূপ অবনত হইয়া পড়ে,—ধূমপানে শিরার সেই অবনতি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি করে। সুতরাং, ধূমপানের ফল আয়ুক্ষয়। যে দুইজন নামজাদা অধ্যাপক এই তথ্য সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন চুরুটসেবী,—আর একজন চুরুটবিদ্বেষী; যিনি ধূমপানে অভ্যস্ত তাহার নাম অধ্যাপক মেণ্ডেল। তিনি বলেন, তাম্রকূট আয়ুর্নাশ করে সত্য, কিন্তু তিনি এই সদ্যসন্তাপহারিণী, সদ্যশান্তিপ্রদায়িনী তাম্রকূটরূপিণী নায়িকার প্রেমের নিগড় ভগ্ন করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বলেন যে, এই দুঃখজ্বালাময় সংসারে ত্বরিতানন্দদায়িনী তামাকুসুন্দরীর প্রেমের দায়ে কিছুদিন পূর্ব্বে কালভবনে যাওয়াও ভাল, তথাপি তাহার বিরহ-ব্যথা ভোগ করা ভাল নহে। অধ্যাপক ভনলিভেনন তামাকের সহিত কোন সংশ্রবই রাখেন নাই। সুতরাং, তিনি অধ্যাপক মেণ্ডেল অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিবেন, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশালতা সফলা হইয়াছিল। অধ্যাপক মেণ্ডেল তাঁহার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

তাহার পর কথা উঠিল, তামাকের ধূমপানে যদি শিরায় কোনও বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে মানবের শিরা পরীক্ষায় নিশ্চয়ই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সম্প্রতি মিশরের মামী

পরীক্ষায় সন্দেহ।

বা রক্ষিত শব পরীক্ষার দ্বারা এই বিষয়ে অনেক বিস্ময়জনক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার রাফার নামক একজন ইংরাজ রোগ-নিদানবিৎ পণ্ডিত সম্প্রতি মিশর হইতে কতকগুলি পুরাতন শবের শিরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যেসকল শব হইতে ঐ শিরাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৬০০অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের। অর্থাৎ যে সকল লোকের শব হইতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহারা আড়াই হাজার হইতে সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। এই পরীক্ষার ফল তিনি গত বৎসর ইংলণ্ডের Journal of Pathology and Bacteriology নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তিনি অনুসন্ধানে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে মানবের শিরায় যেরূপ অনুপাতে অবনতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, প্রাচীন মিশরীয় মানবের শিরায় ঠিক সেইরূপ অনুপাতে অবনতির চিহ্ন দেখা যায়। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে যে সমস্ত স্নায়বিক অবনতি ও ক্ষয় সংঘটিত হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—তাহার লক্ষণ যে অনুপাতে এখনকার মানবদেহে সপ্রকাশ,—তখনকার মানবদেহেও উহা সেই অনুপাতে সপ্রকাশ। ইহাতেই মনে হয়, প্রাচীন মিশরে বর্ত্তমান সময়ের মতই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রবল ছিল। কিন্তু প্রাচীন মিশরের লোক তাম্রকূট সেবন করিত না,—এবং অতি অল্প মাত্রায়ই মদ্য প্রভৃতি পান করিত। তখন জীবন-সংগ্রামেও এত তীব্রতা ছিল না। ডাক্তার রাফার এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, তামাকের প্রভাবেই যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, তাহার প্রমাণাভাব।

এ কথা সত্য যে, অনেকে ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়াও স্নায়ুমণ্ডল অক্ষুন্ন রাখিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করেন। কিছুদিনপূর্ব্বে একখানি চিকিৎসা-সম্পর্কিত পত্রিকায়

ধূমপায়ীর দীর্ঘজীবন।

প্রকাশ পায় যে, মার্কিণের রিচমণ্ড নিবাসী জনৈক নিগ্রো এক শত পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল। এই প্রকার দীর্ঘজীবীর কথা সকল ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, এইরূপ দীর্ঘজীবী ব্যক্তিরা তাহাদের জন্মসময় বিস্মৃত হয়, অথবা তাহারা তাহাদের জন্মসময় কস্মিনকালে জানে না, সুতরাং তাহারা অজ্ঞতানিবন্ধন তাহাদের বয়স অধিক করিয়া বলে। কিন্তু এই নিগ্রোটির দৃষ্টান্ত সেরূপ নহে। তাহার বয়স যে শতাধিক হইয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই। সে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে ধূমপানে ও শেষ পঁচাত্তর বৎসর 'দোক্তা' খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহাকে যিনি চিকিৎসা করেন তিনি বলেন, সে যদি ঐরূপ তামাকের নেশায় অভ্যস্ত না হইত, তাহা হইলে আরও দীর্ঘজীবী হইত। ধূমপায়ীর এরূপ দীর্ঘ জীবনের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। যাহারা বাল্যকাল হইতে তাম্রকূটের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অশীতি বা নবতিবর্ষ কাল জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

সম্ভবতঃ ধূমপান সকলের সহ্য হয় না। অতি অল্পেই অনেকে ধূমপানের অপকারি-

তায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোকেরা তাম্রকূটসেবনে বুক ধড়ফড়ানি, স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগে অতি শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। 'তামাকে বুক'ওয়ালারা বড় কষ্ট পায়। ইহাদের হয় ত রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে না, কিন্তু অন্য রোগে ইহারা ভুগিয়া থাকে। এই প্রকার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হয়। কতকগুলি লোকের অল্প তামাক খাওয়া সহ্য হয়, কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহারা আর উহা সহ্য করিতে পারে না। কাহার কি পরিমাণ তামাক খাওয়া সহ্য হইবে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত ভাবের উপর নির্ভর করে। কোন কোন ব্যক্তির বদনে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আধিক্য লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মুখে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাহারও 'আলজিব' অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। এই শ্রেণীর লোকের তাম্রকূট সেবন পরিত্যাগ করাই ভাল। অন্ততঃ ইহাদের এ বিষয়ে কতকটা সংযত হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্তিভেদে ফলভেদ।

আরও কোন কোন অবস্থায় তামাক লোকের পক্ষে অপকারী হইয়া থাকে। চুরুটে ছিদ্র, চুরুটের পাইপে ময়লা, হুকায় ও গড়গড়ায় 'কাইট' জন্মিলে তাহার জন্য তামাকে অপকার হয়। চুরুটের বহিরাবরণটি বেশ অক্ষুণ্ণ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত। কিন্তু চুরুটটি বেশ টানা যাইতেছে, ইহা দেখিলে কেহ বড় একটা সে দিকে লক্ষ্য করেন না।

রোগোৎপাদনে তাম্রকূট কি পরিমাণে সহায়তা করে, তাহা এখনও নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। যাহারা তামাক সেবনের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা তামাকের অপকারিতাটা অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই সকলকেই তামাক খাইতে নিষেধ করেন। উহা ঠিক নহে। তামাক সেবার পর যাহাদের চাঞ্চল্য জন্মে, যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের তামাক খাওয়া উচিত নহে। তামাক খাইলে যাহাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দূর হয়, যাহারা তামাকের নেশায় বেশ একটু সান্দ্রানন্দ উপভোগ করে, তাহাদেরই তামাক খাওয়া উচিত। পরিশ্রমে লোক অল্পায়ু হয় না। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, প্রভৃতিই অকালে জরা ও বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।

কে ধূমপান করিবে।

তাম্রকূট সেবন যে অপকারী তাহা যেন সহজেই মনে হয়। তবে সকলের পক্ষেই যে উহা অপকারী তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে যে প্রকার হুকায় ও গড়গড়ায় তামাক খাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক ভাল। উহাতে হুকার জলে অনেক নিকটিন মিশিয়া যায়। কিন্তু হুকা প্রভৃতির জল ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করা উচিত। কারণ জলে কিয়ৎপরিমাণ নিকটিন মিশিলে আর সেই জল নিকটিন গ্রহণ করিতে পারে না। হুকা গড়গড়া ও ফর্সি প্রভৃতির নলিচা পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক। শুল্ফ্ অপেক্ষা তাওয়ার তামাক খাওয়া ভাল।

মন্তব্য।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

অষ্টম অধ্যায়।

(ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক ভার্সেলিস প্রাসাদ আক্রমণ)

কৃষক ও শ্রমজীবিগণের কর্ম্মত্যাগ, রাজকোষের শোচনীয় অবস্থানিবন্ধন বেতন ও বৃত্তিভোগিগণের অর্থাভাব, অজন্মা ইত্যাদি কারণ পরম্পরায় দুর্ভিক্ষ পুনর্ব্বার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফরাসী দেশে উপস্থিত হইল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি জঠর-যন্ত্রনায় প্রপীড়িত হইয়া "হা অন্ন হা অন্ন" রবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি অনশনক্লেশে যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট হইয়া অহর্নিশি উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্তিমানসে রুটি বিক্রেতাদিগের বিপণিসন্নিধানে দলবদ্ধ হইয়া বিকট রবে চীৎকার আরম্ভ করিল। ক্ষুৎপীড়িত মানবগণের চলচ্চিত্ততা দৃষ্টে চক্রান্তকারিগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অশেষবিধ ভিত্তিহীন জনরব প্রচারে জনসাধারণের মন উত্তেজিত করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষগণের ইঙ্গিতক্রমে কৃষকগণ অপক্ক শস্য নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে; রুটি বিক্রেতারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া অলসতায় কালক্ষেপণ করিতেছে। সেইজন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, সেইজন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে ইত্যাদি প্রকার জনরব শ্রবণে অনভিজ্ঞ ইতর সাধারণ পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ফরাসীরাজ বিপদাশঙ্কা করিয়া রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভার্সেলিস নগরের সৈন্যবলবৃদ্ধি করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার অভিসন্ধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া জন সাধারণ ঘোরতর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ফরাসী জাতিকে পদদলিত করিবার নিমিত্ত সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়াছেন; অচিরে তিনি সসৈন্যে প্যারিস আক্রমণ করিবেন; সেনাপতি বৌলির সাহায্যে তিনি জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যদৃচ্ছ শাসনের প্রতিষ্ঠা করিবেন—রাজপথে, প্রতি গৃহে এবং প্রকাশ্য স্থানে অহরহ এইরূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

কতিপয় ব্যক্তি ষোড়শ লুইকে পদচ্যুত করিয়া ডিউক ডি অর্লিয়নকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ডিউক প্রবরও

বুর্বন বংশসম্ভূত, সম্বন্ধে ষোড়শ লুইই জ্ঞাতি। ইতর সাধারণ প্রাগুক্তরূপে উত্তেজিত হইলে, ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদিগকে ভার্সেলিস রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, প্রাসাদ আক্রান্ত হইলেই, রাজা সপরিবারে পলায়ন করিবেন, তাহা হইলে শূন্য সিংহাসনে অবাধে ডিউকপ্রবর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

রাজমন্ত্রিদল ষড়যন্ত্রসংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে নিবেদন করিলেন। আসন্ন বিপদে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের নিমিত্ত রাজসভার অধিবেশন হইল। তথায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, ভার্সেলিস প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজার সপরিবারে স্থানান্তরে গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফরাসীরাজ ঈদৃশ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষড়যন্ত্রকারিগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে ষড়যন্ত্রকারিগণ সাতিশয় উদ্যমসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা সপরিবারে পলায়নের নিমিত্ত এবং জাতীয় সমিতির ধ্বংস-সাধনকল্পে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এইরূপ জনরব 'মনিটর' নামক সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল। অচিরে প্যারিস নগরে হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীরাজ প্রাগুক্ত জনরবের ভিত্তিহীনতা প্রতিপাদন না করিয়া বরং একটি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়া বসিলেন। তিনি রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষার্থে ইতঃপূর্ব্বে ভার্সেলিস নগরে যে সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই নবাগত সৈনিকদলের নেতৃগণকে অন্যান্য দলের নেতৃগণ নগরের রঙ্গালয়ে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অসাধারণ আড়ম্বর হইল। রাজা, রাজ্ঞী, রাজপুত্র এবং উচ্চবংশীয়া রমণীমণ্ডলী উৎসব দর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপরিবারবর্গকে দেখিয়া সৈনিকগণের হৃদয়ে রাজভক্তির উদয় হইল। তাহারা পুনঃ পুনঃ রাজপরিবারবর্গের মঙ্গলসূচক নিনাদে রঙ্গালয় নিনাদিত করিতে লাগিল। বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরাসিরাজ এ যাবৎ অকৃত্রিম রাজভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। অদ্য অকস্মাৎ সৈনিকমণ্ডলীর সহৃদয়তা দর্শনে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি মনে করিলেন বুঝি এতদিন পরে তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। কিন্তু সৈন্যগণের রাজ-

ভক্তি হইতে যে সমগ্র দেশে বিপ্লবানল প্রজ্জলিত হইবে,—অমৃত হইতে যে হলাহলের উৎপত্তি হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

প্রাগুক্ত প্রীতিভোজনপ্রসঙ্গ অতিরঞ্জিত আকারে প্যারিস নগরে প্রচারিত হইলে প্রজ্জলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। প্যালে রয়ালভবনে রাজনীতিক সভাসমিতিসমূহে প্রতি গৃহে প্রতি স্থানে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। রাজভক্ত সৈন্যগণ স্পর্দ্ধাসহকারে জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা পদদলিত করিয়া জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনে প্রতিশ্রুত হইয়াছে; তাহাদের হস্ত হইতে প্যারিসবাসীদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট ইত্যাদি প্রকার জনরব নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শত সহস্র ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সহসা যেন ঘোর ভূকম্পনে সমগ্র নগর আলোড়িত হইল।

অনন্তর ৫ই অক্টোবর তারিখে প্যারিস নগরে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইল। জনৈক ইতরবংশীয়া রমণী উচ্চকণ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। তৎপশ্চাৎ সংখ্যাতীত বালক ও রমণী চলিল। তাহারা হোটেল ডি ভিলা হইতে অস্ত্রপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়া বিপদ ঘোষণা ঘণ্টাধ্বনি করিল। সেই নিনাদ শ্রবণমাত্র শত সহস্র অস্ত্রধারী ঊর্দ্ধশ্বাসে হোটেল ডি ভিলা সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। ডিউক ডি আর্লিয়নের গুপ্তচরগণ অস্ত্রধারী মানবগণকে ভার্সেলিস রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদানকল্পে তথায় কতকগুলি সুরাপানামত্ত, স্খলিতচরিত্র নরনারী প্রেরণ করিল। তাহারা অস্ত্রধারিগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া "ভার্সেলিস" "ভার্সেলিস" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া অস্ত্রধারিদল ভার্সেলিসাভিমুখে যাত্রা করিল।

ভার্সেলিস নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। ফরাসিরাজের সহিত সভ্যগণের সংঘর্ষণের উপক্রম হইয়াছে। সমিতি "ব্যক্তিগণের অধিকার" প্রসঙ্গীয় যে ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, রাজা তাহার অনুমোদন করেন নাই; রাজ্ঞী সৈনিকগণের প্রীতিভোজন উপলক্ষে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; রাজপারিষদবর্গ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাজা জাতীয় সমিতি সমভিব্যাহারে টাওয়ার অথবা মেজ নগরে গমন করিবেন ইত্যাদি কারণ পরম্পরায় সমিতির সভ্যগণ রাজপরিবারবর্গের প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে যে ঘোরতর বিদ্রোহানল

প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা রাজা অথবা সভ্যগণ কেহই অবগত নহেন। রাজা বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে গমন করিয়াছেন। রাজ্ঞী একাকিনী ত্রিয়ানন উদ্যানের সুরম্য উপবনে উপবিষ্টা। আজ সেই সুবর্ণদ্যুতি "প্রভাতী তারা" * ক্ষীণদ্যুতি খদ্যোতিকা অপেক্ষা বিবর্ণা। সেই অনিন্দ্য বদনেন্দু নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। রাজ্ঞী রাজার সহিত বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপরিণামদর্শিতানিবন্ধন ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে দৃষ্টি করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিবেন? তিনি অষ্ট্রীয়া সম্রাটের দুহিতা এবং ফরাসী রাজ্যের মহারাণী হইয়াও অদ্য হইতে ভিখারিণী! তাঁহার ইন্দ্রতুল্য পতি অদ্য দানবদল পরিবেষ্টিত। কুগ্রহনিবন্ধন কোন্ মুহুর্ত্তে কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তিনি সেই চিন্তায় ম্রিয়মাণা হইয়া অহোরাত্র পতি ও পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু অদ্যই যে ঘোরতর বিপত্তি উপস্থিত হইবে, অদ্য হইতে তাঁহার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা আশাভরসা সমস্তই অন্তর্হিত হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পরেন নাই। তিনি ত্রিয়ানন উদ্যানে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্না। অকস্মাৎ পার্শ্বস্থ রাজপথে কোলাহল শ্রুত হইল। রাজ্ঞী কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া চকিতা হরিণীর ন্যায় উদ্যান হইতে প্রাসাদে পলায়ন করিলেন। রাজা মৃগয়ান্তে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ কোলাহল শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া রাজভবনে আগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ দ্বারগুলি সমস্তই রুদ্ধ; রাজ-সৈন্যগণ প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গণের বহির্দ্দেশে লক্ষাধিক অস্ত্রধারী; তৎসমভিব্যাহারে "ডাকিনী যোগিনী সমা" সংখ্যাতীত ভীমাকৃতি রমণী দণ্ডায়মান। সেই লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতা, সুরাপানোন্মত্তা, বামাকুলের আকৃতিপ্রকৃতি ভাবভঙ্গী ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টি করিলে সমগ্র নারীজাতির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহারা প্রাসাদ-সমক্ষে দাঁড়াইয়া

* "I saw her just above the horizon—glittering like the morning star"—Burke.

উচ্চৈস্বরে খাদ্য সামগ্রী প্রার্থনা করিতেছে, কেহ কেহ বা রাজপরিবারবর্গের প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিতেছে। ফরাসিরাজ উপস্থিত বিপদ দৃষ্টে স্তম্ভিত হইলেন।

ইতর সাধারণের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে রাজভবনস্থ মন্ত্রণাদাতৃগণ রাজপরিবারবর্গের পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রাজা কোনও ক্রমে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, ডিউক ডি অর্লিয়নের ষড়যন্ত্রই উপস্থিত বিদ্রোহের কারণ। তিনি পলায়ন করিলেই তৎক্ষণাৎ ডিউক সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবেন। বিদ্রোহিগণ ষড়যন্ত্রকারীদিগের উত্তেজনায় অস্ত্রধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা ষড়যন্ত্রকারীদিগের অভিসন্ধি অবগত নহে। তাহারা শুনিয়াছে যে, ভার্সেলিস প্রাসাদ আক্রমণ করিলেই তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর অভাব মোচন হইবে। সেইজন্য তাহারা সশস্ত্রে ভার্সেলিসে আগমন করিয়াছে। ফরাসিরাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন কি ডিউক প্রতিষ্ঠিত হইবেন তৎসম্বন্ধে তাহারা বিন্দুবিসর্গ অবগত নহে।

অস্ত্রধারী ইতর সাধারণ অনতিবিলম্বে প্রসাদাভিমুখে গমন করিল। রাজা তাহাদের প্রাসাদে প্রবেশকালে বাধাবিঘ্ন প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা অবাধে দলে দলে প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল। রাজা ও রাজ্ঞী তাহাদিগকে এরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন যে, তাহারা বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে করিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কিন্তু ইতর সাধারণ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও রাজপরিবারবর্গের আশঙ্কা দুরীভূত হইল না; কারণ, তাহারা প্রসাদের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই সুরাপানোন্মত্তা রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজপরিবারবর্গের প্রতি কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অচিরে প্রাসাদ আক্রান্ত হইবে বুঝিতে কাহারও বিলম্বন হইল না। ফরাসিরাজ পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত দুইখানি শকট প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাণী রাজাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এরূপ বিপৎকালে আমি কোন ক্রমে রাজসঙ্গ ত্যাগ করিব না। আমি জানি, বিদ্রোহিগণের হস্তে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু আমি মেরিয়া

থেরেসার কন্যা, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।" রাজভবনস্থ মন্ত্রণাদাতৃগণ অস্ত্রধারীদিগের প্রতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ দানের নিমিত্ত রাজাকে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সহিত বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক বিদ্যমান থাকায় সে যুক্তি খাটিল না। রাজা বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনাদের কথা শুনিয়া আমি কি স্ত্রীজাতির সহিত যুদ্ধ করিব?"

এদিকে ইতর সাধারণ রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত ভার্সেলিস যাত্রা করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণে সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইটি রাজপরিবার-বর্গের রক্ষার্থে জাতীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে প্যারিস হইতে শশব্যস্তে ভার্সেলিস যাত্রা করিয়াছিলেন। ল্যাফাইটি ভার্সেলিসে পৌঁছিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজভবনে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমি আমার সৈন্যগণের প্রশান্তভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। তাহারা নিশ্চয়ই শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। আপনারা তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না"। এই বলিয়া তিনি প্রসাদ হইতে কিয়দ্দূরে নোয়ালি নামক ভবনে বিশ্রামের নিমিত্ত গমন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী ল্যাফাইটির বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। রাজ্ঞী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অচিরে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এ দিকে বিদ্রোহিদলের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত ল্যাফাইটির অধীনস্থ জাতীয় সৈন্যগণ প্রসাদের বহির্দ্দেশ সংরক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে; রাজার শরীররক্ষক সান্ত্রিগণ প্রাসাদপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। ফলতঃ রাজভবন সংরক্ষণের নিমিত্ত যদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, সাধ্যানুসারে তাহার ক্রুটি হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ল্যাফাইটি কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশান্তে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। যদি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিপ্লবসম্ভূত জাতীয় সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিদ্রোহিদলের সহিত যোগদান করে, তাহা হইলে রাজপরিবারবর্গ কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন তৎসম্বন্ধে কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না। রাত্রি তিন ঘটিকা হইতে প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব ঘটিল না বটে; কিন্তু অস্ত্রধারী ইতর সাধারণের ভাবভঙ্গি ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, ঝটিকারম্ভের আর বিলম্ব নাই। রাজপথে বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি নরনারী ভিন্ন ভিন্ন দলে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে ও বৈপ্লবিক সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়াছে। এক স্থানে তাহারা একটি অশ্বারোহী সৈনিকের শবদেহোপরি উপবেশন করিয়া

একটি মৃত অশ্ব দগ্ধ করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেছে; তাহাদের চতুঃ-পার্শ্বে কতকগুলি মাংসলোভী পুরুষ ও রমণী বিকট হাস্য করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঈদৃশ বিভৎস ব্যাপার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্ব-লক্ষণ ভিন্ন কিছুই নহে।

প্রত্যুষে ছয় ঘটিকা কালে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারী ভৈরব রবে দিগদিগন্ত নিনাদিত করিতে করিতে সেনানিবাস আক্রমণ করিল। সেনানিবাসে অত্যল্প সংখ্যক শরীররক্ষক প্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু আক্রমণকারীরা তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া পঞ্চদশ ব্যক্তিকে বন্দী করিল। ভার্সেলিস রঙ্গালয়ে প্রীতিভোজনের পর হইতে রাজার শরীররক্ষকগণের প্রতি ইতর সাধারণের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়া-ছিল। সুতরাং বন্দীরা আক্রমণকারীদলের হস্তে পতিত হওয়ায় তাহাদের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। সেনানিবাস আক্রমণকালে ঘটনাক্রমে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের একটি দ্বার মুক্ত ছিল। সেই দ্বার দিয়া একদল অস্ত্রধারী প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া সোপানপথে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। সোপানের উপরিভাগে দুইজন বন্দুকধারী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা আগন্তুকগণের প্রতি মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল, সুতরাং ক্ষণ-কাল যাবৎ আক্রমণকারীরা আদৌ অগ্রসর হইতে পারিল না। এই সুযোগে রাজ্ঞী স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে রাজপ্রকোষ্ঠে পলায়ন করিলেন। তথায় রাজাকে না দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতা হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজা ঘোর কোলাহল ও পুনঃ পুনঃ অগ্নিবর্ষণের শব্দে চমকিত হইয়া দ্বারান্তর দিয়া রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় শরীররক্ষক সান্ত্রিগণ রহিয়াছে, কিন্তু রাজ্ঞী নাই। রাজপুত্র রাজকন্যা ও রাজভগিনী গৃহান্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপৎসমাগমে দ্রুতবেগে রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে আসিয়া রাজার সহিত একত্রিত হইলেন। রাজ্ঞীকে তথায় না দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া রাজপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় রাজ্ঞী উদ্বিগ্ন চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সমগ্র পরিবার সম্মিলত দেখিয়া তাঁহার চিন্তা দূর হইল।

সোপানের উপরিভাগে যে দুইজন বন্দুকধারী আগন্তুকগণের আগমন-নিবারণকল্পে পুনঃ পুনঃ অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, তাহারা অচিরে শত্রুগণের

হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সুতরাং বাধাবিঘ্ন না পাইয়া আক্রমণকারীরা বন্দুক তরবারি বল্লম প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে ধাবমান হইল। কিন্তু তথায় পৌঁছিবামাত্র রাজার শরীররক্ষক বন্দুকধারীদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শরীররক্ষকগণ রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারীরা রাজপ্রকোষ্ঠের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজপরিবারবর্গ এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে; কিন্তু আগন্তুকগণ প্রাসাদের অন্যান্য স্থান পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না। যে অপূর্ব্ব প্রাসাদ বহুশতাব্দী হইতে সমগ্র য়ুরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছিল অদ্য তাহা ইতরের কৌতুহল তৃপ্তি করিল।

প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমন করতঃ আক্রমণকারীরা পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে প্রাসাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া গবাক্ষদ্বারসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজ্ঞী অকুতোভয়ে অলিন্দপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের নিকট হইতে বন্দী পঞ্চদশ জনের জীবন ভিক্ষা করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিদ্রোহিদল রাজ্ঞীকে গবাক্ষ সন্নিধানে আসিতে বলিল। রাজ্ঞী নির্ভয়ে পুত্রকন্যাসহ গবাক্ষসন্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা বলিল, "পুত্রকন্যা স্থানান্তরে রাখিয়া আপনি একাকিনী আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইবেন।" তাহা শুনিয়া রাণী পুত্রকন্যা স্থানান্তরে রাখিয়া আসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর নির্ভীকতা দৃষ্টে ইতর সাধারণের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা বৈরিভাব পরিহার করিয়া সহস্রকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রাজ্ঞীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

আক্রমণকারিগণের প্রাসাদ-প্রবেশ-কালে, ল্যাফাইটের অধীনস্থ জাতীয় সৈন্যগণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিল। যদি তাহারা সেনাপতিপ্রবরের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক রাজভবন সংরক্ষণে যত্নবান হইত, তাহা হইলে ইতর সাধারণ রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারিত না। ল্যাফাইট নোয়ালি ভবনে প্রাসাদ আক্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে প্রাসাদসান্নিধ্যে আগমন করিলেন। জাতীয় সৈন্যগণের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি তাহাদিগের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সৈন্যগণ লজ্জিত হইয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে বন্দী পঞ্চদশ জনের উদ্ধার সাধন করিল।

ফরাসিরাজ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না; সুতরাং ষড়যন্ত্র-কারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; ডিউক ডি অর্লিয়ন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু সাধারণতন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষকগণ মনে করিলেন, রাজাকে প্যারিস নগরে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আয়ত্বাধীন থাকিবেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা ইতর সাধারণকে তদনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই আক্রমণকারিগণ রাজাকে প্যারিস নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ল্যাফাইটি মনে করিলেন, ফরাসিরাজ প্যারিস নগরে গমন করিলে বিনারক্তপাতে শান্তি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য তিনি রাজা ও রাজ্ঞীকে ইতর সাধারণের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন ফরাসিরাজ প্রাসাদের অলিন্দপ্রদেশে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"সন্ততিগণ, তোমাদের ইচ্ছানুক্রমে আমি প্যারিস নগরে যাইতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আমি একাকী যাইব না, সপরিবারে যাইব। আর একটি কথা, আমার শরীর-রক্ষকগণ সঙ্গে থাকিবে। তাহাদের প্রতি তোমরা কোন অত্যাচার করিও না।"

ইতর সাধারণ রাজার বাক্য শুনিয়া, "রাজা দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা প্যারিস নগরে গমন করিতে-ছেন শুনিয়া জাতীয় সমিতি প্যারিস নগরে সমিতির অধিবেশন হইবে, এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রচার করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। ফরাসিরাজ সপরিবারে প্যারিস যাত্রা করিলেন। রাজভবন সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া যে দুইজন প্রহরীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদের ছিন্ন মস্তক লইয়া দুই ব্যক্তি রাজশকটের অগ্রবর্ত্তী হইল। জাতীয় সমিতির শতাধিক সভ্য রাজা ও রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। যে শরীররক্ষকগণ অদ্ভুত বীরত্ব সহকারে রাজপরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা রাজা ও রাজ্ঞীকে বন্দিদশাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বিরস-বদনে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। জাতীয় সৈন্যগণ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী ইতর সাধারণ কামান-শকট টানিতে টানিতে চলিল। কামান-শকটের উপরিভাগে নিকৃষ্টা প্রকৃতি রমণীগণ তরবারি ও বল্লম হস্তে উপবিষ্টা। ক্ষণে ক্ষণে সেই লজ্জাভয়-

বিরহিতা বামাকুল সুরাপানে ও বৈপ্লাবিক সঙ্গীতে উন্মত্ত হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ইতরপ্রকৃতি মানবগণ দিগদিগন্ত নিনাদিত করিয়া জয়োল্লাস করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারবর্গের প্রতি অশ্রাব্য গালিবর্ষণে ক্রুটি হইল না। এইরূপে সাত ঘণ্টাকাল যৎপরোনাস্তি ঘৃণা লজ্জা ও অবমাননা সহ্য করিয়া ফরাসিরাজ সপরিবারে প্যারিস নগরে পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি টুইলারি নিকেতনে গমন করিলেন। সেই জগদ্বিখ্যাত প্রাসাদ অদ্য হইতে রাজপরিবারের কারাগৃহে পরিণত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।



K. V. Seyne & Bros.

'মেঘদূতে'র সমস্যাপূরণ।*

আমাদের গীর্ব্বাণ-বাণী ভাষা-জগতে অতুলনীয়া। এই সংস্কৃত ভাষায় যে কত প্রকারের কত গ্রন্থ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় যত পুস্তক আছে, বোধ করি, পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় তত গ্রন্থ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না।" †

মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও এখনও বহু পুস্তক অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে তালপত্রাদিতে লিখিত কত প্রাচীন গ্রন্থ যে কীটদষ্ট অবস্থায় বিলোপোন্মুখ হইতেছে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? জর্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে তত্তদ্দেশীয় মনীষিগণের অসীম উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে শত শত প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ নীত হইতেছে। আর আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে সকলের কোনও সন্ধান রাখি না, অথবা সন্ধান রাখিলেও তাহাদের উদ্ধারের ও প্রচারের জন্য কোনও চেষ্টা করি না।

দেশের এইরূপ দুর্দ্দশার সময়ে কোনও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত দেখিলে চিত্তে স্বতঃই আনন্দ উপস্থিত হয়। অদ্য আপনাদিগকে একখানি চিত্তচমৎকারক অশ্রুতপূর্ব্ব কাব্যের পরিচয় প্রদান করিব। গ্রন্থখানির নাম,—'পার্শ্বাভ্যুদয়ম্'। মদীয় পরম বন্ধু, কাশী জৈনধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন, অল্পদিন হইল, শেঠ শ্রীযুক্ত নাথারঙ্গ গান্ধীর অর্থানুকূল্যে এই কাব্যখানি টীকার সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রকাশক অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বিতীয় আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া এই মুদ্রিত পুস্তকে স্থানে স্থানে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বারাণসী সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

† 'বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রৌপদী (দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

সংক্ষেপে কাব্য-রচনার অবতরণিকা প্রদর্শন করিয়া কাব্যের কয়েকটি শ্লোক আপনাদিগকে উপহার দিব।

পুরাকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত পৌদনপুরে অরবিন্দ নামক এক নৃপতি রাজ্যশাসন করিতেন। বিশ্বভূতি নামক এক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র এই রাজার মন্ত্রি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম কমঠ, কনিষ্ঠের নাম মরুভূতি।

রাজা অরবিন্দ বজ্রবীর্য্য নামক কোনও দুর্জ্জয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। সেই সঙ্গে রাজার আদেশে মন্ত্রী মরুভূতিও গমন করিলেন। এই সুযোগে দুরাচার জ্যেষ্ঠ কমঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া বসুন্ধরাকে নিগৃহীত করিল। রাজা শত্রুজয়ের পর ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহারা রাজ্য ত্যাগ করিবার পর দুর্ব্বৃত্ত কমঠ এই পাপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে। রাজা, এইরূপ পাপীর প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধেয়, ইহা মন্ত্রী মরুভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে কমঠকে অপমান পুরঃসর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কমঠ ভ্রাতার প্রতি হৃদয়ে দারুণ ক্রোধ পোষণ করিয়া বনে গমন করিল এবং তথায় তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মরুভূতি জ্যেষ্ঠের দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যে প্রকারেই হউক, ভ্রাতা কমঠের অনুসন্ধান করিবেন এবং তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবেন। মরুভূতি বহু অনুসন্ধানে জ্যেষ্ঠের উদ্দেশ পাইলেন এবং অগ্রজের নিকট গমন করিয়া যেমন তাহার চরণে অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন, অমনই ক্রোধান্ধ দুর্ব্বৃত্ত কমঠ হস্তস্থ বৃহৎ শিলাখণ্ড মরুভূতির মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার বধ-সাধন করিল।

জন্মান্তরে মরুভূতি পঞ্চকল্যাণাধিপতি মহারাজ বিশ্বসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বারাণসী নগরে 'পার্শ্বনাথ' নামে ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কররূপে খ্যাত হয়েন। আর কমঠ পরজন্মে যক্ষকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শম্বর নামে পরিচিত হয়। যক্ষ শম্বর একদিন বিহারকালে ধ্যানস্তিমিত-লোচন পার্শ্বনাথকে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বজন্মের বৈরিভাব স্মরণ করিয়া তাহার উপর ঘোর উপদ্রব আরম্ভ করে। এই স্থান হইতেই 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে।

এ কাব্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, মহাকবি কালিদাসকৃত 'মেঘদূতে'র সমস্ত কবিতা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া সমস্যাপূরণাকারে ইহা রচিত হইয়াছে। কোনও শ্লোকে 'মেঘদূতে'র কবিতার এক চরণ এবং কোনও শ্লোকে দুই চরণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট চরণ গ্রন্থকার স্বয়ং সংযোজন করিয়াছেন। ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে যথাযথ 'মেঘদূতে'র শ্লোকাংশ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবি বিশৃঙ্খলভাবে শ্লোকের চরণ লইয়া এই বিচিত্র কাব্য রচনা করেন নাই।

কাব্যখানি চারি সর্গে সম্পূর্ণ। প্রথম সর্গে ১১৮ শ্লোক, দ্বিতীয় সর্গে ১১৮ শ্লোক, তৃতীয় সর্গে ৫৭ শ্লোক ও চতুর্থ সর্গে ৭১ শ্লোক। নিম্নে কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইল,—

সোঽসৌ জাল্মঃ কপটহৃদয়ো দৈত্যপাশো হতাশঃ
স্মৃত্বা বৈরং মুনিমপঘৃণো হন্তুকামো নিকামম্।
ক্রোধাৎ স্ফূর্জ্জন্নবজলমুচঃ কালিমানং দধান-
'স্তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোঃ' ॥
কিঞ্চিৎ পশ্যন্ মুনিপমনঘং স্বাত্মযোগে নিবিষ্টং
গাঢ়াসূয়াং মনসি নিদধৎ তদ্বধোপায়মিচ্ছন্।
ক্রূরো মৃত্যুঃ স্বয়মিব বহন্ স্বেদবিন্দূন্ সরোষাৎ
'অন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ' ॥
মেঘৈস্তাবৎ স্তনিতমুখরৈর্বিদ্যুদুদ্যোতহাসৈ-
শ্চিত্তং ক্ষোভান্ বিরলসদৃশৈরস্য কুর্ব্বে নিকুর্ব্বন্।
পশ্চাচ্চৈনং প্রচলিতধৃতিং হী হনিষ্যামি চিত্রং
'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ' ॥

—১ম সর্গ।

আক্ষিপ্তেষু প্রিয়তমকরৈরংশুকেষু প্রমোদা-
দন্তর্লীলাতরলিতদৃশো যত্র নালং নবোঢ়াঃ।
শয্যোত্থায়ং বদনমরুতাঽপাসিতুং ধাবমানা
'অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্' ॥
বস্ত্রাপায়ে জঘনমভিতো দৃষ্টিপাতং নিরোদ্ধুং
যূনাং কম্প্রা সুরভিরচিতা যত্র মুগ্ধাঙ্গনানাম্।
কম্পায়ত্তাৎ করকিশলয়াদন্তরালে নিপত্য
'হ্রী মূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ' ॥

—২য় সর্গ।

যস্যা হেতোস্তব চ মম চ প্রাগ্‌ভবেঽভূদ্‌ বিরোধ-
স্তত্রোৎপন্না নিবসতি সতী সাঽধুনা কিন্নরাণাম্।
দ্রষ্টা সৌম্যং সজলনয়না ত্বাং স্মরন্তী স্মরার্ত্তা
'মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ'॥

—৩য় সর্গ।

সৈষা বালা প্রথমকথিতা পূর্ব্বজন্মপ্রিয়া তে
পশ্চায়াতা রহসি পরিরভ্যানুমোদং নয়েৎ ত্বাম্।
অঙ্গেনাঙ্গং তনু চ তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
'সাস্রেণাস্রদ্রবমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন'॥

—৪র্থ সর্গ।

জৈন সম্প্রদায়ের অতিমাত্র পূজনীয় কবি জিনসেনাচার্য্য এই খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। রাষ্ট্রকূটবংশের প্রাথমিক অমোঘবর্ষ নৃপতির রাজ্যশাসন-সময়ে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। কবি গ্রন্থশেষে নিজেই ইহার পরিচয় দিয়াছেন,—

"ইতি বিরচিতমেতৎ কাব্যমাবেষ্ট্য মেঘং
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।
মলিনিতপরকাব্যং তিষ্ঠতাদাশশাঙ্কং
ভুবনমবতু দেবঃ সর্ব্বদাঽমোঘবর্ষঃ॥
শ্রীবীরসেনমুনিপাদপয়োজভৃঙ্গঃ
শ্রীমানভূদ্‌বিনয়সেনমুনির্গরীয়ান্।
তচ্চোদিতেন জিনসেন-মুনীশ্বরেণ
কাব্যং ব্যধায়ি পরিবেষ্টিত-মেঘদূতম্॥"

জিনসেনাচার্য্য জৈন মহামুনি বীরসেনের শিষ্য ছিলেন। বিনয়সেনও বীরসেনের শিষ্য। এই বিনয়সেনের প্রেরণায় অনুরুদ্ধ হইয়া জিনসেন এই 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে ইহাই পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার জিনসেন অমোঘবর্ষ নৃপতির গুরু ছিলেন, তাহা এই কাব্যের প্রত্যেক সর্গ-সমাপ্তিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"ইত্যমোঘবর্ষ-পরমেশ্বর-পরমগুরু-শ্রীজিনসেনাচার্য্যবিরচিতমেঘদূতবেষ্টিতবেষ্টিতে পার্শ্বাভ্যুদয়ে ভগবৎকৈবল্য-বর্ণনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

মহারাজ অমোঘবর্ষ রাষ্ট্রকূট (রাঠোর) বংশের একজন প্রবলপ্রতাপশালী বিখ্যাত মহীপতি ছিলেন। তিনি কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র দেশে একাধিপত্য

করিতেন। অমোঘবর্ষ যে কেবল শৌর্য্যবান্ ছিলেন, তাহা নহে,—তাঁহার বিদ্যানুরাগিতাও উল্লেখযোগ্য। তিনি কর্ণাট ভাষায় 'কবিরাজমার্গ' নামক একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ ও সংস্কৃত ভাষায় 'প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। *

জিনসেন যে বীরসেনের শিষ্য এবং অমোঘবর্ষ নৃপতির গুরু ছিলেন, তাহা গুণভদ্রাচার্য্যপ্রণীত প্রামাণিক জৈন গ্রন্থ 'উত্তর পুরাণে'র প্রশস্তির শেষে বর্ণিত আছে,—

"অভবদিহ হিমাদ্রের্দেবসিন্ধুপ্রবাহো
ধ্বনিরিব সকলজ্ঞাৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈকমূর্ত্তিঃ।
উদয়গিরিতটাদ্বা ভাস্করো ভাসমানো
মুনিরনু জিনসেনো বীরসেনাদমুষ্মাৎ॥
যস্য প্রাংশুনখাংশুজালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎ
পাদাম্ভোজরজঃপিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংস্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং
স শ্রীমান্ জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলম্॥"

গ্রন্থকার জিনসেন কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপ্রণীত জয়ধবলা টীকার প্রশস্তি-শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জিনসেনের গুরু বীরসেন জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বীরসেনীয়া নামক এক টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহার শেষাংশ জিনসেন রচনা করেন। † জিনসেন এই টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

"ইতি শ্রীবীরসেনীয়া টীকা সূত্রার্থদর্শিনী।
মটগ্রামপুরে শ্রীমদ্‌গুর্জ্জরার্য্যানুপালিতে॥
ফাল্গুনে মাসি পূর্ব্বাহ্ণে দশম্যাং শুক্লপক্ষকে।
প্রবর্দ্ধমানপূজায়াং নন্দীশ্বর-মহোৎসবে॥
অমোঘবর্ষ-রাজেন্দ্রপ্রাজ্যরাজ্যগুণোদয়া।
নিষ্ঠিতপ্রচয়ং যায়াদকল্পান্তমনল্পিকা॥
ষষ্টিরেব সহস্রাণি গ্রন্থানাং পরিমাণতঃ।
শ্লোকেনানুষ্টুভেনাত্র নির্দ্দিষ্টান্যনুপূর্ব্বশঃ॥

* ১৩১৯ সালের 'শিল্প ও সাহিত্যে'র শ্রাবণ-সংখ্যায় মল্লিখিত 'অমোঘবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক।

† "* * * বীরসেনো মুনিঃ স্বর্গং যাস্যতি। তস্য শিষ্যো জিনসেনো ভবিষ্যতি, সোঽপি চত্বারিংশৎ সহস্রৈঃ কর্ম্মপ্রাভৃতং সমাপ্তিং নেষ্যতি"।—

শ্রীধরকৃত গদ্যশ্রুতাবতার।

বিভক্তিঃ প্রথমস্কন্ধো দ্বিতীয়ঃ সংক্রমোদয়ঃ।
উপযোগস্তু শেষাশ্চ তৃতীয়স্কন্ধ ইষ্যতে॥
একোনষষ্টিসমধিকসপ্তশতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।
সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলা প্রাভৃতব্যাখ্যা॥
গাথাসূত্রাণি সূত্রাণি চূর্ণিসূত্রং তু বার্ত্তিকম্।
টীকা শ্রীবীরসেনীয়াঽশেষা পদ্ধতিপঞ্জিকা॥
শ্রীবীরপ্রভুভাষিতার্থঘটনা নির্লোড়িতান্যাগম-
ন্যায়া শ্রীজিনসেনসন্মুনিবরৈরাদেশিতার্থস্থিতিঃ।
টীকা শ্রীজয়চিহ্নিতোরুধবলা সূত্রার্থসম্বোধিনী
স্থেয়াদারবিচন্দ্রমুজ্জ্বলতমা শ্রীপালসম্পাদিতা॥"

ইহার ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ৭৫৯ শকাব্দে কষায় প্রাভৃতের ব্যাখ্যা এই জয়ধবলা টীকা সমাপ্ত হইয়াছে।

জিনসেনাচার্য্য 'বর্দ্ধমান পুরাণ,' 'জিনেন্দ্রগুণস্তুতি' 'জয়ধবলা টীকা', 'মহাপুরাণ' ও 'পার্শ্বাভ্যুদয়'—এই পাঁচখানি গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মহাপুরাণ' ইহাঁর রচিত নহে,—'মহাপুরাণে'র ৪৩ অধ্যায়ের ৩ শ্লোক পর্য্যন্ত জিনসেনের প্রণীত, অবশিষ্টাংশ ইহাঁর প্রধান শিষ্য গুণভদ্র প্রণয়ন করেন। জিনসেনের রচিত পূর্ব্বাংশের নাম 'আদিপুরাণ' ও গুণভদ্রের রচিত উত্তরাংশের নাম 'উত্তরপুরাণ'।—'মহাপুরাণ' গ্রন্থ এই দুই নামে পরিচিত।

পুনার প্রফেসর কাশীনাথ বাপুজী পাঠক 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, জৈন 'হরিবংশ' পুরাণও জিনসেনের রচিত। * কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। 'জৈনহিতৈষী' নামক হিন্দী মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'মহাপুরাণ' 'পার্শ্বাভ্যুদয়' প্রভৃতির রচয়িতা জিনসেনাচার্য্য 'হরিবংশের' প্রণেতা নহেন।

---

* "Jinasena wrote his first work the Jaina Harivansa in Saka 705 when Srivallabha, the son of Krishnaraja I., and the grandfather of Amoghavarsha I. was the reigning sovereign. Jinasena's second work the Parshwavyadayam must have been composed shortly after Saka 736, while his third and last work the Adipurana, was left unfinished. He wrote only 45 (?) chapters."

এই কাব্যের টীকাকার পণ্ডিতাচার্য্য, মল্লিনাথরীতিতে ইহার সুন্দর টীকা লিখিয়াছেন। টীকার সূত্রের উল্লেখস্থলে পাণিনীয় সূত্রের পরিবর্ত্তে শাকটায়ন ব্যাকরণের সূত্রাবলী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

টীকাকার পণ্ডিতাচার্য্য টীকার শেষে অনুষ্টুপ্ শ্লোকাকারে একটি অতিমাত্র ভ্রান্ত মতের প্রচার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকার জিনসেনাচার্য্যকে মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়াছেন। টীকাকার এ সম্বন্ধে এক গল্পও রচিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, (১) কালিদাস এক দিন অমোঘবর্ষ নৃপতির সভায় স্বরচিত 'মেঘদূত' কাব্য শুনাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি সভাস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজ অমোঘবর্ষকে 'মেঘদূত' কাব্য শ্রবণ করাইয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। সভ্যবৃন্দের মধ্যে জিনসেনাচার্য্য কালিদাসের এই জিগীষাপরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যপ্রকটন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রবণমাত্রেই 'মেঘদূতে'র শ্লোকসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"পুরাতন ভাব অপহরণপূর্ব্বক এই কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া কালিদাস রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"কোন্ প্রাচীন কাব্যের ভাব অপহরণ করিয়া আমি কাব্য লিখিয়াছি, তাহা সভায় প্রদর্শন করুন।" জিনসেন উত্তর করিলেন, "আপনি যে কাব্যের পদবিন্যাস ও ভাব অপহরণ করিয়া এই নবীন কাব্য লিখিয়াছেন, সেই কাব্য

(১) "কালিদাসাহ্বয়ঃ কশ্চিৎ কবিঃ কৃত্বা মহোজসা।
মেঘদূতাভিধং কাব্যং শ্রাবয়ন্ গণশো নৃপান্॥
অমোঘবর্ষরাজস্য সভামেত্য মদোদ্ধুরঃ।
বিত্রষোঽবগণয্যৈষ প্রভুমশ্রাবয়ৎ কৃতিম্॥
তদা বিনয়সেনস্য সতীর্থ্যস্যোপরোধতঃ।
তদ্‌বিদ্যাহঙ্কৃতিচ্যুত্যৈ সন্মার্গোদ্দীপ্তয়ে পরম্॥
জিনসেনমুনীশানস্ত্রৈবিদ্যাধীশ্বরাগ্রণীঃ।
বিংশত্যগ্রশতগ্রন্থপ্রবন্ধশ্রুতিমাত্রতঃ॥
একসন্ধিত্বতঃ সর্ব্বং গৃহীত্বা পদ্যমর্থতঃ।
ভূভৃদ্‌বিদ্বৎসভামধ্যে প্রোচে পরিহসন্নিতি॥
* * * *
সঙ্কেতদিবসে কাব্যং বাচয়িত্বা স সংসদি।
তদ্বৃত্তমুদীর্য্যাথ কালিদাসমমানয়ৎ॥"

আমার সন্ধানেই একটু দূরবর্ত্তী স্থানে আছে। আমাকে আট দিন সময় দিলে, আমি সেই কাব্য আনিয়া সভায় শুনাইব।" তখন সভাস্থ অন্যান্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। এ দিকে জিনসেনাচার্য্য 'মেঘদূতে'র সমস্ত শ্লোক সমস্যাপূরণাকারে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া পার্শ্বনাথের কথাবলম্বনে 'পার্শ্বাভ্যুদয়' নামক কাব্য রচনা পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকে অপমানিত ও লজ্জিত করিলেন।

টীকাকারের এই কল্পিত উপন্যাস যে উন্মত্তপ্রলাপবৎ ভিত্তিশূন্য, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। মহাকবি কালিদাস যে জিনসেনাচার্য্যের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বীজাপুর জিলার অন্তর্গত ঐহোলী গ্রামে 'মেগূতী' নামক জৈন মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ ৫৫৬ শকাব্দের শিলালিপিতে জৈন কবি রবিকীর্ত্তি সগৌরবে কালিদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন।*

এই রবিকীর্ত্তি চালুক্যবংশীয় মহাবীর দ্বিতীয় পুলিকেশীর (অপর নাম সত্যাশ্রয়) যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। চালুক্যবংশে দ্বিতীয় পুলিকেশীর তুল্য প্রবল-পরাক্রম নরপতি আর কেহই ছিলেন না। ইনি ৫৩১ শকাব্দে রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। এই বীরশ্রেষ্ঠ সত্যাশ্রয় পুলিকেশী (২য়) কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।† সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বজ্ঞ

* "পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ। (৫৫৬)
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥
তস্যাম্বুধিত্রয়নিবারিতশাসনস্য
সত্যাশ্রয়স্য পরমাপ্তবতা প্রসাদম্।
শৈলং জিনেন্দ্রভবনং ভবনং মহিম্নাং
নির্ম্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্ত্তিনেদম্॥
প্রশস্তের্বসতেশ্চাস্যা জিনস্য ত্রিজগদ্‌গুরোঃ।
কর্ত্তা কারয়িতা চাপি রবিকীর্ত্তিঃ কৃতী স্বয়ম্॥
যেনাযোজি নবেহশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ॥"
(Indian Antiquary, Vol, V. P. 70-71.)

† "সমরসংসক্তসকলোত্তরাপথেশ্বরশ্রীহর্ষবর্দ্ধনপরাজয়োপলব্ধপরমেশ্বরশব্দালঙ্কৃতস্য সত্যাশ্রয়-শ্রীপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বরস্য প্রিয়তনয়ঃ—"
Journal of the Bambay branch the Royal Asiatic Society, Vol. Xvi. P. 234.)

ডাক্তার ফ্লিট প্রভৃতির মতে ৬১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সাহত সত্যাশ্রয় পুলিকেশীর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষের সভাসদ্ ছিলেন। (১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের অর্চ্চনায় মল্লিখিত 'রত্নাবলীর প্রণেতা' ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) তিনিও স্বরচিত 'হর্ষচরিত' নামক গদ্য কাব্যে কালিদাসকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।* সুতরাং মহাকবি কালিদাস কোনও রূপেই শকীয় অষ্টম শতাব্দীর জিনসেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

টীকালেখকের তথাকথিত কাহিনী যে নিতান্তই অযৌক্তিক, তাহা এই কাব্যের উপান্ত্য শ্লোক পাঠ করিলেও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কবি লিখিয়াছেন,—

"ইতি বিরচিতমেতৎ কাব্যমাবেষ্ট্য মেঘং
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।"

যদি কালিদাসকে অপমানিত করাই গ্রন্থকার জিনসেনের উদ্দেশ্য ছিল, তবে তিনি কাব্যের শেষে কালিদাসের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার 'মেঘদূতে'র প্রশংসা করিবেন কেন? এই শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও বলা যায় না। কারণ, টীকাকার অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় এ শ্লোকেরও যথারীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের রচনা-প্রণালী প্রথম শ্রেণীর না হইলেও ইহা যে অপর একখানি কাব্যের সমস্ত শ্লোককে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতেই এই কাব্যের অসাধারণত্ব। সম্ভবতঃ একখানি কাব্যের আদ্যোপান্ত শ্লোকাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক এইভাবে আর কোনও কাব্য প্রণীত হয় নাই।

'মেঘদূতে'র প্রত্যেক শ্লোকের অন্তিম চরণ গ্রহণপূর্ব্বক জৈন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সম্বন্ধীয় আংশিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাঙ্গনপুত্র 'বিক্রম' নামক কোনও জৈন কবি 'নেমিদূত' নামক একখানি খণ্ড কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়†। পুস্তকখানি মারাঠী অনুবাদের সহিত

* "নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"
—হর্ষচরিত।

† "তদ্দুঃখার্থং প্রবরকবিতুঃ কালিদাসস্য কাব্যা-
দন্ত্যং পাদং সুপদরচিতান্মেঘদূতাদ্‌গৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গনস্যাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ।
—নেমিদূত, ১২৬ শ্লোক।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ কাব্যখানিও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর। ইহারও তিনটি শ্লোক নিম্নে উপহার দিলাম। শৈলশৃঙ্গে তপস্যা-নিরত রাজপুত্র নেমিনাথকে তাঁহার পত্নী কহিতেছেন,—

তুঙ্গং শৃঙ্গং পরিহর গিরেরেহি যাবঃ পুরীং স্বাং
রত্নশ্রেণীরচিতভবনদ্যোতিতাশান্তরালাম্।
শোভাসাম্যং কলয়তি মনাঙ্ নালকানাথ যস্যাঃ
'বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা' ॥
অলোক্যৈনং তরলতড়িদাক্রান্তনীলাব্দমালং
প্রাবৃট্‌কালং বিততবিকসদ্‌যূথিকাজাতিজালম্।
অন্তর্জ্জাগ্রদ্ বিরহদহনো জীবিতালম্বনেঽলং
'ন স্যাদস্তোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ' ॥
এতৎ তুঙ্গং ত্যজ শিখরিণঃ শৃঙ্গমঙ্গীকুরুষ্ব
প্রাজ্যং রাজ্যং প্রণয়মখিলং পালয়ন্ বন্ধুবর্গে।
রম্যে হর্ম্মে চিরমনুভব প্রাপ্য ভোগানখণ্ডান্
'সোৎকণ্ঠানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি' ॥

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বন্দিপ্রেমের স্বপ্নভঙ্গ।

জীবনের কুঞ্জে পশে মধুর যৌবন
অঙ্গে অঙ্গে ফুটে রূপরাশি ;
সে রূপের ফাঁদে প্রেম-বিহঙ্গ প্রথম
আপনারে ধরা দেয় আসি'।
নয়নে তাহার জাগে রূপের স্বপন
রূপতৃষা হৃদয়মাঝার,
রূপের মদিরা পান করি' সে পুলকে
করে সুখে সে কুঞ্জে বিহার।
একদা যৌবন-অন্তে হেরে সে বিস্ময়ে—
কোথা রূপ! সে স্বপন গত,
গুণের পিঞ্জরে তার কাটিতেছে দিন
বন্দী হ'য়ে জনমের মত।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-চক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবৃত্ত।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র পিতামহীর যে অবস্থা দেখিল, তাহাতে সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। এ কয় দিন সে কাঁদিতে পারে নাই—দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় বেদনার ভার বর্দ্ধিত হইয়া কেবল অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। আজ সে যখন পিতামহীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সে ভার যেন কিছু প্রশমিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মনে আত্মগ্লানির আবির্ভাব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পিতামহীর এই বেদনার জন্য যেন সে-ই দায়ী। আর পিতার মৃত্যু?—সে হৃদয়ে অজস্র বৃশ্চিকদংশনযাতনা অনুভব করিতে লাগিল। শোকে—দুঃখে হৃদয় কোমল না হইলে মানুষ আপনার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না—আপনার অপরাধ বুঝিতে পারে না। আজ শোকে দুঃখে বিপন্ন যতীশচন্দ্র বুঝিল, সে স্বাবলম্বনের নামে যে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে, তাহার ফলে সে কেবল আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু তাহার প্রতি স্নেহই যাঁহাদিগের জীবনের প্রবলতম বৃত্তি ছিল—যাঁহাদিগের সকল কার্য্যের কারণস্বরূপ ছিল, তাঁহাদিগেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার মত পাপী কে?

তখন সরোজার কথাও মনে পড়িল। এত দিন সে যে মিথ্যা অভিমানে সরোজাকে অপরাধী মনে করিত, আজ সে অভিমান আর তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; তাই আজ তাহার মনে হইল, সরোজার ত কোন অপরাধই ছিল না! সে যে অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছিল, সরোজার পক্ষে তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভবও ছিল না—সঙ্গতও হইত না। দোষ সরোজার নহে—তাহারই। আর সে তাহার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!

আজ অমূল্যচরণের প্রভাব হইতে দূরে আসিয়া শোকার্ত্ত—ব্যথিত যতীশচন্দ্র আপনার কৃত কর্ম্মের স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত—শঙ্কিত হইল। তাহার মনে যে বেদনা—যে যাতনা—সে বেদনা কি কখন অপনীত হইবে—সে যাতনা কি কখন জুড়াইবে? যতীশচন্দ্র কেবলই ভাবিত।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ধরণীধরের শ্রাদ্ধের সময় আসিল। গৃহেই শুদ্ধ হইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে অমূল্য-

চরণের ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে আসিবার পূর্ব্বে অমূল্যচরণকে পত্র লিখিয়াছিল; আশা করিয়াছিল, পূর্ব্বের মত সে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত থাকিবে। কিন্তু সে আসিয়া জানিল, অমূল্যচরণ আইসে নাই। হয় ত কোন অনিবার্য্য কারণে অমূল্যচরণ আসিতে পারে নাই—ভাবিয়া সে তাহার গৃহে গেল। অমূল্যচরণ কয়জন বন্ধুর সহিত তাস খেলিতেছিল। তাহাকে সেই বন্ধুরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিল, অমূল্যচরণের আহ্বানে সে আগ্রহও নাই! অমূল্যচরণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য যতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার বন্ধুরা সন্ধ্যার সময় উঠিলেন। যতীশচন্দ্র ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না।

শেষে তাসের আড্ডা উঠিলে যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণকে পিতামহীর কথা জানাইল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

অমূল্যচরণ বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পাওনাদাররা বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদের তাগাদায় আমি অস্থির হইয়া উঠিতেছি। তাহাদের কি করিবেন?"

যতীশচন্দ্র এতক্ষণে অমূল্যচরণের স্বভাব বুঝিল। তাহার মনে পড়িল, গৃহীত অর্থের অর্দ্ধাংশেরও অধিক অমূল্যচরণই গ্রাস করিয়াছে। আজ সে নিষ্কাসিতরস ইক্ষুদণ্ডের দশাগ্রস্ত—তাই অমূল্যচরণ তাহাকে অবহেলায় ধূলায় ফেলিয়া দিতে ব্যস্ত! শোকের মত শিক্ষক আর নাই। সে শিক্ষায় যতীশচন্দ্র সংযম শিখিয়াছিল। সে মনের ভাব চাপিয়া বলিল, "দেখি, কি করিতে পারি।"

পরদিন যতীশচন্দ্র কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিল। আসবাবগুলি বিক্রয় করিয়া সে ভৃত্যদিগের বেতন ও কতক খুচরা দেনা মিটাইয়া আবার শানগরে চলিয়া গেল। তথায় সে ভাবিয়া আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

যাইবার পূর্ব্বে সে একবার নূতন শ্বশুরালয়ে দেখা করিয়া গেল। সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সে আর কাহারও নিকট কোন কথা গোপন করিবে না; সে তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র দুশ্চিন্তার দারুণ দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ

করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু আর এক প্রকার যন্ত্রণার কিছু উপশম অনুভব করিল। নিশাশেষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত দিবসে অনিবার্য্য ব্যয়-নির্ব্বাহের ভাবনা—পাওনাদারদিগের তাগাদা—অর্থসংগ্রহের উপায় নির্দ্ধা-রণের চিন্তা—গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র সে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির শান্তিও সে বহুদিন ভোগ করিতে পায় নাই। ভাবনা রহিল—ভবিষ্যতের, ভাবনা রহিল—ঋণের, ভাবনা রহিল—নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীর। আর রহিল আত্মগ্লানির মুর্ম্মরদাহ—পিতার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি—আর সরোজার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি। কিন্তু উপায় কি? যতীশ কেবল তাহাই ভাবিত। কেবল পিতামহীর অপরিমেয় অনাবিল স্নেহে যতীশচন্দ্রের মনোবেদনার যেন অর্দ্ধেক উপশম হইত।

এই ভাবে এক মাস কাটিতে না কাটিতে নিদাঘের নিরসতায় সরসতা-সঞ্চার করিয়া বর্ষা দেখা দিল। পরিপূর্ণ পল্বল ভেককলরবমুখরিত হইল—পতিত জমীতে ঘনশ্যামপত্র তৃণলতাগুল্ম দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরেরও আবির্ভাব হইল। এক দিন যতীশচন্দ্রের পিতামহীর শোকদুর্ব্বল দেহ জ্বরের তাড়নে কম্পিত হইল। জ্বর যায় আসে—একেবারে যায় না। শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অথচ তিনি কিছুতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে দিলেন না। যতীশ বিপন্ন হইয়া পড়িল। পিতামহীর শুশ্রূষার—পথ্যাদির ব্যবস্থা কি হইবে? তাহার আহারেরই বা উপায় কি? শুশ্রূষাকার্য্যে সে অনভ্যস্ত। প্রতিবেশিনীদিগের লৌকিক আত্মীয়তায় স্থায়িত্বের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। বৃদ্ধার রোগ দুই এক দিনে সারিবার নহে বুঝিয়া তাঁহারা যে যাঁহার গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। বাস্তবিক কে দশ দিন পরের করিতে পারে? সকলেরই সংসার আছে।

শেষে বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তোরও কষ্ট হইতেছে। আমি না হয় ইচ্ছাপুরে বৌদিদিকে সংবাদ দিয়া পাঠাই। আহা—কত দিন বৌদিদিকে দেখি নাই।"

যতীশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে আর কেমন করিয়া সরোজাকে আসিতে বলিবে—কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইবে? সুদিনে সে তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া এ দুর্দ্দিনে সে তাহাকে আনিতে পারিবে না। আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠাইবেন কি?

অনেক ভাবিয়া পরদিন সে কলিকাতায় গেল এবং তাহার নূতন শ্বশুরালয়ে

সকল কথা জানাইয়া স্ত্রীকে শানগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা দরিদ্র—দরিদ্রের দুঃখ বুঝিলেন; আরও বুঝিলেন, কন্যা কল্যাণীকে ত এই ঘরই করিতে যাইতে হইবে—বিলম্ব করিয়া ফল কি? বিশেষ এখন যদি সে যাইয়া সংসার অধিকার করে, তবে ভবিষ্যতে তাহার সপত্নীর আসিবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া শানগরে আসিল।

কল্যাণীকে দেখিয়া ঠাকুরমা একবার সরোজার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু এও যে যতীশের পত্নী! কল্যাণীর আদরযত্নের ত্রুটি হইল না।

কল্যাণীও কয় দিনেই সেবায়, শুশ্রূষায় ও কার্য্যপটুতায় বৃদ্ধার স্নেহশীল হৃদয় অধিকার করিল। সে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিল, কখনও বিলাসে বা আলস্যে অভ্যস্তা হয় নাই। গৃহকর্ম্মে তাহাকে জননীর সাহায্য করিতে হইত। তাই সে গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিল। ভাইভগিনীগুলিকে লালন-পালন করিয়া ও রোগে শুশ্রূষা করিয়া সে শুশ্রূষাকার্য্যেও অভ্যস্তা হইয়া উঠিয়াছিল তাই সে সেবায় ও শুশ্রূষায় কয় দিনেই বৃদ্ধার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

গৃহকর্ম্মের সকল ভারই কল্যাণী লইল এবং সকল কাযও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। বৃদ্ধার ভাগ্যে বিশ্রামসুখলাভ ঘটিল।

যতীশও কল্যাণীর সঙ্গে প্রাণপণে পিতামহীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এখন যেন তাঁহার প্রতি তাহার ভালবাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু অক্লান্ত শুশ্রূষায় কিছুই হইল না। ঠাকুরমা'র জ্বর মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। আর যতীশচন্দ্র ও কল্যাণী অনেক জিদ করিয়াও তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইতে সম্মতা করিতে পারিল না। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা মৃত্যুর আশায় যেন উৎফুল্লা হইতেছিলেন। হিন্দু-বিধবা পতিকে হারাইলেই মনে করেন, জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। তাহার পর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহাকে পুত্রশোক সহিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুই কামনা করেন।

এই ভাবে প্রায় দুই মাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের শেষে বৃদ্ধা শয্যা লইলেন। সকলেই বুঝিল, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দীপনির্ব্বাণ কেবল সময়-সাপেক্ষ।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে এক দিন সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।

"ঠাকুরদাদা" নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ মধ্যাহ্নের পর পর্য্যন্ত মেয়াদ।"

বৃদ্ধার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হইল। সেই গঙ্গার কূলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার শেষ শ্বাস বাহির হইয়া গেল।

পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া যতীশ কাঁদিল। এমন করিয়া সে আর কখনও কাঁদে নাই। এ শোক যেন তাহার পক্ষে পিতামহীর ও পিতার মৃত্যুশোক। তাহার বেদনা কে বুঝিবে? তাহার শোকের কি সান্ত্বনা আছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

পিতামহীর মৃত্যুর কয় দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে যতীশ পিতামহীর শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে কল্যাণীর সহিত পরামর্শ করিতেছিল। রন্ধনগৃহে কল্যাণী হবিষ্যান্ন রাঁধিতেছিল—আর যতীশ নিকটে বসিয়া ছিল। এখন সংসারে কল্যাণীই তাহার অবলম্বন। মানুষ যখন বিপদে পড়ে—যখন ভাবনার সমুদ্রে কূল পায় না—যখন বুঝিতে পারে, সে আপনার বুদ্ধিবলে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—যখন তাহার আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত প্রত্যয় চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে ব্যথার ব্যথীর পরামর্শ লইতে চাহে। তখন সে পত্নীর পরামর্শ লয়—কারণ, উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে একত্র সম্বদ্ধ।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীর সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে একজন ভদ্রবেশধারী মধ্যবয়স্ক লোক একেবারে অন্দরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যতীশচন্দ্র বাহিরে আসিল। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া আগন্তুক কর্কশভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার কি ব্যবস্থা করিলেন?"

যতীশ বলিল, "আমার অবস্থা দেখিতেছেন। ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধটা হইয়া যাউক; তাহার পর আমি একটা ব্যবস্থা করিব।"

"আমি আপনার চাকর নহি যে, কলিকাতা হইতে কায ফেলিয়া যাতায়াত করিব। আমার পাওনা টাকা পাইব কি না, বলিয়া দিউন। তাহা বুঝিয়া আমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাকা লইবার সময় সকলের এক চেহারা—আর দিবার সময় আর এক চেহারা। ভাল আপদেই পড়িয়াছি!"

যতীশ যত বিনীত ভাবে কথা কহে, আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ততই উচ্চ হয়।

যতীশ তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গেল।

কল্যাণী ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন আহারের পর যতীশচন্দ্র হর্ম্ম্যতলে কম্বলের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কল্যাণী কক্ষে প্রবেশ করিল। স্বামীর কাছে বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কলিকাতা হইতে যে লোকটি আসিয়াছিল, সে তোমার কাছে কত টাকা পাইবে?"

যতীশ বলিল, "দুই শত টাকা।"

"তোমার কি আরও দেনা আছে?"

"আছে।"

"মোট কত টাকা হইবে?"

"প্রায় ছয় হাজার।"

টাকার পরিমাণ শুনিয়া কল্যাণী চিন্তিতা হইল,—জিজ্ঞাসা করিল, "শোধ করিবার কি করিবে?"

যতীশ বলিল, "তাই ভাবিতেছি।"

"শোধ করিবার কি কোন উপায় নাই?"

"থাকিবার মধ্যে আছে, ঠাকুরমা'র সম্পত্তিটুকু।"

"দাম কত হইবে?"

"আট হাজার টাকা হইতে পারে।"

"ঐটা বেচিয়া ফেল।"

"তাহার পর কি খাইব?"

"এখনই বা কি করিবে? আগে তুমি খোলসা হও। সব শোধ করিয়াও হাতে কিছু টাকা থাকিবে। আর তুমি কি মাসে ২০।২৫ টাকাও আনিতে পারিবে না? তাহাতেই সুখে হউক—দুঃখে হউক, আমাদের চলিয়া যাইবে। এ অপমান—এ অস্বস্তিতে কায নাই।"

"কিন্তু সম্পত্তি বেচিব বলিলেই ত বিক্রয় হয় না। এ দিকে ইহাঁরা যে আর সময় দিতে চাহেন না।"

কল্যাণী মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "এখন কত টাকা হইলে তুমি সময় পাও?"

যতীশ বলিল, "প্রায় দুই হাজার।"

"ভাল। আমার যে গহনা আছে ; তুমি কাল সেগুলি বেচিয়া ফেল—প্রায় দেড় হাজার টাকা পাইবে। আর দিদিরও ত গহনা আছে—আমি তাঁহাকে লিখিতেছি।"

যতীশচন্দ্র ঠিক বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে ?"

কল্যাণী বলিল, "ইচ্ছাপুরে দিদিকে।"

"সে কি ?"

"তুমি রমণীকে চিন না। তুমি যাহাই কর, তুমি তাঁহার স্বামী। তোমার বিপদ্ শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না। আর আমি ঠাকুরমা'র কাছে তাঁহার কথা যাহা শুনিয়াছি—তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি সব কথা লিখিলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিতে দ্বিধা করিবেন না।"

যতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক সে রমণীকে চিনে না। রমণীর এই কল্যাণী মূর্ত্তি সে তাহার স্বার্থসঙ্কুচিত চিত্তে বুঝি ধারণাও করিতে পারে না ? রমণীর এই আত্মত্যাগ বুঝি তাহার কল্পনার অতীত। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল। আর সে মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির আনন্দ অনুভব করিল। যাহার ভাগ্যে এরূপ পত্নীলাভ ঘটে, তাহার জীবন অভিশপ্ত হইতে পারে না। যাহার জ্বালা জুড়াইবার এমন স্থান আছে, তাহার কিসের দুঃখ ? তাহার অবসন্ন হৃদয়ে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল ; সে যে সংসার-সংগ্রামে আপনার পরাজয় ও পতন অনিবার্য্য বোধ করিতেছিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, সেই সংসার-সংগ্রামে তাহার জয় হইবেই। সে হৃদয়ে যে শক্তি অনুভব করিল সে শক্তি বিশ্বাসসঞ্জাত। আজ তাহার মনে হইল, রমণী সত্য সত্যই শক্তিরূপিণী। এ কথা যে না বুঝে, সে সংসারমরুভূমিতে কেবল মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিয়া শ্রান্ত—ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যে ইহা বুঝিতে পারে, সে জয়ী হয়—সুখী হয়।

কিন্তু যতীশ কিছুতেই কল্যাণীর অলঙ্কার লইতে চাহিল না ; বলিল, "আমার একখানি অলঙ্কার দিবার ক্ষমতা নাই আর আমি তোমার সম্বল নষ্ট করিব ? সে কিছুতেই হইবে না।"

কল্যাণী তাহাকে অনেক বুঝাইল ; বলিল, "দুর্ভাবনায় তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তোমার—মনে সুখ নাই। তোমার শরীর—তোমার সুখ বড়—না আমার অলঙ্কার বড় ? তুমি যদি অসুখী হও, তবে আমি

বাক্সে গহনা রাখিয়া কি সুখ পাইব? গহনা ত অসময়ের জন্যই। যখন তোমার অর্থ হইবে, আমি জিদ করিয়া গহনা লইব।"

যতীশ অনেক তর্ক করিল; কিন্তু কল্যাণীর সহিত পারিয়া উঠিল না। কেবল তাহার বিশেষ অনুরোধে কল্যাণী বলিল, সে বর্ত্তমানে সরোজাকে কোন পত্র লিখিবে না।

পরদিন পত্নীর অলঙ্কার লইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল ও সেগুলি বিক্রয় করিয়া কতক ঋণ শোধ করিয়া গৃহে ফিরিল।

কলিকাতায় যাইয়া যতীশ আর একটি কায করিল; সংবাদপত্রে কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কয় স্থানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া আসিল।

তাহার পর সে গ্রামের ঠাকুরদাদা হরিনাথকে বলিল, "দেখুন, বাবা ত সব টাকাই সৎকর্ম্মে দান করিয়া গিয়াছেন। আমার ত চাকরী না করিলে চলিবে না। কাযেই আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে।"

হরিনাথ বলিলেন, "তাহা ত বটেই।"

যতীশ বলিল, "আমি চলিয়া যাইলে যে সামান্য সম্পত্তিটুকু আছে, তাহাতে কি আর কিছু হইবে?"

হরিনাথ বলিলেন, "মহাভারত! আপনি থাকিয়া আদায় করাই দুষ্কর; না থাকিলে কি কখনও আদায় হয়? বিশেষ আজকাল ঘোর কলি—লোক ফাঁকি দিতে পারিলে আর ছাড়ে না।"

"তাই ভাবিতেছি. সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিব। আপনি সাহায্য না করিলে হইবে না।"

"আমিই ত ধরণীকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছিলাম। তাহার ভাগ্যে নাই—ভোগে লাগিল না। আমি চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই বিক্রয় হইবে। গ্রামেই সম্পত্তি; অনেকেই লইতে চাহিবে।"

বাস্তবিক হরিনাথের চেষ্টায় কয় দিনেই সম্পত্তির গ্রাহক জুটিল। পিতা-মহীর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া যথারীতি অধিকারী হইয়া যতীশচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিল ও সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনার সঞ্চিত ঋণ মিটাইয়া দিল। দুঃখের মধ্যে সে যে সুখ পাইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এ দিকে সে যে কয়খানি দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানির উত্তর আসিল। দানাপুরে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তাহার চাকরী জুটিল।

নূতন স্থান; তাই যতীশচন্দ্র প্রস্তাব করিল, প্রথমে সে একাই যাইবে, পরে কল্যাণীকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে। তত দিন কল্যাণী পিত্রালয়ে থাকিবে। কিন্তু কল্যাণী সে প্রস্তাবে সম্মতা হইল না। কারণ, সে পিত্রালয়ে আপনাদের দারিদ্র্য-দুঃখ জানাইতে ইচ্ছুক ছিল না; আর ঘটনা-পরম্পরায় যতীশচন্দ্র যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে যতীশচন্দ্রকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে তাহার মন সরিতেছিল না। সে বলিল, "তুমি সঙ্গে থাকিবে, ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" যতীশ আর তাহার কথায় আপত্তি করিল না। সেও ভাবিল, কল্যাণীকে রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাকে লইয়া যাওয়াই ভাল।

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। গৃহের কতক জিনিস বিক্রয় করিয়া, কতক জিনিস আত্মীয়গৃহে রাখিয়া এক দিন যতীশচন্দ্র পত্নীকে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিল। গৃহে তালা পড়িল।

অদৃষ্ট-চক্রের এক আবর্ত্তন উদ্‌ভ্রান্ত যতীশচন্দ্রকে ফিরাইয়া গৃহে আনিয়াছিল, আর এক আবর্ত্তন আজ তাহাকে গৃহত্যাগী করিল। অন্য সময় হইলে এই বিদায়ে তাহার হৃদয় বিষম ব্যথিত হইত। কিন্তু আজ সে কল্যাণীর জন্য নূতন আশায়—নূতন উদ্যমে নূতন জীবনে প্রবেশ করিতেছিল; আজ তাহার নিকট সংসার নূতন শ্রীতে সমুদ্ভাসিত; আজ তাহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি—তাই এই বিদায় আজ তাহার পক্ষে তেমন ক্লেশের কারণ হইল না; বিশেষ তাহার জীবনে কল্যাণরূপিণী পত্নী আজ তাহার সঙ্গে, তাই সে বিদায়কালে বেদনায় অভিভূত হইল না।

রামটেক্।

(২)

একটু অগ্রসর হইয়াই দেখি, পথের বামপার্শ্বে নরসিংহদেবের রক্তপ্রস্তরমূর্ত্তি সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া আছেন। আর দক্ষিণে এক বহু পুরাতন মসজেদ; শুনিলাম, আওরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদের স্মৃতিরক্ষার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত। মসজেদ ছাড়াইয়া আর একটি তোরণদ্বারের সম্মুখে যাইতে না যাইতেই মুসলমান ফকিরের ডাক পড়িল। প্রথমে আমরা যাইতে কিছু নারাজ ছিলাম, কিন্তু যখন তাঁহারই মুখে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ "রামও যাহা রহিমও তাহাই" শুনিলাম, তখন আর না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

'রাম রহিম্ নেই জুদা করো।
দিল্‌কা সাচ্চা রাখো জী॥'

ভারতের এই মহামন্ত্র মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই যে তোরণদ্বার পাইলাম, তাহার মধ্যে এক বৃহৎ বরাহাবতারমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; উহার তলদেশ হইতে ভূমির ব্যবধান অত্যন্ত অল্প; সেই সামান্য স্থানের মধ্য দিয়া যিনি বিনা আয়াসে গলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চেষ্টা করিতেছে; আমিও শুইয়া কোনরূপে অপর দিকে আসিয়া নীরবে অন্যের মুক্তি-রহস্য দেখিতে লাগিলাম। একজন স্থূলকায় মারহাট্টার দুর্গতি দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারা গেল না। তাহাকে শেষে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল। মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, তাহার পুণ্যের কতক ভাগ নিশ্চয়ই আমার অংশে পড়িবে স্থির করিয়া লইলাম। ইহারই নিকটে ধূম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরসম্বন্ধে একটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। পুরাকালে শম্বূক নামে এক শূদ্র কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে কোন ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। শূদ্র তপস্যার অধিকারী নহে; ইহাতেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। শম্বূক এ মৃত্যুতে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিয়া রামকে এই পর্ব্বতশিখরে চিরদিন থাকিতে অনুরোধ করেন; আর সেই সঙ্গে আপনার পূজাও প্রার্থনা করেন। শূদ্রের সেই লিঙ্গমূর্ত্তির অপর নাম ধূম্রেশ্বর মহাদেব। রাম যে সত্যই পর্ব্বতশিখরে আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইবার সময় পাণ্ডারা মন্দিরসংলগ্ন ত্রিশূলের উপর শুকতারার মত বৈদ্যুতিক আলোকের কথা বলিয়া থাকে। ইহা প্রায় মেঘাচ্ছন্ন

দিবসে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের দুই একটা রহস্যভেদ করিতে শিখিয়া এ কথায় আমার আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

এইবার আমরা সিংহপুর তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরে যে দুইটি দুর্গ-প্রাচীর আছে, তাহার মধ্যে ভিতরের প্রাচীরটির এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; আর বাহিরেরটি এই দুর্গের নিম্ন দিয়া সোজাসুজি আম্বালা সরোবরে আসিয়া মিশিয়াছে। পশ্চিমে ও দক্ষিণে পর্ব্বতের নিরবচ্ছিন্ন উচ্চতা শত্রুপক্ষ হইতে গিরিশৃঙ্গ রক্ষা করিতেছে। বাহিরের প্রাচীরের এখন কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম, গাওয়ালীরাই নাকি ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। কিন্তু ভিতরের প্রাচীর বহু পুরাতন বলিয়া মনে হইল। সেকালে এই সিংহপুর তোরণের মধ্যেই মারহাট্টাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষিত হইত; নিদর্শনস্বরূপ দুই একটি কামানও দেখা গেল। কত শত বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কালের কঠোর স্পর্শ ইহাদের অস্তিত্ব ঘুচাইতে পারে নাই। আবার সোপানাবলী অতিক্রম করিতে লাগিলাম; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পা আর চলে না। খোকাবাবু ও ঝি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু আমার গৃহিণী একেবারে সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছেন; তিনি "আর কতটাই বা" বলিয়া উঠিতে লাগিলেন। অগত্যা আমিও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

এইবার ভৈরবদরজায় আসিলাম। বৃহদাকার দুইটি কাষ্ঠের দ্বারে লৌহের বৃহদাকার বড় পেরেক্ মারা রহিয়াছে; আর তোরণের উপর হইতে এক বিপুলায়াতন ঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে পয়সা দিয়া উহা মনের সাধে বাজাইয়া লইলাম। আঙ্গিনার দুই পার্শ্বে মন্দিরভুক্ত দাসদাসীদিগের বাস; তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে, অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রায় ২০০ লোক হইবে। ভৈরবদরজার গঠনপ্রণালী দেখিবার জিনিস বটে; পাথরের উপর কি কারুকার্য্যই না রহিয়াছে! অবাক্ হইয়া দেখিলাম। মনে ঘৃণা আসিল যে, এই পুরাতন স্থাপত্য শিল্পের আদর করিবার লোক কেহ নাই। আমাদের সব থাকিয়াও বিদেশীর নিকট আমরা নিঃস্ব; হায়, এ কথা কে বুঝে? আবার চলিতে লাগিলাম।

এই বার গোকুলদরজায় আসিলাম; এ তোরণে অস্পৃশ্যজাতীয়দিগের প্রবেশ করিবার হুকুম নাই; সে জন্য খাড়া পাহারাও রহিয়াছে দেখিলাম। আমাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; সম্ভবতঃ বেশভূষায় বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। প্রথমেই বাম দিকে মন্দিরের ঢাক ঢোল রাখিবার আস্তানা

দেখিলাম; প্রকাণ্ড এক ঢাক ঘরটি জুড়িয়া রহিয়াছে, সেটি বাজাইতে ন্যূনকল্পে বিশ জন লোকের প্রয়োজন। উহারই নিম্নে কয়েকটি সন্ন্যাসীর সমাধি ও মন্দির দেখিলাম। প্রশস্ত চত্বর বাহিয়া আবার কয়েক ধাপের পর লক্ষ্মণের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখের দালানটি আটটি মোটা থামের উপর রহিয়াছে; থামগুলি কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরের মহারাজের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাইল যে, এগুলি প্রায় ৭০০ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। তিনি এ সম্বন্ধে এক প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত প্রমাণ আমায় দেখাইয়া দিলেন; আমিও নিঃশব্দে উহা পড়িয়া লইলাম। মন্দিরটি সশস্ত্রপ্রহরিবেষ্টিত। দেবস্থান কমিটীর পক্ষ হইতে এ পাহারা নিযুক্ত। মন্দিরের গম্বুজে ছিদ্র করিয়া এক প্রকাণ্ড ঝাড় ঝুলান। ইহার দুইটি দ্বার, প্রথমটি পিত্তলনির্ম্মিত ও দ্বিতীয়টি রৌপ্যনির্ম্মিত। রৌপ্যসিংহাসনে লক্ষ্মণ আসীন; তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি রহিয়াছে। ইহারই নিকটে বশিষ্ঠ ও দশরথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অদূরে পরার্থপরতার মূর্ত্তিমতী দেবী কৌশল্যার মন্দির। এই স্থানে কৌশল্যার যে কত আখ্যায়িকা শুনিতে লাগিলাম, তাহা বলিতে পারি না। রামায়ণে সে সমস্ত পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না; মুগ্ধ হইয়া গৃহিণী সে সব কথা শুনিতে লাগিলেন আর মাঝে মাঝে মারহাট্টি ভাষায় তাহার টিপ্পনীও করি-লেন। লক্ষ্মণের মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চাতে রাম ও সীতাদেবীর মন্দির। ইহারও দুইটি দ্বার যথাক্রমে পিত্তল ও রৌপ্যমণ্ডিত; আর সম্মুখের দালানটি লক্ষ্মণ জীউর দালানের আদর্শে নির্ম্মিত। এই স্থানেও পাহারা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি কাল পাথরের; তাহার উপর অলঙ্কারের শোভা বড়ই সুন্দর দেখাইল। প্রশস্ত দালানে কত লিপি উৎকীর্ণ! তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। এই স্থানে আসিয়া আমরা সকলে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম এবং পূজাও যথারীতি হইল। রামের মন্দির পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। এতক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছিলাম, এখন মুখে হাসি ফুটিল। খোকাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ মিলে কি?" আমরা আরও হাসিলাম। বস্তুতঃই ভগবান্ দর্শন অল্পে ঘটে কি? ইহারই দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও সে স্থান হইতে অনতিদূরে আবার দুইটি কামান দেখিলাম; উহা পিত্তলের বলিয়া মনে হইল। এইবার মন্দিরের উত্তরে লবকুশের বিগ্রহ দেখিয়া কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া উহার উপরে গিয়া পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিক্ ফাঁকা, আর উপরে কেবল এক পাথরের গম্বুজ। তথা হইতে চারিদিকের দৃশ্য কি মনোরম! বহু নিম্নে রামটেক সহর পড়িয়া আছে,—ঘরবাড়ীগুলি যেন খেলাঘরের মত বোধ হইল। আর লাল্ কাঁকরের

রাস্তাগুলা যেন সূতার মতন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। দূরে অম্বালা সরোবর এক-খানি ছোট কাচের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। উপর হইতে মানুষগুলি দেখিয়া পুত্তলের মত লোক বোধ হইল। মন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি গুন্ গুন্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"রাম ঝর্কা বৈঠ্কো সব্কোমুজরোলে।
জিস্কো জেসি নক্রী উস্কো ঐ সি দে॥"

এই স্থান হইতে নামিয়া কয়েক পদ দক্ষিণে গিয়া সীতাকুণ্ড দেখিলাম। তাহার জল কিছু অপরিষ্কার; কিন্তু বড় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহারই নিকটে দুর্গের একটি দ্বার রহিয়াছে; তথা হইতে ৫০০ শত সোপান অতিক্রম করিলে একেবারে রামটেকের বাজারে আসিয়া পৌছান যায়। ধাপগুলি কিছু বন্ধুর ও উচ্চ।

শুনিলাম, গিরিশৃঙ্গে একটি ডাকবাঙ্গলাও আছে; য়ুরোপীয়গণ শিকারে আসিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। মন্দিরের এত নিকটে ডাকবাঙ্গালা শুনিয়া মনটা কিছু খাটো হইয়া গেল।

এই তীর্থে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া পক্ষকালব্যাপী এক মেলা বসে। প্রথম দিনে ত্রিপুরাসুরবধের কীর্ত্তিস্বরূপ একখানি পীতবর্ণের রেশমী কাপড় রামের মন্দিরের উপর দগ্ধ করা হয়। গোকুলদরজায় আঙ্গিনায় ও বাহিরে হাজার হাজার দোকান বসে; এই সব দোকানে কেবলই মৃৎপাত্র, পান, স্ত্রীলোক-দিগের শাড়ী, রুদ্রাক্ষমাল্য এবং তাম্র ও পিত্তলের বাসন বিক্রীত হয়। এই স্থানের মাটীর হাঁড়ি আর খাপার কাপড় চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; পান ও আতাফলের ত কথাই নাই। এ সময়ে যাত্রীর সংখ্যাও বড় কম হয় না—প্রায় দুই লক্ষ লোক তীর্থে আইসে। লোকসমাগমে মেলায় আয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে আয়োজনের ঘটাও খুব; কারণ, কার্ত্তিক পূর্ণিমার অধিক বিলম্ব নাই। এই মেলার রোজগারেই পাণ্ডাদিগের সম্বৎসর চলিয়া যায়। আপাততঃ দীপালী নিকটে বলিয়া ঘরদ্বারগুলিরও জীর্ণসংস্কার হইতেছে, দেখিলাম। নিম্নে কৃষির সুবিধার জন্য সরকার প্রকাণ্ড এক পুষ্করিণী (Irrigation reservoir) খনন করাইয়া দিয়াছেন। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের মাঠে জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়াই আবার নামিতে লাগি-লাম। তখন বেলা আন্দাজ ৩টা হইবে; মাথার উপর হইতে সূর্য্যদেব কিছু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সমস্ত দিন খাওয়া দাওয়া হয় নাই; মেজাজ্ রুক্ষ

হইয়া গিয়াছে। মাঝে মসজেদের কাছে আসিয়া এক লাড্ডুর দোকান হইতে সকলে কিছু কিছু খাবার খাইয়া লইলাম। সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ত হইবে। দোকানের মালিক জল আনাইয়া দিল; সুখে পান করিলাম। শরীর সতেজ হইল। আবার নামিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোথাও অধিক সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হইল না। মনে হয়, ৪।৫ বার বিশ্রাম করিয়াছি মাত্র! বেলা অবসান হইতে চলিল দেখিয়া গতি কিছু ক্ষিপ্র করিলাম। খোকাবাবু আমার সহিত আর দৌড়াইতে পারিলেন না; পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহাকে আবার সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য কিছু দেরী হইয়া গেল। এক্রমজাউর দরজা পর্য্যন্ত বেশ আসিলাম, তাহার পর আর পা চলে না,—কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, কেহ যদি ঝোড়ায় করিয়া নামাইয়া লয় ত ভাল হয়। যাহা হউক, রামজীর কৃপায় আমরা সকলেই সুস্থশরীরে বাসায় ফিরিলাম; দেখিলাম, দাওয়ার উপর খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া আমাদের পাচকদ্বয় বসিয়া আছেন। অতিথিসৎকার না করিয়া তাঁহারা খাইবেন না। বিলম্ব না করিয়া সকলে আহারে বসিলাম—এবং ক্ষুধাতাড়নায় অর্দ্ধসিদ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ যাহা পাইলাম, সবই উদরস্থ করিলাম। মনে মনে অবশ্য তাঁহাদের যথেষ্ট সাধুবাদও করিতে হইল, ক্ষুধার সময় থালাভরা খিচুড়ী কে যোগাইতে পারে? এমন ভাবে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ সচরাচর ঘটে না। আনন্দে পথশ্রান্তি সব ভুলিয়া গেলাম; আর সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত ও অরণ্যাণীর বিপুল সৌন্দর্য্যে মন বিভোর হইয়া উঠিল। বেলা অবসান হয় হয়; সূর্য্য অনেকক্ষণ পর্ব্বতের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; আর তিমিরবসনা সন্ধ্যা গুটি গুটি পা ফেলিয়া আম্বালার তীরে আসিয়া উকি ঝুকি মারিতেছেন। এ অচেনা দেশে বৃথা সময় কাটান সঙ্গত নহে ভাবিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র সব পুঁটুলির মধ্যে বদ্ধ করিয়া গাড়ী জুতিবার হুকুম দেওয়া গেল। ইত্যবসরে আমাদের সুদক্ষ পাচক মহাশয়রা উদর বোঝাই করিয়া রামজীর মন্দিরাভিমুখে গেলেন; যাইবার সময় গাড়োয়ানকে বলিলেন, আমাদের লইয়া বাজারের নিকট যেন গাড়ী খাড়া করিয়া রাখে; কারণ, উহাঁরা সীতাকুণ্ডের পথ দিয়া সোজাসুজি বাজারে গিয়া আমাদের ধরিবেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পাণ্ডা মহারাজের সহিত সকল সম্পর্ক কাটাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে; মোটা কাপড়গুলা গায়ে জড়াইয়া বসিলাম। আম্বালা ছাড়াইয়া আর জনমানবের



রামটেক।

K. V. Seyne & Bros.

মুখ দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ গাড়ী বাজারে আসিয়া থামিল। বাজারে খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের আত্মীয় দুইটির সহিত দেখা হইয়া গেল। যথাক্রমে আমরা যে যাহার গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। এবারে সুধীশের কোন আপত্তিই টিকিল না; সে সুবোধ ছেলের মত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে; ফুল্ল জ্যোৎস্নায় পূর্ণিমার রাত্রি ঠিক করিতে পারা গেল না। কাল পাহাড়ের উপরে চাঁদ বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম; আর চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পথশ্রান্তি সব ভুলিয়া গেলাম। পথে 'নেড়াদা' গান ধরিতেন; আমরা গাড়ীর হ্যাঁচ্‌কা টানে যতদূর সম্ভব, উহার রসাস্বাদন করিতে করিতে চলিলাম। ক্রমে রামটেক পশ্চাতে রাখিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন প্রায় ৮টা হইবে। জনতায় প্রথমটা ভিতরে ঢুকিতে ইচ্ছা করিল না; শেষে গাড়ী ছাড়িবার অনেক দেরী আছে শুনিয়া রেলের কোন কর্ম্মচারীর "বেওয়ারীশ" খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমাদের দল পুরু দেখিয়া বোধ হয়, কেহ উঠাইতে সাহস করিল না। সুধীশও নিশ্চেষ্ট নহে; গাড়ী আসিবার বিলম্ব দেখিয়া টিকিট-ঘরের দিকে ক্রমাগত দেখিতে লাগিল। তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া এক ক্ষুদ্র কাঠগড়ার মধ্যে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে বিপুল জনতার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা সহজ কথা নহে। আজ আর যাওয়া হইবে না বলিয়াই এক রকম আমরা সাব্যস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু কেবল সুধীশের চেষ্টায় যথাসময়ে টিকিট কাটিয়া আমরা আবার নাগপুরে রওনা হইলাম। সে রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরি, তখন ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা ঘা পড়িল; মনে হইল—একটা; কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইবার জন্য ঘড়ির কাছে যাইয়া দেখি, সাড়ে দশটা!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

রক্ষা-কবচ।

১

মাতাকে ভাল মনে পড়ে না, পিতা গ্রামের ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। এরূপ কার্য্যের জন্য যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, পিতার তদপেক্ষা অনেক অধিক বিদ্যা ছিল। লোক বলিত, তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উচ্চতর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু সাংসারিক উন্নতির চিন্তা তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়কে কোন দিন বিচলিত করিতে পারে নাই। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'সীতার বনবাস' পড়াইতেন এবং 'পদ্যপাঠ' তৃতীয় ভাগের অন্বয় বুঝাইয়া দিতেন; আর বাটীতে আসিয়া সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল লইয়া বসিতেন।

আমার সঙ্গে পিতার যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইত, সে কেবল সাংখ্য, বেদান্ত ও গীতা লইয়া।

"মায়া," "অবিদ্যা," "প্রকৃতিপুরুষ," "দৈব," "পুরুষকার," "প্রাক্তনসংস্কার," "কর্ম্মফল," "প্রাণায়াম," "প্রত্যাহার," "সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধি"—কোন কথাই বাকি থাকিত না। পিতার পণ্ডশ্রম দেখিয়া খুবই হাসি পাইত; কিন্তু কথাগুলা শুনিতেও মন্দ লাগিত না।

বিষয়বুদ্ধিহীন অসহায় পিতার জন্য বাল্যকাল হইতেই খেলাধূলা ছাড়িয়াছিলাম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেহই ছিল না। পিতা যখন বিদ্যালয়ে থাকিতেন, তখন হয় ত বসিয়া বসিয়া বাটীর সম্মুখস্থ ভাগীরথীর অনন্ত উর্ম্মিমালা দেখিতাম, নহে ত বিহগকূজিত নির্জ্জন আম্রকাননের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম।

এমনই করিয়া সংসার-বনবাসে বেদান্ত ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতে করিতে কবে যে নিজের অজ্ঞাতসারে আমিও একটি ছোট খাট বৈদান্তিকে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। আমার বুদ্ধিমতী প্রতিবেশিনীবৃন্দ আমার বুদ্ধিহীনতা এবং অস্বাভাবিকতা দেখিয়া সময়ে সময়ে সত্য সত্যই আমার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন।

কোমল দেহকে কঠিন স্বর্ণালঙ্কারে প্রপীড়িত করিয়া নিদারুণ গ্রীষ্মে মূল্যবান্ বডি, শাড়ী ও সেমিজের স্থূল আবরণে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পুরসুন্দরীগণ

আমার ভূষণহীনতাদর্শনে যখন সমবেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেন, তখন হাস্য সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিত এবং প্রাচীন গ্রাম্য শিরোমণিবৃন্দ যখন যমালয়ের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া জীবনসন্ধ্যায় সুদ-কসাকে বেদান্তচর্চ্চার ঊর্দ্ধে স্থান দান করিয়া পিতার বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিতেন, তখন আমার "চারু বিম্বাধর" কিছুতেই অন্তর্নিহিত "মুক্তাকলাপকে" গোপন করিয়া রাখিতে পারিত না।

এমনই করিয়া ভাগীরথীর স্রোতোতাড়িত কুসুমদামের মত পিতাপুত্রীতে নির্ব্বিকার চিত্তে ধীরে ধীরে সংসারস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। এমন সময়ে আমাদের পরমহিতৈষী প্রতিবেশীবৃন্দ লোষ্ট্রাহত মধুমক্ষিকার মত সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্নদংশনে আমাদের ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমার বয়ঃক্রম নাকি পঞ্চদশের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছিল। পিতা একদিন সন্ধ্যার পর ম্লান-মুখে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুশীলা! তবে তোমার ত বিবাহের প্রয়োজন।"

শিশুপ্রকৃতি পিতা সমাজের অনুশাসন কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহার উদ্বেগ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। কি করিয়া তাঁহার এই দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পিতার সে দিন আর বেদান্তপাঠ হইল না। বোধ হয়, তিনি আমার স্বর্গীয়া জননীর কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি জীবিতা থাকিলে আজ বোধ হয় পিতাকে একাকী এ দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইত না।

২

পিতাকে অধিক দিন দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইল না—প্রজাপতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মুকুন্দপুরের মুখোপাধ্যায় মহাশয় ("জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী!") পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে পত্নীহীন হইয়া বিরহব্যাকুলিত-চিত্তে নবীনা গৃহলক্ষ্মীর সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শুভক্ষণে আমার পিতৃগৃহে পদধূলি প্রদান করিলেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি অধমার প্রতি নিপতিত হইল। অতিরিক্ত মাত্রায় করুণারসার্দ্র হইয়া পরম-কুলীন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "পণ" এবং অলঙ্কারের দাবি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমাদের সৌভাগ্য-দর্শনে প্রতিবেশী-বৃন্দ নিতান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। সমবেদনাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! বিষয়বুদ্ধিহীন পিতা কিন্তু এই সৌভাগ্যের পরিমাণ বোধ হয় সম্যক্ উপলব্ধি

করিতে পারেন নাই। ভাবী জামাতার প্লীহাপীড়িত শীর্ণ মূর্ত্তি এবং শিরোদেশের শুভ্র সুষমা বোধ হয়, তাঁহাকে কিছু উদ্বিগ্ন করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। রূপ? রূপ কয় দিনের জন্য? আর বিবাহ যদি ধর্ম্মসম্বন্ধ হয় এবং প্রেমের সাধনা যদি সংযমের সাধনারই নামান্তর হয়, তাহা হইলে হিন্দু-বিবাহে রূপের স্থান কোথায়?

শুভদিনে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে সরলহৃদয় পিতাকে কপিল, শঙ্কর, গৌতম ও পতঞ্জলির হস্তে সমর্পিত করিয়া বধূবেশে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন না। পিতার দ্বিতীয় বিবাহে ক্রুদ্ধ পুত্র মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাকে লইয়া স্বামী আমার নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার হাঁকডাকে ও ছুটাছুটিতে নীরব পল্লী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সুতরাং সহানুভূতিপরায়ণা প্রতিবেশিনীবৃন্দের নিকট বিশেষ কোন সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সলজ্জ বধূবেশ পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা আমাকেই সংসার-রথের সারথ্য গ্রহণ করিতে হইল। স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশণ করিয়া আমাকেই নামমাত্র "পাকস্পর্শকে" রীতিমত "সার্থক" করিয়া দিতে হইল।

নিমন্ত্রিতা মহিলাকুল আহারান্তে কলিকালের অপরূপ মাহাত্ম্য, নববধূর গৃহিণীপনা এবং আমার সপত্নীপুত্র অতুলের নিদারুণ দুরদৃষ্টসম্বন্ধে সুগভীর আলোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

অপরাহ্নে পল্লীর সুরসিকা যুবতীবৃন্দ আসিয়া ধরিয়া বসিল। দুই ঘণ্টাকাল তাহাদের অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া একটি "আড়ষ্ট" সুচিত্রিত পুত্তলিকায় পরিণত হইলাম।

রাত্রিতে আহারান্তে যুবতীবৃন্দ আমাকে ধরাধরি করিয়া স্বামীর শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিল। আজ আমাদের "ফুলশয্যা"!

শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, স্বামী যন্ত্রণায় শয্যার উপর ছট্‌ফট্ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?" স্বামী কহিলেন, "পেটে বড় যন্ত্রণা।" বুঝিলাম, পত্নীর মন রক্ষা করিতে গিয়া স্বামী উদরের প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছেন। সাজসজ্জা ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া লবণ ও যমানী আনিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া দিলাম এবং তৈল ও জল লইয়া উদরে মালিশ করিতে বসিয়া গেলাম।

স্বামিস্ত্রীর প্রথম মিলন দেখিবার জন্য কক্ষের আশে পাশে যে সকল কুতূহলী চক্ষুশতদল থরে থরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া তাহারা সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রায় সমস্ত রাত্রি সেবার পর স্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিদ্রিত হইলেন। আমিও পরিশ্রান্ত-দেহে এক পার্শ্বে শুইয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িলাম। "ফুলশয্যা" নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

৩

প্রথম প্রথম স্বামী আমায় একেবারে প্রেমের কূলপ্লাবী প্লাবনে প্লাবিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সোহাগ করিয়া—ভালবাসিয়া—ভাল কথা বলিয়া কিছুতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

আমাকে পরিশ্রম করিতে দেখিলে তিনি একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং এক তিলের জন্যও আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিতেন না। তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার সপত্নীর হস্তরোপিত বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহার স্মৃতির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখেন নাই!

স্বামীর প্রেমের এই অসঙ্গত আতিশয্য দেখিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত হাসি পাইত। সেও একদিন আমারই মত সংসারের সমস্ত চিহ্ন আবৃত করিয়া স্বামীর হৃদয়-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপনের পূর্ণ অধিকার লইয়া আসিয়াছিল। হায় "অমূল্য অবিনশ্বর" প্রেম!

স্বামীর সন্তোষের জন্য স্নেহের সকল অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিতে হইত। কিন্তু অস্বাভাবিক আতিশয্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না। এক মাস যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারিলাম, আমার রূপসূর্য্য স্বামীর হৃদয়-শতদলকে আর বিকশিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাঁহার চিরপরিচিত তাস, পাশা, দাবা এবং বন্ধুসঙ্গ ক্রমেই তাঁহার একাগ্রচিত্তকে উন্মনা করিয়া দিতেছে।

কিন্তু নিজের নিকট নিজের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, অনেক সময় সহজে স্বীকার করা চলে না। সুতরাং, আমার প্রতি আচরণের পরিবর্ত্তনব্যাপারে স্বামীকে যথেষ্ট ইতস্ততঃ করিতে হইতেছিল।

এমন সময়ে স্বামীর এক পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় এক দিন সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বামী এই অসময়ে তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং তাহাকে

আমার সঙ্গিরূপে রাখিয়া বহুদিন পরে বন্ধুত্বের মুক্ত বায়ুতে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ছেলেটির নাম সুধীর। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির যুবা আমি কখনও দেখি নাই। প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়মবিপর্য্যয়ে নবীন যৌবন তাহার সুগঠিত গৌর দেহের সর্ব্বত্র আপনার রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াও তাহার শিশুসুলভ সরল চিত্তকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রশান্তায়ত অচঞ্চল নয়নেই যেন এ কথা ফুটিয়া বাহির হইত; এজন্য তাহার সঙ্গে বুঝি আলাপ করিবারও প্রয়োজন হইত না। সে যাহার সংস্পর্শে আসিত, তাহারই নিকট আপনার সমস্ত জীবনটুকু যেন উন্মুক্ত পুস্তকের মত ধরিত; কিছুই সে গোপন করিতে জানিত না। সুধীর এই অল্প বয়সেই অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। বাজার-সরকারি, খানসামাগিরি, যাত্রার দলের ছোক্‌রাগিরি প্রভৃতির তীক্ষ্ণ কণ্টক-খচিত পঙ্কিল পথ বাহিয়া তাহাকে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু কোন স্থানের কিছুমাত্র ক্লেদ বা অপবিত্রতা তাহার সরল চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে যাহা কিছু শিখিয়াছিল, সে শুধু পঠিত শুকের অভ্যস্ত বুলির মত, তাহার সঙ্গে তাহার চিত্তের কোন সংযোগ ছিল না।

তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোক যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিত। সে কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিত না।

এই অদ্ভুত বালককে পাইয়া আমার চিত্ত সহজেই তাহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া উঠিল।

সুধীর সকল কার্য্যেই আমাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত। তাহার সরল জীবনের বিচিত্র ইতিহাস আমাকে মুগ্ধ করিত। তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে করিতে সে যে পুরুষ মানুষ, এ কথাও অনেক সময় মনে আসিত না।

সুধীর জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। সুতরাং বহুকাল পরে স্নেহের আস্বাদ পাইয়া সেও আমাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না।

এই জনহীন সংসারে আমরা উভয়েই উভয়ের মধ্যে একটা প্রবল অবলম্বন পাইলাম।

৪

বিবাহের ছয় মাস পরে শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রকে প্রথম দেখিলাম। অতুলচন্দ্র প্রথম আঘাতেই মহিষের মত আরক্ত বক্রদৃষ্টিতে আমার প্রতি নেত্রপাত

করিলেন। বিনা বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় হৃদয়ে কিছু ক্ষোভের সঞ্চার হইল।

"সৎ"-মা'র চিরন্তন অপবাদ ঘুচাইবার জন্য যত্ন ও ত্যাগস্বীকারে ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুত্রবর আমার এই স্নেহ ও সৌজন্যের মধ্য হইতে কৃত্রিমতার বিষাক্ত বীজাণু আবিষ্কার করিয়া আমার প্রতি ক্রমেই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া অবশেষে বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করিলাম।

নবীন প্রেমের প্রথম কুহকের অবসানে স্বামীও পুত্রের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাহার প্রতি আচরিত অবিচারের কলঙ্ককালিমা যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষালিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থির হইল, গৃহচ্যুত অতুলচন্দ্রকে পুনরায় গৃহ-প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর অভিপ্রায়ের সমর্থন করিলাম। বৈশাখের শুভতিথিতে নির্ব্বিঘ্নে অতুলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

পাত্রী বয়স্থা। "ধূলা পায়ে ঘরবসত" হইল। গৃহহারা অতুলচন্দ্র নিজ গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিবাহিত জীবনের প্রথম সঙ্কোচ ও আনন্দোচ্ছ্বাস উপশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে বধূমাতার বেশ "অশিক্ষিত পটুত্বে"র পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই বধূমাতা বধূত্বের শাসন অতিক্রম করিয়া গৃহিণীপনার প্রভুত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এ জন্য স্বামিস্ত্রীর মধ্যে নিরন্তর সুগভীর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কে বলে, বাঙ্গালী রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার অজ্ঞাতসারে বিপুল চিন্তা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিদিন ধীরে ধীরে আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার ব্যূহ, ছলনার পরিখা এবং কপটতার প্রাচীর রচিত হইতেছিল, তাহা কোন চাণক্যের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত আয়োজন অপেক্ষা হীন নহে। নানা কৌশলে বিচিত্র অভিনয়ের দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূ নিরন্তর আমাকে স্বামীর নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

তাঁহাদের নিরন্তর দুশ্চিন্তাকুটিল ম্লান মুখ দেখিয়া এক দিন মনে বড় দুঃখ হইল। এক দিন বধূমাতাকে একান্তে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিলাম, "বৌমা, তুমি এখন সেয়ানা হইয়াছ, নিজের ঘরকন্না বুঝিয়া সুঝিয়া লও না কেন? আমি দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট। গৃহিণীপণায় আমার সাধ নাই।"

কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। বধূমাতার চতুর মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে সাভিমানে বলিলেন, "আমি কোথাকার কে? ঠাকুরের ঘরকন্না। তুমি ঘরের গিন্নি। আমি তোমার দাসী বই ত নই!"

ত্রয়োদশবর্ষীয়া অকালপক্কা বালিকার মুখে এই উচ্চশ্রেণীর নীতিকথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বধূমাতা ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রুতবেগে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে শুনিলাম, পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই ঘোরতর শিরঃপীড়ায় অভিভূত—শয্যাত্যাগে অক্ষম। সংবাদ লইতে গেলাম। কেহ বাক্যালাপ করিলেন না। রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া দুই থালা অন্নব্যঞ্জন কক্ষমধ্যে রাখিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে পরিচারিকা শূন্য পাত্র ফিরাইয়া আনিল। শিরঃপীড়া কিন্তু অক্ষুণ্ণই রহিল।

জটিল মনুষ্যচরিত্রের রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া সুধীরের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম।

৫

স্বামী বাটীতে ছিলেন না। রাত্রির রন্ধনাদি সমাপনান্তে নিজকক্ষে বসিয়া সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। সুধীর তাহার জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনার অদ্ভুত গল্প করিতেছিল—যাত্রার দলের "অধিকারী" প্রতিদিন কি রকম পা টিপাইয়া লইত, কি রকম করিয়া বেহালাদার ও "মোশন মাষ্টার" যষ্টির সাহায্যে সঙ্গীত ও বক্তৃতা শিক্ষা দিত, উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া দৈবাৎ ঘুমাইয়া পড়িলে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল ইত্যাদি। সুধীর মধ্যে মধ্যে আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী অভিনয় করিয়া দেখাইতেছিল। কাযেই অনেক সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এই নির্দ্দোষ প্রমোদের অন্তরালে আমারই গবাক্ষতলে যে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা কেমন করিয়া জানিব?

সহসা স্বামী হুঙ্কার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার পুত্র ও পুত্রবধূ স্তম্ভিত-মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বামী প্রবেশ্ করিয়াই মুষ্টিবদ্ধহস্তে—আরক্তনয়নে কহিলেন, "পাপিষ্ঠা, আমার অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি? আজ যদি তোর রক্ত দর্শন না করি ত আমার নাম রামজয় মুখুয্যে নহি।" ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি কি বোল্‌ছো?" স্বামী হুহুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "একেবারে এত দূর? সম্বন্ধবিচার পর্য্যন্ত ভুলে

গিয়েছিস্ ?" ব্যাপার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। সরল শিশুপ্রকৃতি সুধীরের প্রতি যে কাহারও এরূপ সন্দেহ হইতে পারে, এ কথা কখনও কল্পনা করিতেও পারি নাই। শুনিয়া ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইল, যে এরূপ অবস্থাতেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার কি মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে ? কি বল্‌ছো ? সুধীরের উপরেও মানুষের সন্দেহ হ'তে পারে ?"

আমার ধর্ম্মনিষ্ঠা বধূমাতা আমার নির্লজ্জতাদর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা ! 'হাতে দই, পাতে দই, তবু ব'লে কই কই !' " পুত্রবর লগুড়হস্তে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বেরোও এখনিই বাড়ী থেকে, নইলে আমি রাগ সাম্‌লাতে পারব না। খামখা একটা খুনখারাবি হ'য়ে যাবে।" এতক্ষণে ব্যাপারটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝেছি। কিন্তু এর জন্য এত ষড়যন্ত্র কেন ? সোজা কথায় বল্‌লেই হ'ত। আমি ত আমার 'ময়ূর-সিংহাসন' আপনা হ'তেই বৌমা'কে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম।" আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং আমার আচরণ দেখিয়া স্বামী কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, এ জন্য পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

* * * * * * * *

বহুদিন পরে আবার পিতার সেই সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ তপোবনে প্রবেশ করিলাম। পিতার সেই সাংখ্য, বেদান্ত, গীতার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হইল, সংসারের ক্রূরতা, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, সুখ, দুঃখ—সব মিথ্যা, সব মায়া, সব অবিদ্যা।

দুই মাস না যাইতেই এক দিন স্বামী সহসা আমার পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার মুখ লজ্জায় মলিন ও চক্ষু জ্যোতির্হীন। তিনি আমার প্রতি ঘোরতর অবিচারের জন্য এক সুদীর্ঘ অনুতাপসূচক বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম ; বলিলাম, "সে জন্য অনুতাপের প্রয়োজন নাই বল, এখন কি করিতে হইবে।"

স্বামী বলিলেন, "আমি মূঢ়, তোমার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই; হতভাগ্য পুত্র ও পুত্রবধূর কুমন্ত্রণায় তোমাকে অপমানিত করিয়াছি। চল, দয়া করিয়া আবার আমার অন্ধকার মন্দির আলোকিত কর!"

আমি বলিলাম, "আমি গেলেই আবার বেচারারা উত্যক্ত হইয়া উঠিবে। তাহাদের উত্যক্ত করিয়া কি লাভ? আমি কেন কিছুদিন এখানেই থাকি না?"

স্বামী বলিলেন, "না, সে কিছুতেই হইবে না। যাহারা তোমাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে, তাহাদের আমি কিছুতেই আমার গৃহে স্থান দিব না।"

মনুষ্যচরিত্রের অদ্ভুত অব্যবস্থিততার কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলাম।

পুত্রবর আমার দিকে চাহিয়া অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বধূমাতা আকাশের দিকে চাহিয়া "আঙ্গুল মট্‌কাইলেন!" কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পিতার ভীষণ তাড়নায় পুত্র ও পুত্রবধূকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিতে হইল। স্বামীকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। অপরাহ্নে উচ্চ কণ্ঠে আমাকে গালি দিতে দিতে এবং পিত্রালয়ের ঐশ্বর্য্য ও অন্নবাহুল্যসম্বন্ধে সসমারোহ ঘোষণা করিতে করিতে বধূমাতা শিবিকারোহণ করিলেন।

পুত্রবরকে কিছু দুশ্চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল। পত্নীর দুন্দুভিনিনাদ সত্ত্বেও শ্বশুরালয়ের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার অগোচর ছিল না। অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। আমি গোপনে আমার কয়েকখানি অলঙ্কার আনিয়া অতুলের হস্তে দিয়া বলিলাম, "বাপবেটার ঝগড়া কখনও স্থায়ী হয় না। দু'দিন পরেই সব মিটিয়া যাইবে। ইহার মধ্যে যদি কষ্ট পাও, ইহা হইতে খরচ করিও।" পুত্র আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না; কিন্তু অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার "নিত্যানিত্য বিবেক" দেখিয়া সুখী হইলাম।

বধূমাতার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু অনুরোধে তাঁহাকে কিছু আহার করাইয়া দিলাম এবং দক্ষিণাসহ কিঞ্চিৎ আহার্য্য শিবিকামধ্যে দিয়া আসিলাম। স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী স্বামীর পন্থারই অনুসরণ করিলেন!

পরদিন শুনিলাম, আমার কুৎসায় সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আমিই যে পুত্র ও পুত্রবধূর গৃহত্যাগের একমাত্র কারণ এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং আমা হইতেই পরিণামে যে মুখোপাধ্যায় বংশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সে সম্বন্ধেও কাহারও চিত্তে অনুমাত্র সংশয় নাই।

বলা বাহুল্য, শুনিয়া ধরাশায়িনী হই নাই। পিতার উপদিষ্ট বেদান্তদর্শন সুখেদুঃখে, সম্পদেবিপদে, রক্ষা-কবচরূপে আমার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

মহেশপুরের সূর্য্যরাজা।

(প্রতিবাদ)

আমরা ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্তে' "মহেশপুরের সূর্য্যরাজা" প্রবন্ধ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। বল্লালসেন তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রকে যথাসময়ে আনয়ন করায় সন্তুষ্ট হইয়া জালজীবী কৈবর্ত্তদিগকে জলাচরণীয় করিয়াছিলেন, এই গল্প যে সম্পূর্ণ অলীক উপন্যাসমূলক, তাহা আমি ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্যমাঝি" শীর্ষক প্রবন্ধে 'নব্যভারতে' প্রমাণ করিয়াছি।

বল্লাল কর্ত্তৃক কোন অনাচরণীয় জাতি আচরণীয় হইতে পারে না। কোন যুগেই ব্রাহ্মণগণ এত নিস্তেজ ছিলেন না। রাজাজ্ঞায় অন্ত্যজ জাতির জল ব্রাহ্মণ পান করিবেন, ইহা অসম্ভব। যে ব্রাহ্মণগণ, বল্লালসেন চণ্ডালী উপপত্নী গ্রহণ করায় অনাচার দুষ্ট বলিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা বল্লালের ভয়ে অন্ত্যজ জাতির জলপান করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ঘটক মুলো পঞ্চানন মহাশয়ের কারিকায় নিবদ্ধ আছে। যথা—

"বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে, দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পিতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃবলে গণ্য অত্রথ তত্রত্য॥

তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধা মাত্র ধরে॥
* * * * *
অসৎ প্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।”

বল্লাল সেন ধীবর সূর্য্য মাঝিকে ভূমি পুরস্কার দিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও নুলো পঞ্চানন মহাশয় তাহা অবগত:ছিলেন। যথা—

সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত॥

সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যমাঝি পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সমগ্র অংশ পুরস্কার পায় নাই। তাহার কিয়দংশ হালিকের রাজ্য ছিল। হালিকের রাজ্যের অপরাংশ লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ। সুতরাং যখন সূর্য্যমাঝি জায়গিরস্বরূপ যোগীন্দ্রদ্বীপ (সূর্য্যদ্বীপ) বা যোগিনীদহ ওরফে মহেশপুর পাইলেন, তখন মাহিষ্যগণ লাট কঙ্কদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। মাহিষ্যগণ যে কেবল এই দুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা নহে। ইহাতে বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত তম্‌লুক্, সুজামুঠা, ময়নাগড়, তুর্কা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ স্বীয় স্বীয় গড়ে দীনভাবে জমীদারী শাসন করিতেছেন। দিনাজপুর জিলায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ২য় মহীপাল দেব অত্যাচারী হইলে কৈবর্ত্ত জননায়ক দিব্যক মহাপ্রতাপে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ২য় মহীপালের প্রাণসংহার করিয়া রাজশক্তি নিজবংশে স্থাপন করিয়াছিলেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে বরেন্দ্রের একচ্ছত্রী রাজা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা বল্লালের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। (‘গৌড়রাজমালা’ দ্রষ্টব্য)। ধীবর সূর্য্যমাঝি রাজা বল্লালের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন; কিন্তু মাহিষ্য কৈবর্ত্ত কোন দিন বল্লালের অনুগ্রহ চাহেন নাই। তাঁহারা বল্লালের প্রতিদ্বন্দী জাতি।

অপর পক্ষে দেখুন—যখন ব্রাহ্মণগণ বল্লালের পৌত্র মাধবসেনের সভায় বসিয়া গ্রাম ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন বলিতেছেন,—

সাগর হতে উত্থিত মেদনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম॥

এই পয়ারে দেখা গেল, মেদনীপুরে চিরকালই কৃষিব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের বাস। সমগ্র কৈবর্ত্ত কিরূপে জাল ছাড়িয়া হালিক বা মাহিষ্য হইল ?

মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ও জালিক কৈবর্ত্ত যে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণেরই জ্ঞানে আইসে না। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা সমাজের খবর রাখিতেন, তাঁহারা এই দুইটি জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় তদীয় চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন—

দুই জাতি বলে দাস, মৎস্য মারে চষে ঘাষ,
তেলীরা নগরে পীড়ে ঘানি।”

মৎস্য মারা দাস ও চাষচষা দাস যে পৃথক্ জাতি, তাহা কবিকঙ্কণ জানিতেন।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

যশোহরের পত্র।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তৎকালীন জজ মিষ্টার প্রিঙ্গালের পত্নী ক্রিশ্চিয়ানা প্রিঙ্গাল কর্ত্তৃক লিখিত। পত্রগুলিতে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই; তবে ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরাজ মহিলা যশোহর সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা একটু চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, এই বিবেচনায় সেগুলিকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল।

(প্রথম পত্র)

এই পত্রখানি যশোহর হইতে ১৮৩০ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে মিসেস প্রিঙ্গাল তাঁহার ভগিনীকে লিখিয়াছিলেন।

“স্থানটি দেখিতে সুন্দর। অধিবাসীদিগের বিভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি জানিবার জন্য আমি জনকে (১) প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি এবং জানিতে পারিলে সন্তুষ্ট হই। জন এখানে জজ হইয়া আসিয়াছেন। ম্যাজ-

(১) লেখিকার স্বামী যশোহরের তৎকালীন জজ।

ওয়েল এই স্থানের কালেক্টর। সম্ভবতঃ একজন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটও প্রেরিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত একজন ডাক্তারও আছেন। মাত্র এই কয়জনই স্থায়ী বাসিন্দা (২); তবে আমরা কলিকাতা হইতে মাত্র ৮০ মাইল'ও ঢাকা হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। ঢাকা একটি বৃহৎ সহর। এ স্থান আমাদের পছন্দ হইলে আমরা কিছুদিন এই স্থানে থাকিব।"

(দ্বিতীয় পত্র)

এই পত্র ১৮৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত। ইহাও তাঁহার ভগিনীকে লিখিত হইয়াছিল।

"জন প্রতি রবিবার প্রাতে তাঁহার কাছারী-ঘরে প্রার্থনা করিবেন; কেন না, এ স্থানে গির্জ্জা নাই। সেই জন্য সকল ক্রিশ্চিয়ানই প্রতি রবিবার প্রাতে ঐ কাছারীগৃহে প্রার্থনার জন্য সমবেত হইবেন। শ্রীরামপুরের মিস-নারী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন এতদ্দেশীয় পাদরীও এই স্থানে থাকেন। ইনি কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেন। ইহাঁরা একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত করিয়াছেন। একটি বিধবা ও তিন হইতে আট বৎসরবয়স্ক ১৬ টি বালিকা এই স্কুলে অধ্যয়ন করে।

"ইহারা ইংরাজী জানে না, বঙ্গভাষাতেই উত্তরপ্রত্যুত্তর করে। এই বালিকা-বিদ্যালয় আমরা অনেক সময় পরিদর্শন করি। পাদরীটি আমাকে বলিলেন যে, বালিকাদিগকে শেলাই শিক্ষা দিবার লোকের অত্যন্ত অভাব। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, যদি তাহারা প্রত্যহ আমার গৃহে যায়, তাহা হইলে আমি এই অভাব পূরণ করিতে পারি। এতদুদ্দেশ্যে আমি কলিকাতায় কাঁচি, সূচ ও অঙ্গুস্তানা পাঠাইতে লিখিয়াছি। এই সামান্য অভাবটুকু মোচন করিতে পারিব মনে করিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

"শৃগালগণ অত্যন্ত উৎপাত করে এবং তাহাদের স্বর অত্যন্ত কর্কশ। গৃহমধ্যে চর্ম্মচটিকাও অত্যন্ত বিরক্ত করে। দেশবাসীদের বিবাহাদি এই সময়েই হয় এবং দিবারাত্রি তাহাদের ঢোলের বাদ্য শুনিতেছি। সে দিন একটি বৃদ্ধ কালা আদমীর (৩) সহিত অনেকক্ষণ আলাপ হইয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় সৎকারের

(২) বাসিন্দা অর্থে য়ুরোপীয় বাসিন্দা।

(৩) Black native

জন্য লওয়া হইয়াছিল। তাহার তিনটি পুত্র আছে—তিনটিই বিবাহিত; কিন্তু সে একদিনও পুত্রবধূদের মুখ দেখে নাই; কেন না বাঙ্গালীদের মধ্যে পুত্রবধূর মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সে, তাহার তিন ভ্রাতা, তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, পৌত্রগণ ও তাহার বৃদ্ধা মাতা একই বাড়ীতে বাস করে।"

(তৃতীয় পত্র)

এই পত্র ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত হইয়াছিল।

"গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমরা যখন গাড়ী করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন বিক্রয়ার্থ অনেকগুলি হস্তী দেখিতে পাইলাম। ঐ সময়ে রাজাকেও দেখিলাম। (৪) রাজার বয়স আন্দাজ উনিশ বৎসর হইবে; দেখিতে সুন্দর এবং ব্যবহার বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ন্যায়। তাঁহার চক্ষু দুইটি বৃহৎ; তাঁহার হস্তদ্বয় কৃশ এবং তিনি কৃশকায়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তখন আমাদের সময় হইবে না—বারান্তরে যাইব বলিলাম।

"দুঃখের বিষয়, এ স্থানে দেখিবার কোন জিনিষ নাই, অথবা এমন কিছু নাই, যাহা তোমাদের পাঠাইতে পারি।"

(চতুর্থ পত্র)

এই পত্রখানি ক্রিশ্চিয়ানা তাঁহার পিতামাতাকে লিখিয়াছিলেন। পত্রের তারিখ ১৯শে এপ্রিল।

"গত রবিবারে হিন্দুদের একটি পর্ব্ব-দিন ছিল। আমরা চড়ক দেখিতে গিয়াছিলাম। হিন্দুগণ পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই দিন প্রায়শ্চিত্ত করে। প্রত্যেক বাজারে বা গ্রামে একটি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড আছে; এই সকল দণ্ড হইতে ৪।৬।৮ গাছি করিয়া রজ্জু ঝুলিতে থাকে। প্রায়শ্চিত্তাভিলাষী হিন্দু নিজ পৃষ্ঠদেশে আংটা বিদ্ধ করিলে এই সকল দড়ীর সহিত ঐ আংটা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা ৫ মিনিট করিয়া ঝুলিতে থাকে। আমার বিশ্বাস, কেবল নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণই এরূপ করিয়া থাকে। অবশ্যই ইহাতে ইহারা যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ পায়; কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ইহারা অতিরিক্ত পরিমাণ

(৪) চাঁচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায়

অহিফেন-সেবনে জ্ঞানশূন্য হইয়া এরূপ করিয়া থাকে। এ দৃশ্যে অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট হই নাই। তত্রাচ এই দেশে বাস করিয়া দেখিতে না যাওয়াও বোকামী মাত্র। অনেক জনসমাগম হইয়াছিল এবং অবশ্যই হিন্দুদের একঘেয়ে বাদ্যও ছিল।"

(পঞ্চম পত্র)

৫ই মে লিখিত।

"সহরের প্রত্যেক পুষ্করিণী ও নালা মৎস্যে পরিপূর্ণ। আজ যে সকল নালায় বিন্দুমাত্র জল নাই, কালে বর্ষা হইয়া সেগুলি জলপরিপূর্ণ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যে ভরিয়া যাইবে। সে দিন নিকটবর্ত্তী বাগানেই প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরা গিয়াছিল। (৫) আজকাল এ স্থানে এত মশা যে, তাহারা অনবরত হস্তপদাদি দংশন করিতেছে। (৬) এ স্থানে না আসিলে ইহার সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না।"

(ষষ্ঠ পত্র)

২৩শে মে লিখিত।

"কাছারী-গৃহে প্রতি রবিবার প্রার্থনার সময় প্রত্যেকেই সমবেত হয়েন। এমন কি, কাজকর্ম্ম উপলক্ষে যে সকল নীলকর সহরে আসিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। আমাদের স্কুলের কাজও বেশ চলিতেছে। স্কুলে আরও ২টি বিধবা ভর্ত্তি হইয়াছে এবং মোজা বুনিতে শিখিয়াছে।

"১লা জুন হিন্দুদের একটি পর্ব্বদিন। এই দিবসে তাহারা পাপমুক্ত হইবার জন্য গঙ্গাস্নান করে। গত ২।১ দিনের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু এই পথে গঙ্গায় স্নানার্থ গিয়াছে। গঙ্গা এই স্থান হইতে ৬০ মাইল দূর।* অনেক যাত্রী ২।৩ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাইতেছে। রাজপথ স্নানযাত্রিপূর্ণ। গতকল্য সন্ধ্যার সময় যখন আমরা বেড়াইতেছিলাম, তখন মনে হইতেছিল যে, ইংলণ্ডের কোন প্রধান মেলা বা মহাসভার নির্ব্বাচন হইতেছে। প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গেই খাদ্য আছে এবং অনেকের সঙ্গেই নিজ নিজ সন্তান আছে।

---

(৫) এখন যশোহরে মৎস্য সুলভ নহে—একান্ত দুর্ল্লভ

(৬) মশকের উৎপাত আজও আছে।

* চাকদহে।

অনেকগুলি যাত্রী বৃদ্ধ; এক মাইলও হাটিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। ক্লান্ত হইলে, একজন অপরকে সাহায্য করে। রাত্রিতে এক এক গ্রামের লোক একত্র হইয়া উন্মুক্ত ময়দানে রাত্রিযাপন করে। এ দৃশ্য সুন্দর ও অত্যাশ্চর্য্য। আমার বোধ হইতেছিল, যেন প্রাচীন কালের ইহুদীগণ নিজ নিজ পরিবারবর্গসহ দেশদেশান্তর হইতে জেরুজালেমে সমবেত হইতেছে।

"অধিবাসীরা মাত্র একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। ইহার অধিকাংশ 'কোমরবন্ধের' ন্যায় জড়ান থাকে। বাইবেলে যেমন 'স্কেপগোট' আছে, হিন্দুদের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত। দেশে যখন কোন হিন্দু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, * তখন একটি ষণ্ডকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র ভ্রমণ করে; অপরের ক্ষেত্রের শস্য ধ্বংস করিলেও কেহ কিছু বলে না, কেন না, ইহা পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

"আগামী মঙ্গলবার মুসলমানদিগের একটি পর্ব্বদিন এবং উহারা এই দিবস সেই ভাবেই অতিবাহিত করে।

"তুমি কি মনে করিবে, জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, হিন্দু স্ত্রীলোক-গণ ১লা জুনকে † খুব পছন্দ করে। কেন না, গঙ্গাস্নান ব্যতীত উহারা ঐ দিনে তাহাদের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে। অন্য সময়ে তাহারা তাহাদের গৃহের বহির্দ্দেশে বাহির হইতে পারে না।"

(সপ্তম পত্র)

১৯শে জুন।

"বাঙ্গালীরা ভয়ঙ্কর বাচাল; অনবরত বকে। যখন কেহ কাহারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়, তখন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে গালাগালি করে; তৎপরদিন আবার এই কোন্দল আরম্ভ হয়; এমন কি, ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহে।

(এ পত্রেই ২২শে জুন নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি লিখিত)

"আজ আমরা জগন্নাথের সম্মানার্থ রথ দেখিলাম। দলে দলে লোক রথ দেখিতে আসিয়াছিল। একজন বলিতে লাগিল, 'ঐ আমার ঈশ্বর।' মন্দিরের ন্যায় যে জিনিষটি তাহারা টানিয়া লইতেছিল, তাহা কাষ্ঠপুত্তলিকাপূর্ণ;

* শ্রাদ্ধকালে।

† দশহরা?

অনেকগুলি পুত্তলিকা বস্ত্রে সজ্জিত। প্রধান দুইটি পুত্তলিকার সহিত রজ্জু থাকাতে পুরোহিতগণ সেই রর্জ্জু ধরিয়া টানিলে পুত্তলিকা দুইটির হস্ত নড়িতে থাকে। কাষ্ঠনির্ম্মিত হংস অশ্বও আছে। দুষ্ট পুরোহিতগণ পুত্তলিকাগুলির ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য বাতাস করিতেছে!"

সেপ্টেম্বর মাসে ক্রিশ্চিয়ানা প্রিঙ্গল অসুস্থা হইয়া যশোহর পরিত্যাগ করেন। তিনি আর যশোহরে ফিরিয়া আইসেন নাই। পরবর্ত্তী বৎসরের ২৭শে মার্চ্চ ক্রিশ্চিয়ানা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার স্বামী জন প্রিঙ্গল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ক্রিশ্চিয়ানা কলিকাতা পরিত্যাগকালে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "I think all India is like the description Mamma used to give us of the Black Hole in Calcutta!"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

উপহার।

প্রকৃতির সুরম্য উদ্যানে
উঠে নিত্য ফুটি' যেই ফুল,
মনোহর মধুর সৌরভে
সুষমায় অনিন্দ্য অতুল।
সেই পুষ্প করিয়া চয়ন
ভাবসূত্রে কবিতার হার,
গাঁথি কবি আপনার মনে,
দেন নরে প্রীতিউপহার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস।

নবম অধ্যায়।

(রাজপরিবারবর্গের প্যারিস নগর হইতে পলায়ন)

সিদ্ধকাম পুরুষ সংসারের উপাস্য দেবতা। কিন্তু যিনি কার্য্যে ব্রতী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, সমগ্র বিশ্ব-সংসারে কুত্রাপি তাঁহার স্থান হয় না। ডিউক ডি অর্লিয়ন্‌ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাবান্‌ পুরুষ বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তিনি স্বজন-বান্ধবগণেরও ঘৃণাস্পদ হইলেন। রাজা প্রথমাবধি তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত ছিলেন। ল্যাফাইট অকাট্য প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ডিউকই ভার্সেলিস আক্রমণের মূলীভূত কারণ। হতভাগ্য ডিউক সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন। তিনি অচিরে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে অতলস্পর্শ গহ্বরের গভীর-তম প্রদেশে নিপতিত হইলেন। সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ফরাসিরাজ জাতীয় সমিতির সম্মতিক্রমে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ডিউক নির্ব্বাসিত হইলেন। শান্তিপথ কণ্টকবিমুক্ত হইল। শান্তি-অভিলাষী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে অসমর্থ হইয়া জাতীয় সমিতির উদারপ্রকৃতি সভ্যগণ একে একে পদত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, স্বার্থপর, হৃদয়বিহীন, চরিত্রবিহীন ব্যক্তিগণ ফরাসী দেশের অদৃষ্টগগনে তুঙ্গস্থান অধিকার করিল। সুতরাং শোণিতপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শান্তিসংস্থাপন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; যদৃচ্ছাচার স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল।

প্যারিসের ইতর-সাধারণ অতি দুর্দ্দান্ত। তাহারা শার্দ্দূলভল্লুকের ন্যায় রক্তপিপাসু। ভার্সেলিস বিদ্রোহের পর জাতীয় সৈনিকগণের প্রযত্নে তাহারা কিয়ৎকাল যাবৎ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু অল্পকালমধ্যেই পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ভার্সেলিস আক্রমণকালে তাহারা শুনিয়াছিল যে, রাজা প্যারিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেই খাদ্য-সামগ্রী সুলভ হইবে। এইক্ষণে রাজা সপরিবারে প্যারিস নগরে আসিয়াছেন; তথাপি খাদ্য-সামগ্রী মহার্ঘ্যদৃষ্টে

তাহাদের ক্রোধানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতৃগণের প্রতি অশেষবিধ নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ফ্রাঙ্কর নামক রুটি বিক্রেতার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক সেই ছিন্নমুণ্ড প্যারিসের প্রত্যেক রুটী বিক্রেতাকে চুম্বন করিতে বলিল। রুটীবিক্রেতারা দস্যুহস্তে পতিত হইয়া পাপাত্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইল। ফ্রাঙ্করের গর্ভবতী পত্নী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হৃদয়বিহীন পিশাচগণ সেই ছিন্ন মস্তক ফ্রাঙ্কর-পত্নীর বদনমণ্ডলে সংঘর্ষণ করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বে সেনাপতি ল্যাফাইটি জাতীয় সৈনিকগণের সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণকে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের দলপতির প্রাণদণ্ড করিলেন। ল্যাফাইটির শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া ইতর সাধারণ তৎপ্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইল। কয়েক ব্যক্তি সেনাপতিপ্রবরকে বলিল, "যদি আমরা ইচ্ছানুসারে কাহাকেও ফাঁসী দিতে না পারি, তবে কিরূপ স্বাধীনতা লাভ করিলাম?" তাহাদের বিশ্বাস যে, স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ নরহত্যা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তজ্জন্য বিচারালয় বা বিচারপতির প্রয়োজন কি? এ সমস্ত বৃথা আড়ম্বর কেন? এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তিটি যদি তাহারা পরিচালন করিতে না পারিবে, তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহাদের কি লাভ হইয়াছে?

ফ্রাঙ্করের হত্যাকারিদল যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু তথাপি ইতর-সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হইল না। বিচারালয়সমূহের মৃদুমন্দগতি বিচারনিবন্ধন দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে, অতএব অপরাধীদিগের প্রতি সত্বর দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাহারা তিন জন দস্যুকে বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে দুই জনের প্রাণ সংহার করিল। তাহারা তৃতীয় ব্যক্তির ফাঁসী দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইটি জাতীয় সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলেন যে, তাহারা কিয়ৎকাল যাবৎ মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না।

ভার্সেলিস হইতে প্যারিস নগরে আগমন পূর্ব্বক রাজপরিবারবর্গ টুইলারি প্রাসাদে বন্দীদিগের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। বিপ্লব সমুদ্ভূত জাতীয় সৈন্যগণ এবং রাজদ্রোহী গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক প্রাসাদের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

তাহারা রাজপরিবারবর্গকে বন্দিজ্ঞানে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ, করিতেছে। আর সেই বিপ্লবশক্তিসঞ্চারিণী কামিনীগণ লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া অহোনির্শি তৎপ্রতি অশ্রাব্য ভাষাপ্রয়োগে গালি বর্ষণ করিতেছে। রাজ্ঞী অদৃষ্টসন্নিধানে শির নত করিয়া মধুরসম্ভাষণে সেই নারীরূপধারিণী বাঘিনীগণকে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা বা রাজ্ঞীর প্রাসাদের বহির্দ্দেশে আগমন করিবার সাধ্য নাই। তাঁহারা প্রাসাদপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই সংখ্যাতীত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে।

রাজপরিবারবর্গের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে তাঁহাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ রাজ্ঞীকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি রাজার সঙ্গ কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিব না। তাঁহার জন্য-যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তজ্জন্যও প্রস্তুত। রাজ সিংহাসন উৎপাটন করাই বিপ্লবকারিগণের উদ্দেশ্য। আমি স্থানান্তরে গমন করিলে, তদ্দ্বারা রাজা কোন ক্রমে উপকৃত হইবেন না। লাভের মধ্যে ভীরু রমণী বলিয়া জগতে আমার অখ্যাতি প্রচারিত হইবে।" প্রলয়কারিণীগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞী গবাক্ষ-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া পুত্র ও কন্যার শিক্ষায়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র অতি তরুণ-বয়স্ক। তিনি জনক-জননীর অবস্থান্তর দৃষ্টি করিতেছেন; অথচ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। প্রাসাদ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাজপরিবারবর্গের ব্যবহারোপযোগী রত্নরাজি বিমণ্ডিত, সুবর্ণ নির্ম্মিত আসনাদির পরিবর্ত্তে কতকগুলি জরাজীর্ণ ভগ্নপদ কাষ্ঠাসন বিরাজ করিতেছে। রাজভক্ত শরীররক্ষকগণের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক অপরিচিত অস্ত্রধারী রাজ-পরিবার বর্গের প্রতি অহর্নিশি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে। অকস্মাৎ অবস্থান্তর সংঘটিত হইতে দৃষ্টি করিয়া রাজপুত্র জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার শরীর-রক্ষক শান্ত্রিগণ কোথায়?" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "এইক্ষণ ফরাসী জাতির হৃদয় ভিন্ন রাজার অন্য কোন শরীর-রক্ষক নাই।" একদা রাজপুত্র সমক্ষে জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা অপর কোন মহিলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "তিনি রাণীর ন্যায় সুখী।" তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আপনি কি তাঁহাকে আমার জননীর সহিত তুলনা করিতেছেন?" মহিলা

বলিলেন, "কেন, আপনার মাতা কি সুখী নহেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার মাতা সারা রাত্রি ক্রন্দন করেন।"

জাতীয় সমিতি ভার্সেলিস হইতে প্যারিস নগরে স্থানান্তরিত হইয়া অভিনব প্রকারে দেশের শাসন-প্রণালী সংগঠিত করিলেন। সমগ্র দেশ ৮৪ বিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন জিলায় এবং প্রত্যেক জিলা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইল। কয়েকটি "প্যারিস" লইয়া একটি ক্যাণ্টন সংগঠিত হইল। প্রত্যেক বিভাগে একটি শাসন-সমিতি এবং একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংস্থাপিত হইল। শ্রমজীবিগণের তিন দিবসের পারিশ্রমিকপরিমিত করদাতৃগণ ক্যাণ্টনে সমবেত হইয়া প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ক্যাণ্টন-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ জাতীয় সমিতি, শাসন-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণকে এবং বিচারালয়সমূহের বিচারপতিগণকে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। জাতীয় সৈনিকগণের কর্ম্মচারীদিগকে মনোনীত করিবার ভারও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইল। প্রত্যেক প্রধান নগরে একটি মিউনিসিপালিটি ও একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিচার-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বিচারালয়সমূহ অভিনব প্রকারে সংগঠিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পার্লিয়ামেণ্টগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল।

কিয়ৎকাল পরে জাতীয় সমিতি যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধিসংস্থাপনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করায় ফরাসিরাজ সর্ব্বশক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন। রাজসিংহাসন সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম দৃষ্টে মহামতি মিরাবোর চৈতন্য হইল। তিনি রাজ-শক্তিসংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন সুতরাং রাজ-পরিবারবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা ও রাজ্ঞীর বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা মর্য্যাদাভ্রষ্ট ও হৃতশক্তি হইয়া বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। সেই বিশাল রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় কেহই নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মিরাবোর ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। মিরাবোর ন্যায় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি কার্য্যভার গ্রহণ করিলে কার্য্যোদ্ধারবিষয়ে আর সংশয় থাকে না। তিনি ধর্ম্মবিহীন ও চরিত্রবিহীন হইলেও তত্তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এইক্ষণ ফরাসিদেশে নাই। সুতরাং রাজা ও রাজ্ঞী উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজসিংহাসন-সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়া মহামতি মিবারো যদৃচ্ছা শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করেন নাই। তিনি জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক ইংলণ্ডদেশীয় শাসনপ্রণালীর আদর্শে এক শক্তির স্থলে ত্রিশক্তি-প্রবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু বিপ্লব বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে কৌশল ভিন্ন কার্য্যোদ্ধার সম্ভবপর নহে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি রাজাকে সপরিবারে প্যারিস নগর হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তিনিও পলায়নের সাহায্যকল্পে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, রাজা পলায়ন করিলে সেনাপতিপ্রবর বৌলি পাশব শক্তির সাহায্যে বিপ্লব দমন করিবেন। তখন মিবারো রাজা এবং ফরাসী জাতির মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া দিবেন।

কিন্তু বিধাতা বিমুখ হইলে মানবের কোন যুক্তিই ফলপ্রদ হয় না। অকস্মাৎ রাজা ও রাজ্ঞীর আশাদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া ফরাসী শক্তির গৌরব, রাজা ও রাজ্ঞীর একমাত্র ভরসাস্থল সেই মানব কুলতিলক মিরাবো সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে চিরদিনের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মবিহীন মিরাবোর মৃত্যুকালীন অবস্থা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভ্রূকুটি করিতে করিতে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিবে, সেই চিন্তায় তাঁহার বদন প্রফুল্ল। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি তোপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "গ্রীক বীর এচিলিসের মৃত্যুকালীন সম্মানসূচক ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। আমার মৃত্যুর পর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়বর্গ রাজসিংহাসন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। যে বিপদ্ হইতে এ যাবৎ আমি দেশ রক্ষা করিলাম, আমার মৃত্যুর পর সেই বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি হইবে না। আমার মৃত্যুর পর ফরাসী জাতি আমার মূল্য বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া নয়নযুগল মুদিত করিয়া তিনি অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মিরাবোর মৃত্যু হইলে সমগ্র প্যারিস শোকচিহ্ন ধারণ করিল। ধর্ম্মমন্দির-সমূহের শৃঙ্গদেশে কৃষ্ণপতাকা উড্ডায়মান হইল। শবদেহ অতি সমারোহের সহিত সসম্ভ্রমে সমাধিস্থলে আনীত হইল। অতি মহৎ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। বিংশতি সহস্র জাতীয় সৈন্য সমবেত হইয়া শবদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে মৃতদেহ সমাধিগর্ভে নিহিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিংশতি সহস্র বন্দুক গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক সেই লোকান্তরিত মহাপুরুষের পূজা করিল। বিপ্লবসমাগমবিকৃতমনা হইলেও ফরাসী জাতি বীরপূজা বিস্মৃত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নলডাঙ্গার প্রাচীন কীর্ত্তি।

যশোহরের দশ ক্রোশ উত্তরে বেগবতী নদীর তীরে নলডাঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র হউক, প্রাচীনত্বে ও ঐতিহাসিক সম্পদে এই স্থান বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। নলডাঙ্গা যে বহু প্রাচীন স্থান তাহা তত্রত্য ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বহুদিনপূর্ব্বে এই স্থানের দেবরায় বংশীয় রাজগণ সমগ্র বঙ্গদেশে যশঃ-সৌরভ বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহাদের আধিপত্যে নলডাঙ্গা সমৃদ্ধির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। নলডাঙ্গার রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও সমুজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের অশেষ গুণরাশির পরিচয় দিতেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সেই সকল কীর্ত্তিচিহ্নের বিবরণ সাধারণে উপস্থিত করিব। তাহাদের ইতিহাস যে বঙ্গদেশের ইতিহাসকে আংশিকভাবে সমৃদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যশোহর হইতে যে রাজপথ কালীগঞ্জ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে নলডাঙ্গা অবস্থিত। কালীগঞ্জ হইতে এক ক্রোশ দূরে "গুঞ্জনগর" নামক স্থানে নলডাঙ্গা রাজার বর্ত্তমান আবাসবাটী। গুঞ্জনগরের প্রাসাদমূল ধৌত করিয়া ক্ষীণস্রোতা "বেগবতী" নদী প্রবাহিতা। এই গুঞ্জনগরের পরপারে তৈলকূপ গ্রামে বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় আশ্রয়

গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত মন্দির ও গড় সেই সুদূর অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।*

গুপ্ত নগরের রাজবাটী অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর পথ ধরিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি বাঁশের সাঁকো দৃষ্টিগোচর হয়। এই সাঁকোর ঠিক সম্মুখে নলডাঙ্গার রাজগণের পুরাতন প্রাসাদ "রঙ্‌মহাল" দৃষ্ট হয়। রাজবংশের শশিভূষণ দেবরায় এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন একণে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান। রঙ্‌মহালের পার্শ্ব দিয়া একটি পথ বক্রভাবে নলডাঙ্গার "মঠবাড়ী" পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই মঠবাড়ীতে নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি কালের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও বিরাজমান রহিয়াছে—

১। রামেশ্বরী।

২। সিদ্ধেশ্বরী।

৩। রাজরাজেশ্বর।

৪। তারানাথ।

রামেশ্বরী মন্দিরে দশভুজা দুর্গার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির-গাত্রস্থ ইষ্টকের কারুকার্য্য দেখিয়া বঙ্গের তৎকালীন শিল্পীর শিল্পকুশলতার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল মন্দিরের ভাস্কর-কার্য্য দেখিয়া যথার্থই মনে হয়, "In art, as in religion, India once led the whole East and influenced and stimulated the development of architecture and sculpture * * * * in China, Korea and Japan. * * * * *"†

রামেশ্বরী মন্দির নলডাঙ্গার রাজা রামদেব দেবরায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণকাল অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই। রামদেব ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে নলডাঙ্গায় আবির্ভূত হয়েন। তিনি দানশীলতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়েষ্টল্যাণ্ড্ নলডাঙ্গার রাজবংশ বর্ণনাকালে তাঁহার দানশীলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Mindful of their Brahmanical origin, this family has always been distinguished for its liberality in erecting and

* 'প্রতিভায়' মল্লিখিত "রাজা চিত্রসেন রায়" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

† H. P. Ghose's pamphlet on "Archaeologyin India."

endowing idols and in making grants of lands to Brahmans, and even to Mahammadan saints. Ram Deb Ray was * * * especially celebrated for these virtuous acts."* "দেবদ্বিজে" তাঁহার অশেষ ভক্তি ছিল। রামেশ্বরী মন্দির তাঁহার দেবভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রামদেবের সময় নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের 'তখ্‌ততৌসে' উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অধীনে সৈয়দ রেজা খাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। করপ্রদানে বিলম্ব হইলে জমীদারগণের রক্ষা থাকিত না। রাজা রামদেব কয়েক বৎসর কর বাকি রাখিয়াছিলেন, এই অপরাধে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ রামদেবকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ১৭২১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রামদেব নবাব-সৈন্যের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভীতচিত্তে নলডাঙ্গা হইতে পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাবসৈন্য পনর দিবস নলডাঙ্গায় অবস্থান করিয়া হতাশচিত্তে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিল।

নবাবের সৈন্য মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই রামদেব স্বয়ং নবাবসকাশে গমন করিয়া জমীদারীত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব স্বীকৃত হইলে রামদেব তদনুযায়ী দলিল লিখিয়া দিলেন। তাঁহার আমমোক্তার শ্রীকৃষ্ণদাস সে দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া এই দারুণ ঘটনা আমূল শ্রবণ করিলেন; তৎপরে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট গমন করিয়া দলিল দেখিবার প্রার্থনা করিলেন। দলিল হস্তগত করিয়া কৃষ্ণদাস ভাবিলেন, যদি কোনও উপায়ে দলিলখানি নষ্ট করা যায়, তবে প্রভু রামদেবের জমীদারী রক্ষা হইলেও হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া প্রভুভক্ত শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ দলিলখানা গিলিয়া ফেলিলেন। নবাবের লোকরা তাঁহাকে বিষম প্রহার করিল এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভে ভাসাইয়া দিল। রামদেব সে সময় গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাসের মৃতপ্রায় দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া রামদেবের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তীরে আনয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলাভ করিলেন। রাজা রামদেব কৃষ্ণদাসের এই অলৌকিক প্রভুভক্তিদর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেবসেবার নিমিত্ত এক ক্ষুদ্র জমীদারী প্রদান করেন এবং অবাসভূমি

* J. Westland's "Report on the District of Jessove"—PP. 43-44.

নান্দোয়ালীতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ "নান্দোয়ালীর ইস্তফাগেলা দাস" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

রামদেব অশেষ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেও একটি দোষ তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। তিনি যে সময়ে নলডাঙ্গার রাজগদীতে উপবিষ্ট ছিলেন, সে সময় বঙ্গগৌরব বীরাগ্রগণ্য সীতারাম রায় মহম্মদপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় যশোহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বীরত্বের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সকলেই সীতারামের বীরত্ব ও গুণরাশির পক্ষপাতী হইয়াছিল—হন নাই কেবল নলডাঙ্গার রামদেব দেব-রায় ও চাঁচড়ার মনোহর রায়। রামদেব ও মনোহর সীতারামের উন্নতির পথে কণ্টক হইলেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মহামতি সীতারাম কণ্টকসমূহ সমূল উৎপাটন করিয়া আপনার স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

একসময় সীতারাম রামপাল জয় করিতে গিয়াছেন শুনিয়া মনোহর রায় মহম্মদপুর অধিকার করিবার বাসনায় মহম্মদপুরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার তাঁহার কার্য্যে এরূপ বাধা দিলেন যে, মনোহর রায় অচিরে স্বীয় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাঁচড়ায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রামদেব দেবরায় একদিন শুনিলেন যে, নন্দোয়ালীর শচীপতি রায় সীতারামের উৎসাহে বিদ্রোহী হইয়াছেন। অবিলম্বে তিনি সসৈন্যে শচীপতিকে দমন করিতে গমন করিলেন।* যুদ্ধের ফলাফল কি হয়, ইতিহাস তাহা বলে না। শুনা যায়, রামদেব বিবিধ উপায়ে সীতারামের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। রামদেব ও মনোহর মধ্যে মধ্যে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন।

রাজা রামদেব ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহম্মদশাহী পরগণার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া উনত্রিংশবর্ষ জমীদারী ভোগ করিবার পর ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

* শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "রাজা সীতারাম"—৮পৃষ্ঠা।

নিম্নে রামদেব পর্য্যন্ত নলডাঙ্গা রাজবংশের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।*

বিষ্ণুদাস হাজরা (রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—১৫৯০ খৃঃ অঃ)

শ্রীমন্তদেব রায় (রণবীর খাঁ)

গোপী দেবরায় — গন্ধর্ব্ব দেবরায়

রামদেব রায় — রাঘব — রতিনাথ

চণ্ডীচরণ (১৬৪৩ খৃঃ অঃ) — রাধাকান্ত — লক্ষ্মীকান্ত

ইন্দ্রনারায়ণ — জানকীবল্লভ — কালীচরণ — বিশ্বেশ্বর

শূরনারায়ণ — রুদ্রনারায়ণ — রামনারায়ণ — কৃষ্ণরাম

উদয়নারায়ণ — রামদেব (১৬৯৮ খৃঃ অঃ) — ঘনশ্যাম — নরনারায়ণ — রামকৃষ্ণ — রাজারাম

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---

* নলডাঙ্গা রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন দর্শন করিতে আমরা নলডাঙ্গায় গমন করি। নলডাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেবরায়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নলডাঙ্গা রাজবংশের "পারিবারিক ইতিহাসের" একখণ্ড আমাকে অর্পণ করেন। সেই গ্রন্থ অনুসারে রামদেবের বংশাবলী লিখিত হইল—লেখক।

সংগ্রহ।

বিবিধ

—×—

দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি সাহিত্যসম্বন্ধীয়

গল্প।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত গল্প ও কথার মধ্যে যে একটা অভিনব প্রাণের সঞ্চার দৃষ্ট হয়,—এই কথাটি আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র এবার চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

আমাদের বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের প্রচলিত গল্পগুলি স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে "Folk tales of Bengal" নামে বৃহৎ পুস্তিকায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন বলিয়াই আজ সমগ্র ভারতবাসী—শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র জগদ্‌বাসী বঙ্গপল্লীর প্রচলিত গল্পগুলি পাঠ করিয়া হৃদয়ে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ Antiquarian নামক মাসিক পত্রিকায় জনৈক লেখক দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত সাহিত্যসম্বন্ধীয় কয়েকটি গল্প লিখিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটি ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। দক্ষিণ-ভারতবাসীরা যে গল্প বলিয়া বা শুনিয়া হৃদয়ে বিপুল আনন্দ পায়েন, আমরা তাহার অংশ গ্রহণ করিব না কেন?

প্রথম গল্প।

একদা এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভোজরাজের সভায় কিঞ্চিৎ দানপ্রপ্তির আশায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজার কাছে রিক্তহস্তে যাওয়া যুক্তিযুক্ত অবিধেয় বলিয়া তিনি পথিমধ্যস্থ একটি দোকান হইতে কয়েক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড কিনিয়া তাহা আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে করিয়া সন্ধ্যাকালে রাজ-বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-সভা তখন সেদিনের মত বন্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন যে, তিনি সে রাত্রি প্রাসাদের কোন স্থানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে রাজ-সভায় উপস্থিত হইবেন।

তখন ব্রাহ্মণ ইক্ষুদণ্ডপূর্ণ বস্ত্রখণ্ড উপাধানের আকারে মস্তকের নিম্নে রাখিয়া প্রাসাদের সিঁড়ির উপর শয়ন করিল। ব্রাহ্মণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে রাজ-বাটীর জনৈক পরিচারক সেই ইক্ষুদণ্ডগুলি অপহরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কয়েক খণ্ড ভস্মীভূত কাঠ রাখিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ প্রভাতকালে ইক্ষুদণ্ড সম্বন্ধে তিল মাত্র সন্দেহ না করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি বস্ত্র উন্মোচন করিয়াই দেখেন, তন্মধ্যে ইক্ষুদণ্ড নাই—কয়েক খণ্ড পোড়া কাষ্ঠ মাত্র আছে!

রাজার চক্ষু ইহা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল—সভাসদ্ পণ্ডিতরা সকলে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল, তিনি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন,—

দগ্ধং খাণ্ডবমর্জ্জুনেন হি বৃথা দেবদ্রুমৈর্মণ্ডিতং,
দগ্ধা বায়ুসুতেন হেমনগরী লঙ্কাপুরী স্বর্ণভূঃ।
দগ্ধং সর্ব্বমখো হরেণ মদনঃ কিং তৈরযুক্তং কৃতং,
দারিদ্র্যং জনদুঃখকারকমিদং কেনাপি দগ্ধং ন হি॥

অর্থাৎ অর্জ্জুন খাণ্ডব-বন দাহন করিয়াছিলেন, হনুমান্ লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন, হর-কোপানলে মদন ভস্ম হইয়াছিলেন ইহা তাঁহারা ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের একমাত্র নিদান এই দারিদ্র্যকে কেহ ভস্ম করে না কেন?

রাজা ভোজ ব্রাহ্মণের এই শ্লোকাবৃত্তি শ্রবণে এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

দ্বিতীয় গল্প।

একদিন ভোজনদাশরথি নামে একজন ব্রাহ্মণ কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ত রাজার দক্ষিণ হস্ত, আমি নিতান্ত দরিদ্র, রাজার নিকট হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ দান দেওয়াইবার ব্যবস্থা করুন না কেন?"

কালিদাস বলিলেন, "আচ্ছা ভাল, আপনি 'ত্রয়োকারক সুখবাপ্তিরস্তু' বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিবেন ত? এই সামান্য বাক্যটি আপনার কণ্ঠস্থ হইবে ত?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "একমাস চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া কালিদাসকে বলিলেন, "এখন চলুন, রাজ-সভায় যাওয়া যাউক।"

যথাসময়ে উভয়ে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিবার সময় ব্রাহ্মণ "ত্রয়কারকোসুখবাপ্তিরস্তু" স্থানে "ত্রয়োকারকোপীড়াবাপ্তিরস্তু" বলিয়া ফেলিলেন।

রাজা ও রাজপণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের ধারা দেখিয়া আরক্ত-লোচন হইলেন। কালিদাস দেখিলেন, মহা বিপদ্‌; তখন তিনি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ আপনাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে;—

আসনে বিপ্রপীড়া চ সুতপীড়া চ ভোজনে।
শয়নে দারপীড়া চ তিস্রঃ পীড়া দিনে দিনে॥

অর্থাৎ আপনি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন যেন ব্রাহ্মণরা আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করে, আপনি যখন ভোজন করিতে বসেন, তখন পুত্ররা যেন আপনাকে বিরক্ত করে আর শয়ন করিলে আপনার স্ত্রী যেন আপনাকে প্রেমের খাতিরে বিরক্ত করে—এই তিনটি পীড়ায় যেন আপনি দিন দিন পীড়িত হন।

রাজা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন

তৃতীয় গল্প।

একদিন ভুকুন্দ নামে একজন লোককে রাজসমীপে দণ্ড-প্রদানের জন্য নীত হইলে সে বলিল—

"ভট্টির্নষ্টো ভারবিশ্চৈব নষ্টঃ,
ভিক্ষুর্নষ্টো, ভীমসেনশ্চ নষ্টঃ।
ভুকুন্দোঽহং ভূপতিস্ত্বং হি রাজন্‌!
ভবাবল্যামন্তকস্থাং প্রবিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ ভট্টি গিয়াছেন, ভারবিও গিয়াছেন, ভিক্ষু গিয়াছেন, আবার ভীমসেনও গিয়াছেন, এখন ভ্বাদিগনীয়ের মধ্যে আমি ভুকুন্দ ও আপনি ভূপতি মাত্র অবশিষ্ট আছি। আমার বোধ হয়, যমরাজ ভ, ভি, ভা, ভু, ভূ, প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছেন; অতএব আমার মৃত্যুর পরই মহারাজের পালা। এই বুঝিয়া মহারাজ আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হয় দিউন।"

ভুকুন্দের কথা শুনিয়া রাজার মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিলেন।

চতুর্থ গল্প।

একটি বালক একদা মহাকবি কালিদাসের নিকট আসিয়া রাজসন্দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "বল দেখি, তুমি কি বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবে?" বালকটি বলিল যে, তাহার গুরুদেব তাহাকে "কবিঃ কবী কবয়ঃ" এই তিনটি কথা শিখাইয়াছেন।

কালিদাস বলিলেন, "আচ্ছা, কাল তুমি আমার সহিত রাজসভায় গমন করত এই কথা তিনটি আবৃত্তি করিয়া সভাসদ্‌গণকে এই কথা তিনটি অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিতে বলিবে।

পরদিন বালক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই কথা তিনটি করিল এবং সভাসদ্ পণ্ডিতগণকে ইহা অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিতে বলিল। কিন্তু তন্মধ্যে কেহই তাহা করিতে পারিলেন না।

তখন কালিদাস উঠিয়া বলিলেন—

জাতে জগতি বাল্মীকি শব্দঃ কবিরেতি শ্রুতঃ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

অর্থাৎ যখন বাল্মীকি জন্মিলেন, তখন "কবি" এই কথাটী উৎপন্ন হইল; তার পর ব্যাস জন্মিলে "কবী" এই কথাটীর উৎপত্তি হইল; কিন্তু আপনার রাজত্বকালে "কবয়ঃ" এই কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে—আজ সমগ্র জগৎ কবিপূর্ণ।

রাজা বালকের কথা শুনিয়া তাহাকে ধনদানে তৃপ্ত করিলেন।

শ্রীশ্যামালাল গোস্বামী।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ আপনাদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি শুধু জ্ঞানবীর ছিলেন না, তিনি একজন কর্ম্মবীরও ছিলেন। তিনি শুধু সাহিত্য-সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গতানুগতিক সাহিত্য-স্রোতের প্রবাহ-পন্থা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য-সেবায় কর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ স্বর্গগত; কিন্তু তাঁহার শক্তি আজ বঙ্গের সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম্মশীল রহিয়া তাহাদিগকে আজিও সঞ্জীবনী সুধা দান করিতেছে। প্রতি বৎসর স্মৃতিসভায় এই পুরুষ-সিংহের বিষয় আলোচিত হইলেও তাঁহার জীবন-কথা কখনও নবীনতা ও সৌন্দর্য্য হারায় নাই; পরন্তু পাষাণ-ফলকে চন্দন-দারুর ঘর্ষণের ন্যায়, যতই আলোচিত ও বিবৃত্ত হইয়াছে, ততই সরস, মৃদু ও সদ্য মধুর গন্ধে অন্তরাত্মা পুলকিত করিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি চুঁচুড়ায় 'সাধারণী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহকারিরূপে সংবাদপত্র-সম্পাদন শিক্ষা করিতে থাকেন।

'বঙ্গবাসী'ই তাঁহার কীর্ত্তিকেতু। রথী আজ স্বর্গত হইলেও আজিও তাঁহার সাহিত্য-রথের রম্য কেতন তাঁহার জয়-পরিচয় দিতেছে। ১২৮৮ সালের ২৬ শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভক্ষণে 'বঙ্গবাসী'র জন্ম। তাৎকালিক সংবাদপত্রের সর্ব্ববিধ গ্লানি বিদূরিত করিয়া নবীন আদর্শে, বঙ্গের জনসাধারণের প্রতিনিধির কার্য্য ও দায়িত্বভার দিয়া, যোগেন্দ্র বাবু 'বঙ্গবাসীকে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। আজিও সকল সংবাদপত্রই সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যোগেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসীকে' বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বীয় হৃদয়ের রূপসৌন্দর্য্যে আপনার বিশাল তেজস্বী অথচ মধুর ও সুকুমার হৃদয়কে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার 'বঙ্গবাসী' শুধু নির্জীব সংবাদপত্রমাত্র ছিল না—তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সাধারণ সংবাদপত্র অপেক্ষা গুরুতর ছিল। তাঁহার 'বঙ্গবাসী' জীবনময় সংস্কারকের বেশে বাঙ্গালার সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। এই 'বঙ্গবাসী'র অঙ্ক তাঁহার সময়ের দেশের অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সমরক্ষেত্রের কার্য্য করিয়াছিল।

সাহিত্যে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা দূর করিয়া নবীন আদর্শ দিয়াছিল, সমাজে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ নীচতা, সংকীর্ণতা, গ্লানি ও ভণ্ডতার উপর তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কশাঘাত প্রযুক্ত করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডগণকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল, ধর্ম্মজগতে হিন্দুর সদাচার, নিষ্ঠা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, ভারতের অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম-ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে যথায় উচ্চশিক্ষার অভাব, তথায় 'বঙ্গবাসী' শিক্ষক ও গুরুর কার্য্য করিয়াছে। পল্লীবণিকের বিপণি হইতে ভূম্যধিকারীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত কঞ্চুকীর ন্যায় সর্ব্বত্র বঙ্গবাসী'র প্রবেশাধিকার ছিল। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা ও দেশের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার 'বঙ্গবাসী' পল্লীগ্রামে গমন করিত আবার তাহাদের দুঃখ, যাতনা, অভিযোগ ও আবেদন বহন করিয়া রাজদ্বারে উপনীত হইত; অনুনয়, বিনয় প্রয়োজন হইলে বিতর্ক পর্য্যন্ত করিয়া রাজপুরুষের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছে। এক কথায় 'বঙ্গবাসী' তখন দেশের একাধারে সচিব, বন্ধু ও নেতার কায করিয়াছে। দেশের বাসনা ও সাধনা, সমগ্র জাতির অনুভূতি ও বেদনা জ্ঞান, গৌরব সমস্তই গোমুখীর মধ্য দিয়া জাহ্নবীধারার ন্যায় 'বঙ্গবাসী'র মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে। যবনিকার অন্তরালে একা আড়ম্বরশূন্য নিভৃত-কর্ম্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র যন্ত্রচালনায় সমস্ত কার্য্য সাধন করিতেন।

তাঁহার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, সুলভে শাস্ত্রপ্রকাশ। আজ যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে নিত্য ধর্ম্মচর্য্যার সাহায্য করিতেছে, নিঃস্ব চতুষ্পাঠীর শিক্ষাবিস্তারে অনুকূলতা করিতেছে, সে সকল গ্রন্থ যোগেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহেই মুদ্রিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থ, ভিখারী ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব ছাত্রগণ এই সকল গ্রন্থ সুলভে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত কৃতজ্ঞতাশ্রুজলে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির অভিষেক করিতেছে। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নহে, 'বঙ্গবাসী'র উপহারচ্ছলে একরূপ বিনা মূল্যেই তিনি পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের গৃহে গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন—যাহার প্রসাদে দেশে এত সাহিত্যচর্চ্চা, এত সাহিত্যিকের সৃষ্টি;—আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত সম্পদ্ এত ঐশ্বর্য্য! যোগেন্দ্র বাবু নিজ হস্তে ভাণ্ডার-দ্বার না খুলিলে আমাদের সে ঐশ্বর্য্যের উপভোগ ঘটিয়া উঠিত না। এক কথায় তিনি আমাদের ধর্ম্মচর্য্যায় ও বাণী-বন্দনায় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গ-ভাষার অতুল সম্পত্তি—বাণীচরণে অম্লান কুসুমস্তবক। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষাবিন্যাস ও বর্ণনা-চাতুর্য্য, কিসের

কথা বলিব? সবই প্রশংসার অতীত। 'মডেল ভগিনী'তে তিনি পাশাপাশি পুণ্য ও পাপের চিত্র আঁকিয়াছেন। একদিকে বিলাস-গর্ব্বিত বিদেশীয় কুশিক্ষার কুফল, অন্যদিকে অকপট ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুত্বের অম্লান পুণ্য-জ্যোতিঃ। 'মডেল ভগিনী' সমাজের বিকৃতপুরুষ-হৃদয়ে নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে। তাঁহার 'রাজলক্ষ্মী' সর্ব্বরসের সমন্বয়। কাত্যায়নী অন্নপূর্ণায় করুণ-রস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালে বীররস, ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চরিত্রে শান্তরস আর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সতীজন-সুলভ রৌদ্ররস পরিস্ফুট হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ও 'বাঙ্গালী-চরিত্রে' নব্য কুশিক্ষায় বিকৃতরুচি যুবকগণের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যর্থ ও অন্ধ উত্তেজনাকে যাঁহারা দেশহিতৈষিতা ও অসার বাকপটুতাকে যাঁহারা বীরত্ব বলেন, যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রতি কশাঘাত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কিছু মৌখিক, আড়ম্বরময়, বাগ্‌বহুল ও কর্ম্মহীন, তাহাই তাঁহার ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই তিনি নীরবে কর্ম্মের সেবা করিতেন, তিনি সাহিত্য-মন্দিরে ফুল-লতা-পাতা আঁকিতে আইসেন নাই,—তিনি তাহার স্তম্ভ-প্রাচীর তুলিতে আসিয়াছিলেন।

শুধু বিদেশাগত কুশিক্ষায় বিকৃত সমাজের মলিনতা ও গ্লানির প্রতি নহে—স্বদেশজ সামাজিক চরিত্রের অধঃপতিত ও ঘৃণিত পরিণতির প্রতি তাঁহার কঠোরতর শাস্তির বিধান ছিল। ইহা তাঁহার 'বাঙ্গালী চরিত' ও 'নেড়া হরিদাসে' ব্যক্ত হইয়াছে। কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালীর বিবাহ-রহস্যে ও অধঃপতিত বিকৃত বৈষ্ণব-সমাজের উদাহরণে তিনি আমাদের গৃহছিদ্রগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে দিবালোকে প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব, সরলতা, স্বদেশপ্রিয়তা, সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু-উদ্দেশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তাঁহার পরিচালনায় 'জন্মভূমি' পত্রিকা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রগণের অন্যতম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত 'হিন্দী বঙ্গবাসী' হিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা, সাহিত্য-সেবা ও শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিল—অপর জাতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া দিবার জন্য একটা বন্ধন-শৃঙ্খলের কাজ করিয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি সুলভে তিনি এই পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইহাতে লিখিতেন না, পরে তিনি ইহার জন্য অবিরত শ্রম করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হন। রুষ ও জাপানীজ যুদ্ধের সময় এই পত্রিকায়

অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পত্রিকা সাপ্তাহিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যোগেন্দ্রবাবুর পুরুষকার, অনন্যনির্ভরতা, ব্যবসায়-বুদ্ধি, সকল কার্য্যে আন্তরিকতা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়, স্বজন ও সাহিত্যিকগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, ত্যাগশীলতা, একাগ্রতা, অকপটতা ও নির্ভীকতা তাঁহাকে মহীয়ান্ করিয়াছিল—আজও উহা তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অশেষ গুণের আধার তিনি, তাঁহার কোন্ গুণের কথা বলিব? চারিদিকেই তাঁহার অশ্রান্ত সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য করিতেন, অনেককে 'বঙ্গবাসী' আফিসে ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারে কর্ম্ম দিয়া প্রাতপালন করিতেন। বহু বিহঙ্গকে নিরাশ্রয় করিয়া আজি আশ্রয়-তরু অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান বেড়ুগ্রামে তাঁহার পল্লী-নিবাস। তথায় তাঁহার খাত পুষ্করিণী, স্থাপিত বিদ্যালয় ও ডাকঘর, প্রতিষ্ঠিত হাট, বাঁধান ঘাট ইত্যাদি বহু জন-হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে।

এই সকল মহাত্মগণের স্মৃতি-পূজার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু তাঁহাকে শ্রদ্ধা বলিয়া নহে, তদ্দ্বারা আমরা আমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করি, আদর্শ আলোকে তমোময় হৃদয়-গুহা আলোকিত করি, সাহস, ভরসা উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায় আমাদেরই হৃদয় ভরিয়া যায়। যে আলোক-পথ বাহিয়া এই সকল জ্যোতিষ্কগণ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা আমাদের কর্ম্মবর্ত্ম দেখিয়া লইতে পারি। তাঁহাদের স্মৃতি তাঁহারা নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের মনোময় অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভে তাঁহাদের জয়-গাথা উৎকীর্ণ। বাহিরের ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি তাহার কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীকালিদাস রায়।

বৈদিক সমাজ।

অতি প্রাচীন কালে—কত প্রাচীন, ইতিহাস তাহা বলিতে পারে না; কল্পনাও তাহার ধারণা করিতে পারে না—ভারতের আর্য্যগণ সিন্ধুর উপকূলে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের তৎকালীন চিন্তা, ধারণা ও জ্ঞানের একমাত্র ইতিহাস বেদ। চারিখানি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সমধিক প্রাচীন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাৎকালীন আর্য্য-সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কৃষিকার্য্য।

আর্য্যগণ কৃষিজীবী ছিলেন। ঋগ্বেদ হইতে এ বিষয়ের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মোক্ষমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আর্য্য অর্থে "কৃষিব্যবসায়ী", ঋ ধাতুর অর্থ "চাষ করা"। অতএব আর্য্যশব্দের প্রকৃত অর্থ "কৃষক"। কৃষিরত প্রাচীন হিন্দুগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ একত্র বাস করিতেন। ইহা হইতেই সমাজের উৎপত্তি। সভ্যতা-বজ্জিত অনার্য্যগণ সমাজ মানিত না, পরন্তু সমাজ-ধ্বংসেরই চেষ্টা করিত বলিয়া, তাহারা "অনার্য্য" বা "দস্যু" নামে অভিহিত হইত। ১ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে ৭ম ঋকে "কৃষ্টয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"মনষ্যা অগ্নিন্মিত্রভূতাঃ"। প্রকৃত পক্ষে কৃষিকার্য্যের উপর আদিম মনুষ্য-সমাজ কেন, সর্ব্বকালীন সামাজিক সভ্যতা নির্ভর করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায়ও "Ruralize" করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। আর্য্যগণ কৃষি-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাদিগকে "কর্ষণশীল" (মনুষ্য) "কৃষক" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ না করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন।

অনার্য্য-সংঘর্ষ।

আর্য্যগণ কৃষি-কার্য্য করিয়া ও প্রাকৃতিক দেবতাগণের তুষ্টিসম্পাদনের জন্য যজ্ঞাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। যজ্ঞবিদ্বেষী আদিম অধিবাসিগণ সর্ব্বদা তাঁহাদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত। তাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার চিহ্নমাত্র ছিল না। এই জন্য (১০।২২।৮) তাহাদিগকে "অকর্ম্মা অমণ্ডঃ অন্যব্রতঃ অমানুষঃ" বলা হইয়াছে। তাহারা আর্য্যদিগের হিংসা করিত। কৃষ্ণনামক

এক অনার্য্যপতির দশ সহস্র অনুচর ছিল। তাহারা এক সময়ে এক ঋষিকে কূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে বধ করিয়া, যাহাতে তাহার পুত্র না হয়, এজন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছিলেন। এই অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যগণের বহুকাল ধরিয়া সংগ্রাম হইয়াছিল। ১।১২১।১৩ ঋকে দেখিতে পাই, অবশেষে আর্য্যগণই জয়ী হয়েন।

বিবাহ।

সমাজরক্ষার পক্ষে বিবাহ অতীব প্রয়োজনীয়। এই জন্য আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীন কালে বিবাহ-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বিবাহের সময় বর চন্দনাদিতে ও সুবর্ণ-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইতেন (৫।৬০।৪)। তৎকালে ব্যাভিচারিণীর অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহারা যে সমাজের মধ্যে ঘৃণ্য ও নিন্দিত ছিল, এ কথা ২।২৯।১ ঋকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তথায় আমরা দেখিতে পাই, গৎসমদ ঋষি আদিত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

"ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরেমৎকর্ত্ত রহসূরিবাগঃ।
শৃণ্বতো বো বরুণ মিত্রদেবা ভদ্রস্য বিদ্বান্ অবসে হুবে বঃ॥"

"হে ব্রতকারী শীঘ্রগমনশীল সকলের প্রার্থনায় আদিত্যগণ! গুপ্ত-প্রসবিণীর (গর্ভের ন্যায়) আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর। মূলে "রহসূঃ ইব" আছে। সায়ন ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—"রহসি অন্যৈরজ্ঞাতে প্রদেশে সূয়তে ইতি রহসূঃ, সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" লোক-নিন্দা ব্যতীত গোপনে গর্ভপাতের আর কি হেতু থাকিতে পারে ?

পূর্ব্বকালে পিতা কন্যাকে সুসজ্জিতা করিয়া বিবাহস্থলে আনয়ন করিতেন। সেই প্রাচীন কালেও "সালঙ্কৃতা" কন্যা দান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কারণ, ১০।৪৯।১৪ ঋকে জামাতার হস্তে সালঙ্কৃতা কন্যা অর্পণের কথা দেখা যায়।

বৈদিক যুগে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। সে সময়ে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। স্ত্রীলোকগণ অবাধে সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেন। ভদ্রা ও সুগঠনা কন্যা অনায়াসে স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। (১০।২৭।১২) তৎকালে দম্পতিগণ যজ্ঞভূমিতে একত্র যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমান আছে। "সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করিবে," সে যুগে যথার্থই পালিত হইত বলিয়া মনে হয়।

আর্য্যগণ সোমরস পান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কেবল ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে নহে, পরন্তু সমস্ত প্রাচীন আর্য্য-সমাজেই সোমরসের সমধিক ব্যবহার ছিল। এই আর্য্যজাতির এক শাখা; ইরাণীয়দিগের মধ্যে সোমরসের ব্যবহার ও উপাসনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সোমকে "হাওমা" কহিতেন। ঋগ্বেদের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র "আবেস্তার" অনেক স্থলে "হাওমার" প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণের জন্য একটি অংশের অনুবাদ দিতেছি:—"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্ঞদান করি। তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন।" ৯।৬৩ সূক্তে সোমরস-প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত আছে। আর্য্য-রমণীগণ প্রস্তর দ্বারা সোমলতা নিষ্পীড়িত করিয়া ও তৎপরে অঙ্গুলিদ্বারা পেষণ করিয়া রস বাহির করিতেন। পরে সেই রসকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মেষ-লোমনির্ম্মিত ছাঁকনির দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হইত। আর্য্যগণ সেই শোধিত রসের সহিত ক্ষীর অথবা দধি মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। ক্ষরণশীল সোমের বর্ণ শুভ্র। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইবিড়বর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান।

সভ্যতার উন্নতির সহিত জাতীয় সম্পদ্ও বর্দ্ধিত হয়। ভূমি ও পশুই প্রাচীন ভারতের প্রধান সম্পত্তি ছিল। ঋগ্বেদে পালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুর উল্লেখও স্থানে স্থানে আছে। ৮।৫৬।৩ ঋকে অগ্নিদেবের নিকট একশত দাসের প্রার্থনা দেখা যায়। ৮।৪২।৩২ সূক্তে পুনঃ "শতং দাসম্" শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অধ্যাপক রথ (Roth) অনুমান করেন যে, উন্নতির সহিত মেষের ন্যায় প্রাচীন ভারতে দাসও বিনিময়ার্থ ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের সম্পদ্।

প্রাচীন ভারতে নিষ্ক নামক এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। বেদে বহুবার এই নিষ্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রার প্রচলন ব্যতীত সামাজিক উন্নতি সমধিক সাধিত হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতে নিষ্কের প্রচলন আরব্ধ হইলে, সম্পদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ঋক্ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।—৮।৪৭ সূক্তে জানিতে পারা যায় যে, সমাজে ধনবানের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ততই যজ্ঞের আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্রমে

ধনবান্‌গণ ঋত্বিক্ ডাকাইয়া বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। ইহা সমাজের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক।

বর্ত্তমান ইংরাজি অর্থশাস্ত্রের মত মুদ্রার দ্বারাই Territorial distribution of wealth সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে যেমন এক দেশের পণ্যদ্রব্য অপর দেশে নীত হইতেছে, বৈদিকযুগেও তেমনই ভারতীয় বণিক্‌দল ব্যবসায় ব্যপদেশে এক দেশের পণ্য অপর দেশে বহন করিয়া বেড়াইত। এ কার্য্যের জন্য যে মুদ্রার একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাণিজ্য।

৭।৮৮।৩ ঋকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন, "যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।" ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বশিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্র গমনের কারণ কি? এক দেশের সহিত অন্য দেশের নৈকট্যসাধনের জন্যই যে এই ঋকে উল্লিখিত জল-যানের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জলযান আবিষ্কৃত হইবার পর ভারতীয় আর্য্যগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন, ঋগ্বেদ হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। (৪।৫৫।৬) অধিকন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে ঐতিহাসিকগণ এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। জর্জ্জ রলিন্‌সন প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে ভারতের স্বর্ণ ভারতীয় যানে কালডিয়া প্রভৃতি সুপ্রাচীন জনপদে প্রেরিত হইত।

শ্রেণী-বিভাগ।

প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ ছিল না। তখন কেবল মাত্র আর্য্য ও অনার্য্য বা দস্যু, এই দুইটি জাতি ছিল। ১।৭।৯ ঋকে লিখিত আছে যে, "ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের ধনসমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির উপর শাসন করেন।" এই "পঞ্চক্ষিতি" শব্দ লইয়া কিছু গোল হইয়াছে। সায়ন বলেন, পঞ্চক্ষিতি অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ ও নিষাদ। কিন্তু সায়নের এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রাহ্য করেন না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ের বাদানুবাদ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে মুয়র-কৃত Sanskrit Texts দেখিতে অনুরোধ করি। মোক্ষমূলরও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন বৈদিকযুগে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারিত, তখন বেদে যে জাতি-বিচারের কথা আছে, ইহা স্বীকার করিব কেন? পণ্ডিত

রমানাথ সরস্বতীরও এই মত। তিনি বলেন, "প্রাচীনকালে ইদানীন্তন জাতি-বিভাগের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষিতি অর্থে কি প্রকারে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে ?" বোধ হয়, পঞ্চক্ষিতি অর্থে পঞ্চনদ অন্তর্গত পঞ্চভূভাগ হইবে। এইরূপে ১।১০।১ ঋকে "ব্রাহ্মণঃ" শব্দ থাকাতেও গোল হইয়াছে। সায়ন "ব্রাহ্মণঃ" অর্থে ব্রাহ্মণ জাতি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি। ব্রহ্মা একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত। "ব্রাহ্মণঃ" অর্থে স্তুতিবাদকগণ। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় বলেন, "ব্রাহ্মণঃ অর্থে ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকরা।"

সায়নাচার্য্য বলেন, একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া ৫ম মণ্ডলের ৩১ সূক্ত রচিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আগম-পরিদর্শকরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অবর্ণনাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র শ্যাবশ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। রাজা ইহাতে সম্মত হয়েন। কিন্তু মহিষী, শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, এই আপত্তি করায় তিনি তপস্যা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মরুতের সাক্ষাৎ পায়েন। মরুৎ তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করায়, তাঁহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হয়।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকাল ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণকে লইয়া একটি জাতি গঠিত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগ না থাকিলেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। এক ব্যক্তির দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন। শ্রেণী-বিভাগ উন্নত সমাজের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতে ক্ষৌরকার কর্ম্মকার বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীব সৃষ্টি হইয়াছিল। সূত্রধর, বৈদ্য, শিল্পী প্রভৃতির উল্লেখও দেখা যায়। ইহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে এক পরিবারস্থ ভিন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধি ও কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। ১০।৯০।১২ ঋকে ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে রচিত হইয়া ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। ব্যাকরণবিৎগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে এই ঋক্কের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে, ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

রাজাই সমাজের মেরুদণ্ড। রাজাকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন ভারতে রাজা।

যে দেশে রাজা নাই, সে দেশে রাজশক্তির ন্যায় অন্যশক্তি বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল কি না, ইহা যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ঋগ্বেদের সময় হইতেই ভারতে রাজন্যবর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় বলিতে "বলবান" ব্যক্তিকে বুঝায়। অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষা করিবার জন্য সুরক্ষিত নগরের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদের নানা স্থানে (৭।৩।৭, ৭।১৫।১০, ৭।৯৫।১) "আয়ো" নির্ম্মিত পুরীর উল্লেখ দেখ যায়। সায়ণ আয়সাভি অর্থে হিরণ্ময়ীভিঃ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে নিরাপদ স্থান বুঝাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪।৩০।২০ঋকে "অশ্মন্ময়ীনাম্ পুরাম্"—প্রস্তর নির্ম্মিত নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। ফল কথা এই ঋগ্বেদের সময়েই আর্য্যগণ ক্রমে সরস্বতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ ব্যতীত আপনাদিগের মধ্যেও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিবাদ হইত। ঋগ্বেদ (৪।৩০।১৮) হইতে জানিতে পারা যায় যে, সরস্বর পূর্ব্বপারস্থ দুইজন আর্য্যরাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হয়েন।

১০।১৭৩ সূক্তে রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইংলণ্ডেশ্বরের মস্তকে আর্ক বিসপ মুকুট অর্পণ করিয়া অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতে ঋষিগণ উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাজার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

পূর্ব্বে রাজা অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গজস্কন্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪।৪।১) তাঁহাকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিবার কালে, বর্ম্ম দেবতা ধনুঃ ও জ্যার, সারথী ও অশ্বের স্তুতিসূচক মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাহার অঙ্গে বর্ম্ম; হস্তে ধনুঃ ও জ্যা প্রদান করা হইত। (৬।৭৫) সুতরাং যাঁহারা বলেন প্রাচীন ভারতে রাজার অস্তিত্ব ছিলনা, তাঁহাদের কথা কত দূর গ্রহণীয়, তাহা বিবেচ্য।

এইবার আমরা দুই একটি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।—

প্রাচীন কালে অনেক কন্যা এদেশে চির কুমারী থাকিতেন। তাঁহারা

চির কুমারী।

পিতৃধনের অধিকারিণী হইতেন। ঋগ্বেদে এরূপ প্রমান পাওয়া যায়; যথা;—

অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদাসদসস্তামিয়েভ্যাং।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভরদদ্ধি ভাগং তন্বোঽ যেন মামহং ॥

সায়ণভাষ্যের অনুযায়ী ইহার অনুবাদ এইরূপ।—

"হে ইন্দ্র পতি-অভিমানী হইয়া যাবজ্জীবন পিতা-মাতার সহিত অবহিতা, পিতামাতার শুশ্রূষাপরায়ণা দুহিতা যেমন পিতৃগৃহের ধনভাগ প্রার্থনা করে ইত্যাদি।—

স্বামীরমৃত্যুর পর, বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া অবস্থান করিতেন, মনুর এই নীতি প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়না। ১০।১৮।৮ শ্মশানগামিনী বিধবার প্রতি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রথ (Roth) বলেন ঋগ্বেদের সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিতেন। রামায়ণ যুগেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তখন ইহা অনার্য্যদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

বিধবা বিবাহ।

ভারতবর্ষে চিরদিনই বহুপত্নীকতা প্রচলিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদেও বহুপত্নীকতায় যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূত্রকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে গমন কালে পথিপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন এবং তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া যাইয়া, দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। আবার এই কক্ষীবান্ যখন বৃদ্ধ হয়েন, তখন ইন্দ্র বৃচা নামে এক যুবতীকে ইঁহার হস্তে দান করেন। বেদে লিখিত আছে।—

বহুপত্নীকতা।

"যদেকস্মিন যুপে দ্বে রশনে পরিব্যচতি তস্মদেকো জায়ে বিন্দেত"—অর্থাৎ যেমন যজ্ঞ কালে এক যুগে দুই রজ্জু বেষ্টন করা হয়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।



বিজ্ঞান ও হিন্দুব্যবস্থা।

কোনও কার্য্য করা অন্যায় বিবেচিত হইলে, তৎসম্বন্ধে শিশুদিগের ভীতি উৎপাদন করাই অধিকাংশ স্থলে ন্যায্য হয়। কিন্তু সেই শিশু যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাহাকে সামান্য ভাবে নিষেধ করিলেই সম্যক ফল পাওয়া যায়। আবার, সেই যুবক প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তখন তাহাকে তৎকর্ম্মের দোষ দর্শাইলেই যথেষ্ট হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তিসম্বন্ধে শিশুকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তবে শিশুকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা সম্ভবপর হয়; যৌবনের উন্মেষকালে, অসাবধানতার সহিত সংযোগ সম্বন্ধে নিষেধই যথেষ্ট, এবং প্রাপ্তযৌবন লোককে অগ্নিদাহের বিষমফল হৃদয়ঙ্গম করানই যৌক্তিক।

শিশুর পক্ষে যে নিয়ম খাটে, সমাজের শৈববাবস্থায়ও তাহাই খাটে। কোনও অতীতযুগে, হিন্দুসমাজ সমুন্নত হইয়া থাকিলেও, বৌদ্ধ ও মুসলমান-প্রভাব-কালে, হিন্দুসমাজের অবস্থা ক্ষুদ্র শিশুর মনোবৃত্তির সহিত তুলনীয়। শিশুর জন্মকালীন মনোবৃত্তি একেবারেই থাকে না। ক্রমশঃই পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। সমাজের এইরূপ মানসিক-শৈশবাস্থায় যে সকল অনুশাসন প্রবর্ত্তিত থাকে, তাহা বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সমাজের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়।

হিন্দুর মরণ-অশৌচ গ্রহণের সময়ে, ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। অশুচি ব্যক্তি রজককে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দিতে পারেন না। অশৌচকালে, আসনে ব্যতীত বসিতে নাই, ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ, মৃন্ময় পাত্র ব্যতীত অপর পাত্র অব্যবহার্য্য, নারিকেল পত্রের উত্তাপে সিদ্ধ হবিষ্যান্ন মাত্র ভক্ষ্য। যাঁহারা এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আজ আমরা ভুলিয়া গিয়া, সুধু কর্ম্মের বোঝা এবং তৎসঙ্গে বোঝার "খুঁটি-নাটি" লইয়াই মহা ব্যস্ত। এমন কি, সেই সকল সঙ্কীর্ণ খুটি-নাটির উপরেই আমরা-উদার হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বসাইতে চাহি।

যাঁহারা ইংরাজী জানেন, বা যে সকল বাঙ্গালা ভাষাবিৎ মহাশয়রা রীতিমত মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা "অ্যাণ্টি-সেপ্টিক" কথাটি শুনিয়াছেন। ঐ কথাটির অর্থ, "পচন-নিবারক।" এই কথাটি লইয়াই, আমাদের এক্ষণে কার্য্য, অতএব অতি সংক্ষেপে, এইটি সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিয়া লই।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই নানা প্রকারের জীবাণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহারা, জমী হইতে ঊর্দ্ধে আধক্রোশ, এবং জমির তলে ছয় সাত ফিট পর্য্যন্ত বিরাজ করে। তবে, জমী হইতে যত ঊর্দ্ধে বা নিম্নে যাওয়া যায়, ততই ইহারা সংখ্যায় ও ক্ষমতায় হীন হইয়া পড়ে। জীবাণুগণ সাধারণ চক্ষুর অগোচর; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহারা অলক্ষ্য। এই সকল জীবাণু, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—একশ্রেণীর জীবাণু রোগোৎপাদক। অপরগুলি রোগের কারণ নহে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কতকগুলি জীবাণু পচন উৎপাদক। যদি কোথাও একটি পাত্রে অন্নে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই অন্ন আর সুস্বাদু থাকে না, অম্লরসাত্মক হইয়া পড়ে; ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে তণ্ডুলের প্রত্যেক দানাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইয়াছে; তাহার আরও কিছুকাল পরে দেখা যায় যে তণ্ডুলের কণাগুলি ক্রমশঃই ক্ষুদ্রতর আকার ও ভিন্নবর্ণাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে; কিছু দিন পরে আর তণ্ডুলের চিহ্নও বর্ত্তমান থাকে না—সকলই জলের মত তরল হইয়া গিয়াছে; আরও কিছু কাল পরে, সেই তরল পদার্থটির উৎসেচনা (fermentation) হইয়া বুদ্বুদ নির্গত হয়। ইহাই পচন ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত এবং ইহা পচনকারক জীবাণুদ্বারা সংঘটিত হয়। এই পচন-কারক জীবাণু না থাকিলে আজ আবর্জ্জনায় পৃথিবী পরিপূরিত হইত, আজ জমীর সার হইত না। কিন্তু অপর যে কোনও বিধায়ে পচনকারক জীবাণুগুলি মানব জাতির পক্ষে হিতকর হইলেও, পচনকারক জীবাণুগুলি, পরোক্ষে মানবজাতির বিষম শত্রু। যেখানেই পচনক্রিয়া সংসাধিত হয়, সেই খানেই জলের ও উত্তাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে গলিত পদার্থ হইতে সার-নামক জীবাণুগণের ভোজ্যেরও সৃষ্টি হইতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, যে, যে স্থানে পচনক্রিয়া হয়, সেই স্থানেই রোগজীবাণুগণের নিমন্ত্রণ হয়। আবার যে স্থানে রোগজীবাণুগণের কার্য্য চলিতে থাকে, সেই স্থানেই পচনকারক জীবাণুগণের সমাদর। পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জীবাণু সম্বন্ধে কতক আভাস লাভ করা গেল। অধুনাতন চিকিৎসকমণ্ডলী জীবাণুগণকে অনেক রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই জীবাণুগণ বড়ই সংক্রামক। এই জীবাণুগণের রোগোৎপাদিকা শক্তির বাহ্য বিকাশ হইতে, সাধারণতঃ, দশ দিবস কাল লাগে। এই কথাগুলি যদি মনোযোগ সহকারে প্রণিধান করিয়া থাকেন, তবে পাঠক মহাশয় হিন্দুর অশৌচ-ব্যবস্থার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ, অশৌচের কাল অন্যূন দশ দিবস হইতে এক মাস কালাবধি। ব্রাহ্মণরা কি স্বার্থান্ধ হইয়া, নিজেদের পক্ষে, অশৌচের কাল দশ দিবসমাত্র নির্দ্দেশ করিলেন, এবং শূদ্রাদির জন্য এক মাস কাল স্থির করিলেন? আমার ধারণা যে, এই কালনির্দ্দেশ স্বার্থপরতাসম্ভূত নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যথার্থই অতি শুচি ভাবে থাকিতেন; সেরূপ পরিষ্কার ("Surgicallyclean" কতকটা) বর্ণের পক্ষে দশ দিনের quarantineই যথেষ্ট। কিন্তু যাবতীয় অপরিচ্ছন্ন জাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। তাহাদের পক্ষে এক মাসের quarantine বা Segregation এর ব্যবস্থা করা কিছুই স্বাস্থ্যনিয়মবিগর্হিত কার্য্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, Rigid quarantine বা অতি সন্তর্পণের সহিত রোগ সংক্রামিত ব্যক্তিগণের স্বতন্ত্রীকরণই যদি মরণাশৌচের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়, তবে ক্ষৌরকর্ম্মের নিষেধ, বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া বা ভিক্ষাদেওয়ার নিষেধের কারণ অতি সহজেই বোধগম্য হয়। মৃণ্ময় পাত্রের মূল্য অতি সামান্য বিধায়, উচ্ছিষ্ট পাত্র অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য পাত্র ব্যবহার করিলে বা অপরের বিছানায় বসিলে, সংক্রামক রোগের বীজ অনায়াসে চতুর্দ্দিকে ছড়ান যাইতে পারে—বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই, মৃন্ময় পাত্রের ও স্বতন্ত্র আসন ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই পরিধেয় ও অতি যৎসামান্য বস্ত্র ও উত্তরীয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং শয়নের জন্য কম্বল প্রভৃতি স্বতন্ত্র শয্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহার্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, হবিষ্যান্ন বিজ্ঞানসম্মত Complete food. মটর ডালে ও দুগ্ধে অপর্য্যাপ্ত প্রোটীড্ বা অণ্ডলাল জাতীয় পদার্থ আছে; আতপতণ্ডুলে ফলমূলে ও কদলীতে যথেষ্ট শ্বেতসার আছে; এবং আতপ চাউলের সহিত অনেক পরিমাণে ঘৃত বেশ সহ্য হয়। অন্যান্য সময়ে কয়লা বা কাষ্ঠের জ্বালে অন্ন সিদ্ধ করিবার কোনও অন্তরায় নাই, কিন্তু হবিষ্যান্ন পাককালে নারিকেল বা তাল পত্রের অগ্নির প্রয়োজন। এত প্রকারের ইন্ধন থাকিতে তাল পত্রের অগ্নির ব্যবস্থা করা হইল, বলা বড় শক্ত। বোধ হয়, তাল পত্রের অগ্নির উত্তাপ তাদৃশ প্রখর নহে অর্থাৎ, হয় ত তাল পত্রে রাঁধিলে, অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে অন্ন সিদ্ধ হইতে থাকে। আজকাল থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক চুল্লির উত্তাপ বুঝিতে পারা যায়; তখনকার কালে, ঘুঁটার অগ্নি, তাল পত্রের অগ্নি প্রভৃতি নানারূপে ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ সৃষ্টিকারী ইন্ধনের ব্যবস্থা ছিল।

হবিষ্যান্ন যে শুধু চিকিৎসা-সম্মত সম্পূর্ণ খাদ্য, তাহা নহে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ-প্রপীড়িত বঙ্গদেশের পক্ষে হবিষ্যান্ন একটি পরম উপাদেয় খাদ্য। আমি অনেক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগীর রোগ মাত্র ঐ হবিষ্যান্নের সাহায্যে আরোগ্য করিয়াছি। সাত্ত্বিক আহার, ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষে উৎকৃষ্ট আহার, এবং পরিপাক করার পক্ষে সুপাচ্য আহার—অতএব হবিষ্যান্ন যে ব্যবস্থিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি ?

অশৌচান্ত করিবার কালে ক্ষৌরি করিয়া, বস্ত্রত্যাগ করিয়া, স্নান করিয়া, হোম (শ্রাদ্ধ) করিয়া, তবে হিন্দু শুচি হয়েন। এই সকল গুলিরই উদ্দেশ্য quarantine এর উদ্দেশ্যের সমান।

কিন্তু কতক বিষয়ে, হিন্দুদের ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। শোক বা দীনতা জ্ঞাপন করিবার জন্য নগ্ন পদ হওয়া যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, যে শাস্ত্রের মূল মন্ত্র "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" সেই শাস্ত্রকারয়া নগ্ন পদে ভ্রমণের বিপদ কি জানিতে পারেন নাই ? যদি জানিয়া থাকেন, তবে কেন তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন ? বোধ হয় যাঁহারা আজন্মকাল নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের পদতলের চর্ম্ম এরূপ স্থূল ও কঠিন হয় যে তাঁহাদের পক্ষে নগ্নপদে বিচরণ করায় দোষ হয় না।

তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধও বিজ্ঞান অনুমোদিত। তৈলাক্তগাত্রে জীবাণু সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যদি ঘৃত ভোজনে বাধা না থাকে, তবে তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধের কোনও যৌক্তিক হেতু থাকিতে পারে না।

হিন্দুরা যে অতীব সুসভ্য জাতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ আমরা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে শিশু আছি বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসন ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলি ; কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা বেশ বুঝিবেন যে কি দূরদর্শিতা, কি স্বাস্থ্যশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা, কি অমূল্য ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক কথায়, বিজ্ঞানের দোহাই দিই—কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রে, বর্ণে বর্ণে বিজ্ঞানের আভাস আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়.





[illegible]

Block by

S. C. MITRA & CO. CALCUTTA.

অলবেরুণীর ভারত-বিবরণ।

অলবেরুণী তাঁহার ভারত-বিবরণ-বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচারব্যবহারসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সকল আচার-ব্যবহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। আমরা নিম্নে তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিলাম।

যদি কোন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে (সম্পন্ন হয়) এবং তাহা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ অতি বিরল হয়, তাহা হইলে আমরা সেই ঘটনাকে আশ্চর্য্যজনক বলিতে পারি। যদি এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় তবে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক এমন কি অলৌকিক বলিয়া গণ্য হয়; কারণ, তাহা আর প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা পরিচালিত হয় না এবং যতক্ষণ অপ্রত্যক্ষীভূত থাকে ততক্ষণ কল্পনাসৃষ্টরূপে গৃহীত হয়। অলবেরুণী বলিয়াছেন যে, অনেক হিন্দু আচার তাঁহাদের দেশের আচার হইতে এত বিভিন্ন যে, সেগুলি তাঁহাদের নিকট ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদিগের আচার দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বকই তাঁহাদের (মুসলমানদিগের) নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া বিপরীত নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ তাঁহাদের আচারব্যবহারের সহিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের কোন সৌসাদৃশ্য নাই এবং একের আচারব্যবহার অপরের আচারব্যবহারের বিপরীত। যদি কখনও তাঁহাদের রীতিনীতির সহিত হিন্দুদিগের রীতিনীতির কোন সাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার ঠিক বিপরীত অর্থ আছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অলবেরুণী হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের নিম্নলিখিত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

হিন্দুগণ তাহাদের শরীরের কেশ কর্ত্তন করে না। পুরাকালে উত্তাপহেতু তাহারা নগ্নাবস্থায় থাকিত এবং সর্দ্দিগর্ম্মি নিবারণ করিবার জন্য মস্তকের কেশ অকর্ত্তিত রাখিত।

আলস্যপরায়ণ হইয়া তাহারা দীর্ঘ নখ রাখিত; কারণ, তাহারা সেগুলিকে কোন কার্য্যে ব্যবহার করিত না, কেবল তাহাদের সুখপ্রদ কর্ম্মহীন জীবনে সেগুলির দ্বারা মস্তক চুলকাইত এবং উকুন অন্বেষণজন্য চুল পরীক্ষা করিত।

হিন্দুগণ নিঃসঙ্গে একে একে গোময়লিপ্ত আস্তরণের (গোময়লিপ্ত ভূমির)

উপর আহার করে। তাহারা ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য ব্যবহার করে না এবং যে পাত্রে ভক্ষণ করে তাহা মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলে ফেলিয়া দেয়।

তাহাদের দন্তগুলি পান শুপারি খড়ি (চূণ) ও খদির চর্ব্বণহেতু রক্তবর্ণ থাকে।

আহার করিবার পূর্ব্বে তাহারা মদ্যপান করিয়া তৎপরে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। * * * তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না।

তাহারা পাগড়ী ব্যবহার করে। তাহারা সামান্য পোষাকে সন্তুষ্ট, তাহারা দুই আঙ্গুল চওড়া ন্যাকড়া পরিধান করে এবং দুইটি সূত্রদ্বারা উহা কোমরের পশ্চাদ্ভাগে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু যাঁহারা বহু পরিচ্ছদ পছন্দ করেন তাঁহারা পাজামা ব্যবহার করেন। যে দড়ির দ্বারা ইহা বাঁধা হয় তাহা পশ্চাতে থাকে। তাহাদের 'সিদার' (মস্তক, বক্ষের উপরিভাগ এবং গলদেশ আচ্ছাদিত করিবার জন্য এক প্রকার পোষাক) পা'জামারই ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বোতামদ্বারা বাঁধা থাকে।

তাহাদের কুর্ত্তাকারের (কোর্ত্তা, গ্রীভযুক্ত স্কন্ধদেশ হইতে শরীরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত খাটো সার্ট, ইহা একটি মেয়েলী পোষাক) ভাঁজে ভাঁজে দক্ষিণ ও বাম উভয় দিকে লেস আছে।

প্রক্ষালণ করিবার সময় তাহারা পা হইতে আরম্ভ করে এবং পরে মুখ ধৌত করে।

পর্ব্বদিনে সুগন্ধিদ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাহারা গোময়দ্বারা শরীর লেপন করে।

পুরুষগণ মেয়েলী পরিচ্ছদের জিনিসগুলি ব্যবহার করে। তাহারা কর্ণাভরণ ও হস্তে বলয় পরিধান করে এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করে।

গদী ব্যতীত তাহারা অশ্বারোহণ করে কিন্তু গদী থাকিলে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরোহণ করিয়া থাকে। তাহারা অশ্বে ভ্রমণকালে পশ্চাতে কাহাকেও লইতে ভালবাসে।

তাহারা কটীদেশের দক্ষিণ ভাগে কুঠার দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে এবং যজ্ঞোপবীত নামীয় বন্ধনী পরিধান করে। উহা বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কোমর পর্য্যন্ত লম্বমান।

পরামর্শকালে ও বিপদের সময় হিন্দুগণ স্ত্রীলোকদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে হিন্দুগণ পুত্রের প্রতি বিশেষ মনযোগ প্রদর্শন করে; কিন্তু কন্যার প্রতি করে না। সন্তানের মধ্যে তাহারা, বিশেষতঃ দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকরা, পুত্রকে অধিক আদর করে।

করমর্দ্দনের সময় তাহারা হস্তের পশ্চাদ্দিক ধারণ করে।

হিন্দুগণ গৃহ প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা করে না, কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ-কালে অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

সভাসমিতিতে তাহারা এড়োএড়ি ভাবে পা রাখিয়া উপবেশন করে। তাহারা উপস্থিত গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন না করিয়া নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে ও নাসিকা ঝাড়ে।

তাহারা তন্তুবায়দিগকে অপবিত্র মনে করে, কিন্তু যে চর্ম্মকারগণ অর্থের জন্য মরণোন্মুখ জন্তুদিগকে জলে নিমগ্ন করিয়া অথবা দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করে—তাহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করে।

বিদ্যালয়ে বালকদিগের জন্য কৃষ্ণবর্ণ লিখিবার পাত্র ব্যবহৃত হয় এবং তাহার উপর বালকগণ এক প্রকার শাদা পদার্থ দ্বারা লিখিয়া যায়। তাহারা পুস্তকের নাম শেষে লিখে—প্রথমে নহে।

অলবেরুণী তৎপরে হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত "বিকৃত-স্বভাবের" কথার আলোচনা করিয়াছেন। অলবেরুণী বলিয়াছেন যে, মুসলমানাধিকৃত প্রদেশে সদ্য আগত এমন একটিও হিন্দু বালককে তিনি দেখেন নাই যে অধিবাসীদিগের আচারব্যবহারসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ নহে; কিন্তু তথাপি গুরুর সম্মুখে পাদুকাস্থাপনের সময় সে উল্টা পাল্টা করিয়া রাখে—বাম পদের সম্মুখে দক্ষিণ পদের ও দক্ষিণ পদের সম্মুখে বামপদের জুতা রক্ষা করিয়া থাকে। গুরুর পরিচ্ছদ ভাঁজ করিয়া রাখিবার সময় সে ভিতর দিকটা বাহির করিয়া রাখে এবং গালিচা এরূপভাবে বিস্তৃত করে যে, নিম্নভাগটা উপরের দিকে রক্ষিত হয়। এইরূপ অন্যান্য কার্য্যও সে করিয়া থাকে। এ সমস্তই হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত "বিকৃত স্বভাবের" পরিচায়ক। অলবেরুণী বলেন যে, শুধু যে হিন্দুগণের এইরূপ স্বভাব তাহা নহে; পরন্তু অসভ্য আরবদিগের মধ্যেও এইরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয়।

অলবেরুণী মৃতদেহের অন্তষ্টিক্রিয়ার সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কালে মৃতদেহ নগ্নাবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে বাতাসে নিক্ষিপ্ত হইত। রুগ্ন ব্যক্তিগণও প্রান্তরে এবং পর্ব্বতে নীত হইয়া তথায় পরিত্যক্ত

হইত। তথায় রুগ্নের জীবলীলার অবসান হইলে উপরের উল্লিখিত অবস্থা ঘটিত; আরোগ্যলাভ করিলে তাহারা বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

এই সময়ে একজন বিধান-কর্ত্তার অবির্ভাব হইল। তিনি লোকসমূহকে মৃতদেহ বাতাসে রক্ষা করিতে অদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা এরূপ রেলিং ও ছাদযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল যে, মৃতদেহের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতে পারে। ইহা সূর্য্যোপাসকদিগের (জোরাষ্ট্রিয়ানদের) সমাধিচূড়ার অনুরূপ

এই আচার বহুদিন পালিত হওয়ার পর নারায়ণ মৃতদেহ অগ্নিতে সমর্পণ করিবার বিধান দিলেন। সেই অবধি যাহাতে মৃতদেহের কোন অবশেষ না থাকে এবং সমস্ত আবর্জ্জনা, ময়লা ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত ও তাহার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায় সেইজন্য তাহারা শবদাহ করিয়া আসিতেছে।

আধুনিক কালে শ্লাভনিয়ানগণও তাহাদের মৃতদেহ দাহ করে, যেমন প্রাচীন গ্রীকগণ শবদাহ ও কবর দেওয়া উভয় প্রথাই পালন করিতেন। এই স্থলে অলবেরুণী সক্রেটীস, গ্যালেনাস প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গ্রীকদিগের মধ্যে শবদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই প্রথা সমাজের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ ছিল।

অলবেরুণী তৎপরে সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিই যে হিন্দুগণের ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত হইবার সরল পথ বলিয়া বিবেচিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অবিনশ্বর আত্মার ঈশ্বর সমীপে প্রত্যাগমনসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা এই যে, ইহা কতকটা সূর্য্যরশ্মির দ্বারা (আত্মা সূর্য্যরশ্মির সহিত যুক্ত হইয়া তৎসহ আরোহণ করে) ও কতকটা অগ্নির স্ফুলিঙ্গদ্বারা (কারণ ইহা আত্মাকে ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত করে) সম্পাদিত হয়। কোন কোন হিন্দু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি তাঁহার নিকট যাইবার পথ যেন খুব সরল করিয়া দেন।

জলমগ্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে গাজ তুরস্কদিগের ব্যবহারও ইহার অনুরূপ। কারণ, তাহারা মৃতদেহ নদীতে একটি শবাধারে রক্ষিত করে এবং একগাছি রজ্জু তাহার পদ হইতে ঝুলাইয়া তাহার প্রান্তভাগ জলে নিক্ষেপ করে; এই রজ্জুর সাহায্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা আপনাকে মুক্তির জন্য উন্নীত করে।

এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিশ্বাস বাসুদেবের উক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

অনুরূপ মত মানীর নিম্নলিখিত বচনদ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। "অন্যান্য

ধর্ম্মসম্প্রদায় আমাদিগকে নিন্দা করে; কারণ, আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা ও তাঁহাদের মূর্ত্তিগঠন করি। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে। তাহারা জানে না যে, সূর্য্য ও চন্দ্রই আমাদের পথ, আমাদের দ্বার, যাহার দ্বারা আমরা আমাদের স্বর্গে যাত্রা করিতে পারি।"

লোকে বলে যে, বুদ্ধ মৃতদেহ স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার শিষ্য শ্রমণগণ তাহাদের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করে।

হিন্দুগণের মতে উত্তরাধিকারিগণের উপর মৃতদেহের দাবী আছে। তদ্ধেতু তাহাদিগকে মৃতদেহ ধৌত করিতে, সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা লেপন করিতে, বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে এবং পরে সাধ্যানুসারে চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ও অন্যান্য কাষ্ঠদ্বারা শব দাহ করিতে হয়। দগ্ধাস্থির কিয়দংশ গঙ্গায় নীত হইয়া এরূপ ভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যাহাতে গঙ্গা উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে। গঙ্গা এইরূপে সগরের সন্তানগণের দগ্ধাস্থির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ও তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে উন্নীত করিয়াছিল। ভস্ম কোনও স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। যে স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেই স্থানে তাহারা একটি স্মরণচিহ্ন স্থাপন করে। তিন বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের শরীর দাহ করা হয় না।

যাহারা মৃতদেহসম্বন্ধে এই সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে তাহারা তৎপরে অপনাদিগকে ও তাহাদের বস্ত্রসমূহ দুই দিন ধৌত করে; কারণ, তাহারা মৃতদেহ স্পর্শজন্য অপবিত্র হয়।

যাহারা মৃতদেহ দাহ করিতে অসমর্থ হয় তাহারা উহা কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা কোন স্রেতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত করে।

বিধবাগণের যাহারা স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমনে ইচ্ছুক অথবা যে সকল ব্যক্তি জীবনে নিরাশ হইয়াছে, যাহারা শরীরের কোনরূপ অনারোগ্য ব্যাধি, স্থায়ী শারীরিক বিকৃতি বা জরাদ্বারা ক্লিষ্ট, তাহাদের শরীর ব্যতিত অপর কোন জীবিত ব্যক্তির দেহ দাহন করার কল্পনাও হিন্দুগণ করিতে পারে না। ইহা কোনও সম্মানার্হ ব্যক্তি সম্পাদন করেন না; কেবল বৈশ্য ও শূদ্রগণ করে।

আত্মশরীর দাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ নিয়মদ্বারা নিষিদ্ধ। সেই হেতু ইহারা যদি আত্মহত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে তাহা হইলে

বিস্ময়কর উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কোন ব্যক্তিকে তাহাদিগকে গঙ্গায় মগ্ন করিয়া মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত জলের নীচে রাখিবার জন্য নিযুক্ত করে (ভাড়া করে)।

অলবেরুণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আত্মহত্যা করিবার অন্যবিধ উপায়েরও বর্ণনা করিয়াছেন।

যমুনা ও গঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে বটজাতীয় "প্রয়াগ" নামে একটি বৃক্ষ আছে, এই জাতীয় বৃক্ষের বিশেষত্ব এই যে, ইহার শাখাগুলি দুই প্রকার প্রশাখা বিস্তার করে—কতকগুলি উর্দ্ধদিকে অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় প্রসারিত হয় এবং কতকগুলি শিকড়ের ন্যায় নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়; শেষোক্ত গুলি পত্রহীন। যদি এই প্রকারের কোন প্রশাখা মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে যে শাখা হইতে উহার উৎপত্তি সেই শাখা ধারণ করিবার স্তম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই করিয়াছেন; কারণ, এই বৃক্ষের শাখাগুলি অতি বিশাল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। জোহানেস গ্র্যামাটিকাস বলিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীসে কতকগুলি লোক (যাহাদিগকে তিনি ভূত প্রেতের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) নিজ অঙ্গে তরবারিদ্বারা আঘাত করিয়া ও তদ্ধেতু কোন প্রকার কষ্টানুভব না করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিত।

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল।

চন্দ্রবংশ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ ৫—১৫ অধ্যায়।)

১। সোম

২। বুধ

৩। পুরুরবস্

৪। আয়ুস্, ধীমৎ, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুস্, শ্রুতায়ুস্

অমাবসু →
ভীম ৫
কাঞ্চন ৬
সুহোত্র ৭
জহ্নু ৮
সুমন্তু ৯
অজক ১০
বলাকাশ্ব ১১
কুশ ১২
১৩ কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয়, অমাবসু,
গাধি ১৪
১৫ বিশ্বামিত্র, সত্যবতী (কন্যা,)

আয়ুস্ →
৫। নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি, অনেনস্,

৬। যযাতি, (নহুষ-পুত্র); সুনহোত্র, (ক্ষত্রবৃদ্ধ-পুত্র)

৭। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু, (যযাতি-পুত্র); কাশ, লেশ, গৃৎসমদ, (সুনহোত্র-পুত্র)

৮। কাশিরাজ (কাশ-পুত্র) শৌনক (গৃৎসমদ-পুত্র)

৯। দীর্ঘতমস্

১০। ধন্বন্তরি
|
১১। কেতুমৎ
|
১২। ভীমরথ
|
১৩। দিবোদাস
|
১৪। প্রতর্দ্দন
|
১৫। বৎস বা ঋতধ্বজ
|
১৬। অলর্ক
|
১৭। সন্নতি,
|
১৮। সুনীথ
|
১৯। সুকেতু
|
২০। ধর্ম্মকেতু
|
২১। সত্যকেতু
|
২২। বিভু
|
২৩। সুবিভু
|
২৪। সুকুমার
|
২৫। ধৃষ্টকেতু
|
২৬। বৈনহোত্র
|
২৭। ভার্গ
|
২৮। ভার্গভূ

বুধের ঔরসে পুরুরবার জন্ম সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পটি এই ;—বিবস্বৎপুত্র মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণদ্বারা একটি যজ্ঞ করান। যজ্ঞ কোন মতে পণ্ড হওয়ায় যজ্ঞফলে পুত্র না হইয়া মনুর এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। কন্যার নাম রাখা হইল ইলা। কিন্তু মিত্রাবরুণ মন্ত্রবলে কন্যাটিকে পুত্র করিয়া দিলেন ; তখন তাহার নাম হইল সুদ্যুম্ন। সুদ্যুম্ন এক সময়ে হিমালয়ের জঙ্গলে শীকার করিতে গিয়া জঙ্গলের এমন এক

স্থানে একাকী উপস্থিত হইয়া পড়েন যে, সেস্থানে যাইলে মহাদেবকৃত নিয়ম অনুসারে পুরুষকে স্ত্রী লইয়া যাইতে হয়। তাঁহাকেও তাহাই হইতে হইল। সুদ্যুম্ন যে স্ত্রীজাতি ছিলেন আবার তাহাই হইলেন। ইত্যবসরে বুধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ক্রমে তিনি সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্ব পরিণয়ে পরিণীত হইয়া পুরুরবা নামক পুত্রোৎপাদন করেন। পুরুরবার পর সুদ্যুম্নকে আর গর্ব্ভধারণ করিতে হয় নাই। মনুর অনুরোধে ঋষিগণ মিলিয়া যজ্ঞ-পুরুষের নিকট আবেদন করেন; তাহাতে বুধপত্নীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সুদ্যুম্ন পুনরায় পুরুষ হয়েন ও তাঁহার উৎকল, গম ও বিনত নামে তিন পুত্র হয়। সুদ্যুম্ন মূলতঃ মনুর কন্যা বলিয়া পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই; তবে পিতা কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠান নামক নগরী তাঁহাকে প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুত্র পুরুরবাকে আবার তাহা দিয়া দেন। নহুষের ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্রের বংশে এই কয়জন রাজার নাম পাওয়া যায় ও ইহারা "কাশ্যপ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

পুরুরবার তৃতীয় পুত্র অমাবসুর অধস্তন অষ্টম নৃপতি জহ্নুই গঙ্গাকে উদরসাৎ ও পুনরুদ্গীরণ করেন। তদবধি গঙ্গার অপর একটি নাম জাহ্নবী।

এই ধারাতেই প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের জন্ম। ইনি ব্রাহ্মণ হওয়ায় ইঁহার ধারা ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। ইঁহার ভগিনী সত্যবতী ভৃগুবংশীয় ঋচীকের পত্নী ছিলেন।

অমাবসুর জ্যেষ্ঠ আয়ু রাহুর কন্যাকে বিবাহ করেন ও নহুষ প্রভৃতি পাঁচ সহোদর সেই রাহুকন্যারই গর্ভজাত।

নহুষের যযাতি ব্যতীত আরও পাঁচটি পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম যতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি। যতি জ্যেষ্ঠ, সংযাতি তৃতীয়, যযাতি ছিলেন দ্বিতীয়।

সুনহোত্রের তৃতীয় পুত্র গৃৎসমদের পুত্র শৌনকই নাকি চাতুর্বর্ণ্য সমাজের সৃষ্টি করেন।

সুনহোত্রবংশীয় ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন।

এই বংশীয় প্রতর্দ্দন ভদ্রশ্রেণ্য নামক একটি তাঁহার শত্রুস্থানীয় জাতিকে নির্ম্মূল করেন ও তাহা হইতেই—শত্রুজিৎ নাম পায়েন। তাঁহার পুত্র বৎস বা ঋতধ্বজ কুবলয় নামক অশ্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত।

এই বংশের শেষরাজা ভার্গভূও চাতুর্বর্ণ্য সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রবংশে যদুবংশ।

৭। যদু
|
৮। সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল, রঘু
|
৯। বৃজিনীবৎ
|
১০। স্বাহি
|
১১। রুষদ্রু
|
১২। চিত্ররথ
|
১৩। শশবিন্দু
|
১৪। পৃথুযশস্, পৃথুকর্ম্মন্, পৃথুজয়, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুদান, পৃথুশ্রবস
|
১৫। তমস্
|
১৬। উশনস্
|
১৭। শিতেয়ু
|
১৮। রুক্মকবচ
|
১৯। পরাবৃৎ
|
২০। রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত, হারিত
|
২১। বিদর্ভ
|
২২। ক্রথ, কৌশিক, রোমপাদ
|
২৩। কুন্তি চেদি বভ্রু
|
২৪। বৃষ্ণি ধৃতি
|
২৫। নির্বৃতি
|
২৬। দশার্হ
|

২৭। ব্যোমন্
|
২৮। জীমূত
|
২৯। বংশকৃতি
|
৩০। ভীমরথ
|
৩১। নবরথ
|
৩২। দশরথ
|
৩৩। শকুনি
|
৩৪। করম্ভি
|
৩৫। দেবরাত
|
৩৬। দেবক্ষেত্র
|
৩৭। মধু
|
৩৮। অনবরথ
|
৩৯। কুরুবৎস
|
৪০। অনুরথ
|
৪১। পুরুহোত্র
|
৪২। অংশ
|
৪৩। সত্বত
|
৪৪। ভজিম, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ * বৃষ্ণি
|
৪৫। বিদূরথ, নিমি, বৃকণ, বৃষ্ণি, শত্রাজিৎ, সহস্রজিৎ, অযুতাজিৎ
(অপর পত্নী-গর্ভে)
|
৪৬। শূর
|
৪৭। শমিন্
|
৪৮। প্রতিক্ষত্র
|

* মহাভোজের ধারার নাম মার্ত্তিকবতভোজ ; ইঁহাদের রাজধানী মৃত্তিকবাতের নামানুসারে ইঁহাদিগের এই নাম।

৪৯। স্বয়ংভোজ
|
৫০। হৃদিক
|
৫১। কৃতবর্ম্মন্, শতধনু, দেবমীঢুষ
|
৫২। শূর
|
৫৩। বসুদেব
|
৫৪। বলভদ্র, কৃষ্ণ
|
৫৫। প্রদ্যুম্ন
|
৫৬। অনিরুদ্ধ
|
৫৭। বজ্র
|
৫৮। প্রতিবাহু
|
৫৯। সুচারু

ভজমানের (৪৪) ভ্রাতা অন্ধকের পুত্র
কুকুর, ভজমান, শুচিকল, বর্হিষ
|
ধৃষ্ট
|
কপোতরোমন্
|
বিলোমন্
|
ভবসংজ্ঞ (বা চন্দনোদক দুন্দুভি)
|
অভিজিৎ
|
পুনর্বসু
|
দেবক, উগ্রসেন
|
দেববৎ, উপদেব, সুদেব, দেবরক্ষিত

বসুদেবের আরও নয়জন সহোদর ছিলেন তাঁহাদের নাম দেবভাগ, দেবশ্রবস্, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ।

তাঁহার ভগিনীও ছিলেন পাঁচটি। তাঁহাদের নাম পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, ও রাজদেবী। বসুদেবের পিতা শূর পৃথাকে কুন্তিভোজ নামক তাঁহার এক বন্ধু রাজাকে দত্তক কন্যারূপে প্রদান করেন। পাণ্ডুর সহিত এই পৃথারই বিবাহ হয়। অর্জ্জুন প্রভৃতি ইঁহার সন্তান। শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র শিশুপাল ও শ্রুতদেবার পুত্র দন্তবক্র। ইঁহারা সম্বন্ধে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।

বসুদেবের অনেক পত্নী। তাঁহাদের মধ্যে পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা, বৈশাখী ও দেবকী এই ছয় জনই প্রধানা। রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্ম্মদ, ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, ও দুর্গমসুত এই সাত; মদিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক এই তিন; ভদ্রার গর্ভে উপনিধি ও গদ এই দুই; বৈশালীর গর্ভে কৌশিক ও দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ বসুদেবের এই চতুর্দ্দশ পুত্র। দেবকীর গর্ভে বসুদেবের আরও ছয়টি পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋতুদাস, ভদ্র ও দেহ। ইহারা কংসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে বসুদেবের সুভদ্রানাম্নী কোন কন্যার উল্লেখ দেখিলাম না।

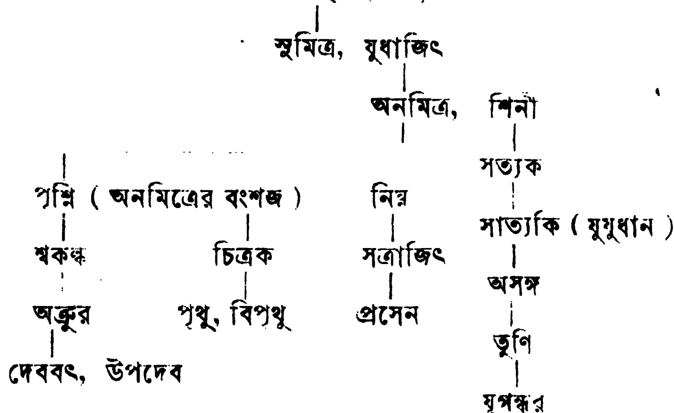
বসুদেবের আর এক নাম আনকদুন্দুভি। বিষ্ণু ইহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিয়া বসুদেবের ভূমিষ্ঠ হওনকালে স্বর্গে দেবতারা তাঁহাদের আনক দুন্দুভি বাজাইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন তাই বসুদেবের নাম, আনকদুন্দুভি।

দেবকের চারি পুত্র ব্যতীত বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, মহাদেবা ও দেবকী এই সাত কন্যা। এই সাতটিই বসুদেবের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এই দেবকীই কৃষ্ণের মাতা।

দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধপাল, যুদ্ধমুষ্টি, তুষ্টিমৎ এই দশ পুত্র ও কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা এই পাঁচ কন্যা। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে মাতুল ও মাসী।

বলভদ্রের দুই পুত্র; নাম নিশঠ ও উল্মুক। বলভদ্রসহোদর শারণের মার্ষ্টি, মার্ষ্টিমৎ, শিশু ও সত্যধৃতি এই চার পুত্র।

অক্রুর, অদ্রাজিৎ, সাত্যকি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ ভজমানের ভ্রাতা দেবাবৃধের সন্তান। মূলতঃ ইঁহারাও যদুবংশীয়।



শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

অদৃষ্ট-চক্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভূতি।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। নদীর পাহাড়ে ভাঙ্গন ধরিলে যেমন ধ্বংশনিবারণ অসম্ভব —সংসারে ভাঙ্গন ধরিলেও তেমনই ধ্বংশনিবারণ অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে যাহা রক্ষা করা সম্ভব তাহাই রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। দেবীচরণ এফ, এ, পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে সংবাদ প্রকাশিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন দেবীচরণকে ডাকিয়া তাহাকে সংসারের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। দেবীচরণ পিতার কথা শুনিল। তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি মরিলেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর আমারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তোমার বড়দাদা যে তোমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিবেন না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। রাধাচরণও গৃহে থাকিবে না। রহিল এক পার্ব্বতীচরণ। আমাদের যে সমস্ত

শিষ্য আছেন, তাঁহাদের দেখিতেই পার্ব্বতীচরণের সময় কাটিয়া যাইবে। গৃহে কে থাকিবে? অথচ না দেখিলে গৃহ ও যে সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুই থাকিবে না। শুধু তাহাই নহে। গৃহে একজন না থাকিলে চলিবে না। গৃহে তোমার কাকিমা উন্মাদিনী, এক ভগিনী বিধবা, আর একজন—।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ইহাদের জন্যই আমার ভাবনা। ভগবান আমাকে যে দুঃখ দিয়াছেন, আমি আপনি সব সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর কে এই সংসারের ভার বহিবে; কে ইহাদের ভাবনা ভাবিবে? সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়াছি।"

দেবীচরণ বলিল, "আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।"

"তোমাদের অন্নকষ্ট নাই। যদি বুঝিয়া চলিতে পার, দুই পুরুষ অন্নকষ্ট ভোগ করিবে না। তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা আমি একরূপ করিয়া যাইব। কিন্তু সংসারের কি হইবে? দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে বি, এ, এম্, এ, পাশ করিলেই উপার্জ্জনের পথ মুক্ত হয় না। আমার ইচ্ছা তুমি গৃহে আসিয়া বাস কর।"

"আপনি অনুমতি করিলে আমি তাহাই করিব।"

"আমার শরীর আর বহিতেছে না। এখন পার্ব্বতীচরণই যজমান রাখুক। আমি তাহাকে সে কায শিখাইয়াছি। তুমি সংসারের ভার বহিতে শিখ। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, তোমাকে সে কায শিখাইব। সব কাযই শিক্ষাসাপেক্ষ। তবে যতদিন আমি আছি, ততদিন তুমি অন্য কাযও করিতে পারিবে। গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে। তুমি এখন সে কায করিতে পার।"

দেবীচরণ আর কোন কথা বলিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় দেবীচরণ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য পাইল।

এ ব্যবস্থায় বামাচরণ বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিল। সে তাহার পত্নীকে বলিল, "দেখিতেছি বুড়া হইয়া বাবার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। ছেলেদের লিখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার যত্নের অবধি ছিল না; আর তিনি অনায়াসে দেবীকে বাড়ীতে বসাইয়া রাখিলেন!"

বড় বধূ বলিলেন, "আমার গতজন্মের পুণ্য ছিল, তাই তুমি তারাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলে। মেজ বৌ তখন কত কথা বলিয়াছিল। আমিও বলিয়াছিলাম,—আখেরে কি হইবে? আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।"

বামাচরণ বলিল, "বাবা কি ভাবিতেছেন? পার্ব্বতীকে যজমানের কাযে রাখিয়াছেন; তাহাই যথেষ্ট। আবার দেবীর 'পরকাল' নষ্ট করা কেন?"

বড় বধূ অধর উল্টাইয়া বলিলেন, "কি জানি!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আখেরের ভাবনা ভাবিয়াই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বামাচরণ তাহা বুঝিতে পারিল না। বড় বধূ স্বামীর মতে মত দিলেন। তাঁহাকে ইচ্ছাপুরে না যাইতে হইলেই তিনি তুষ্ট। তিনি কাহারও ধেঁস সহিতে পারেন না।

বামাচরণ দেবীচরণকে বলিল, "তুমি বড় হইয়াছ, আপনার হিতাহিত বুঝিতে পার। এখন লিখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া কি ভাল বিবেচনা কর? গ্রামের বিদ্যালয়ে চাকরীতে উন্নতির কোনও আশাই নাই। ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য কি ভবিষ্যৎ উন্নতির সব আশা পরিত্যাগ করিবে?"

দেবীচরণ বলিল, "বাবার ইচ্ছা, আমি বাড়ী যাই। কাযেই আমি বাড়ী যাইব। যদি কপালে না থাকে, কিছুতেই উন্নতি হইবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে,—আশার গণ্ডী না বাড়াইয়া অল্পেই তুষ্ট থাকিব। বাবা যাহা বলিতেছেন, তাহা ত করিতেই হইবে।"

বড় বধূ বলিলেন, "ঠাকুর পো, বিবাহটি করিয়াছ; দুই দিন পরে ছেলে হইবে। খরচ ত দিন দিনই বাড়িবে। ঘরে কতই আছে?"

দেবীচরণ হাসিয়া বলিল, "বড় বৌদিদি, বাবা ত ঐ যাহা কিছু আছে তাহা হইতেই আমাদের চার ভাইকে 'মানুষ' করিয়াছেন; চার ভগিনীর বিবাহও দিয়াছেন। কপালে যাহা থাকে হইবে। আমরা কেবল মন বুঝে না বলিয়া ব্যস্ত হই।"

দেবীচরণ চলিয়া যাইলে বামাচরণ পত্নীকে বলিল, "আজকালের ছেলেগুলা বড়ই 'ডেঁপো'; কথা কহে, যেন শাস্ত্র পড়াইতেছে। কত বিজ্ঞ! সংসারের চাপ ঘাড়ে চাপুক, তখন বুঝিবেন—কত ধানে কত চাউল। তখন বুঝিবেন, অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। তখন বুঝিবেন, দাদার কথা আপাততঃ তিক্ত হইলেও পরে মিষ্ট।"

বড় বধূ স্বামীকে বলিলেন, "তোমার যেমন 'ভাই-অন্ত' প্রাণ; উহাদের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া দেহপাত কর! উহারা অন্যরূপ ভাবে।"

বামাচরণ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার কায আমি করি; কেহ শুনুন আর না-ই শুনুন আমার তাহাতে কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই।"

বড় বধূ বলিলেন, "তাহা ত বটেই।"

বামাচরণ ভাবিল, তাহার পত্নী সত্য সত্যই তাহাকে স্বার্থত্যাগী মনে করে। বড় বধূ মনে মনে হাসিলেন, তিনি স্বামীকে বিশ্বাস করাইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রকৃতির স্বরূপ জানেন না।

দেবীচরণ গৃহে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে সংসারের কায শিখাইতে লাগিলেন। যজমানগৃহে তাঁহার গতায়াত ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। এসকল ব্যবস্থার কারণ বিরজা বুঝিল। দুঃখের মত শিক্ষক আর নাই তাহারই শিক্ষকতায় বিরজা সংসার চিনিয়াছিল; সে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অগ্রে দেখিত। সে দেখিতেছিল, জরায় ও দুর্ভাবনায় পিতার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছিল। সে বুঝিতেছিল, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইতেছিল। সে আশঙ্কা তাহার আপনার জন্য নহে; সে ভাবনা অপরের জন্য। সে জানিত, পিতৃবক্ষচ্যুত হইলেও তাহার আর এক আশ্রয় আছে। সে আশ্রয়ও স্নেহস্নিগ্ধ। পিতৃবক্ষে থাকিয়াও তাহার মন মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর জন্য ব্যাকুল হইত। জীবনের সায়াহ্নে তিনি নিঃসঙ্গ প্রবাসে রহিয়াছেন। সে কেন তাঁহার নিকট থাকে না? বিশেষ বারাণসীবাস—সে-ই ত তাহার পক্ষে স্পৃহনীয়। সে ভাবিত পিতার সংসারের জন্য; সে কাঁদিত সরোজার জন্য। সে বুঝিত, পিতার অবর্ত্তমানে সে সরোজাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না—মাতৃহীনা ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে তাহার। মানুষের হৃদয় একটা অবলম্বন নহিলে থাকিতে পারে না—সে একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়ের শূন্যভাব দূর করিতে চাহে। প্রেম ও স্নেহ রমণীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। পতিপ্রেমবঞ্চিতা—অপত্যস্নেহ-স্বাদ-সুখহীনা বিরজার হৃদয় দুঃখিনী ভগিনীকেই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে জননীর ভালবাসা ও জননীর স্নেহ—সবই সরোজাকে দিয়াছিল। আর সে যতই তাহার বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছিল, তাহার হৃদয় যেন ততই তাহাকে সাগ্রহে নিবিড় ভাবে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সকল বিপদ্ হইতে

রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। কত নিশায় সে বিনিদ্র হইয়া সুপ্তা ভগিনীর মুখে চাহিয়া কাঁদিয়াছে; কিন্তু পাছে সে জানিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলেই নয়ন মুছিয়াছে—সে জাগিলেই তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। কিন্তু ভগিনীর জন্য দুশ্চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভারের মত চাপিয়া ছিল।

বিরজা ভগিনীকে কিছু বলিত না বটে; কিন্তু সরোজাও যে কিছু কিছু বুঝিত না, এমন নহে। যে অনুভূতি সময়সাপেক্ষ তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সেই অনুভূতি হইতেছিল। সেও অপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেছিল। তাহারও মুখে চিন্তার ছায়া।

সরোজা ভাবিত—কাঁদিত; কিন্তু কিছুতেই যতীশচন্দ্রকে অপরাধী মনে করিতে পারিত না। বরং কেহ যতীশচন্দ্রের নিন্দা করিলে—তাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। কিশোরীর অনাবিল প্রেম ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। হৃদয়ে স্বার্থপরতা স্থায়ী স্থানলাভ করিবার পূর্ব্বে—প্রেমের পার্থিবভাবের অনুভূতিলাভের পূর্ব্বে—প্রেমে কামনা সঞ্চারের পূর্ব্বে কিশোরীর প্রেম ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির ও সাধকের ভাব ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই প্রেম বাস্তবের মধ্যে মানব-হৃদয়ের ঈপ্সিত আদর্শের আভাস দান করে। এ প্রেম প্রবঞ্চিত করা মহাপাপ। ইহার ক্রমবিকাশ-সন্দর্শন হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করে। যখন আমাদের কণ্ঠে কৈশোরের কুসুমহার কালবশে শুকাইয়া যায়- তখনও কৈশোরের প্রেমস্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিতে পারিলে আমরা ধন্য হইব। তাই সরোজা স্বামীর দোষ দেখিতে পাইত না। উপাসিকা কি কখনও দেবতার ত্রুটি কল্পনা করিতে পারে? সে কল্পনাই যে দেবতার দেবত্ব-বিশ্বাসের বিরোধী! যতীশচন্দ্র তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সে আবার বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু সরোজা তাহার দোষ দেখিতে পাইত না। লোক কেন যতীশচন্দ্রের নিন্দা করে— সে বুঝিতে পারিত না। সে ভাবিত, তিনি যদি আর একজনকে বিবাহ করিয়া থাকেন—আমার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন—তাহাতেই বা তাঁহার দোষ কি? তাহার নিকট যতীশচন্দ্র দেবতা! যতীশ যে কারণেই হউক তাহার সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহার সংবাদ না পাইলে সরোজা স্থির থাকিতে পারিত না। সেই জন্য বিরজার উপদেশে দেবীচরণ যতীশের সংবাদ

লইত। সে কথা দেবীচরণ, বিরজা ও সরোজা ব্যতীত গৃহে আর কেহ জানিতেন না।

দেবীচরণের সহিত যতীশের এই পত্রব্যবহারে দুই পরিবারের মধ্যে—এবং পরোক্ষভাবে পতিপত্নীর মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইতে পায় নাই। তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পতিপত্নীর হৃদয়ের যোগ বিনষ্ট হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

আশ্বিনের শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইল। তিনি সে দিকে মন দিলেন না। শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ তাহা লক্ষ্য করিল; স্বয়ং কিছু বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু বিরজাকে সে কথা বলিল। বিরজাও পিতার দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিতেছিল। আলস্য কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না; কিন্তু এখন তাঁহার দেহে জড়তার চিহ্ন সপ্রকাশ। আর নিত্য বাগানে যাওয়া ঘটে না—ঘরে আর রোয়াকেই সময় কাটে। বিরজা পিতাকে বলিল, "বাবা, আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত কোন অসুখ নাই।" বিরজা বলিল, "আপনি দুর্ব্বল হইতে-ছেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চিরকালই কি দেহে সমান বল থাকে? তোর বাবার বয়স কি বাড়ে না?" বিরজা বলিল, "কিন্তু তাই বলিয়া কোন অসুখ না হইলে দুই চারি মাসে মানুষ এত দুর্ব্বল হয় না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "দেখ্, বিরজা, এ সংসারে আমাদের কেহই মৌরশীপাট্টা লইয়া আইসে না; সকলেরই মেয়াদী বন্দোবস্ত; মেয়াদ ফুরাইলে কাহারও থাকিবার উপায় নাই।" বিরজা তবুও জিদ্ করিল—ডাক্তার দেখাইতেই হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিরজা, আমার উপর দিয়া শোকের—দুঃখের অনেক আঘাত গিয়াছে; বুড়া মানুষের পাকা হাড়—তাই এত দিন টিকিয়া ছিল। কিন্তু আর কত দিন টিকিবে? যখন তোর কাকীমা'র কথা, তোর কথা, আর সরোজার কথা ভাবি, তখন এক এক বার মনে হয়, এ জীর্ণ তরী যদি আরও কিছু দিন থাকে, তবে হয় ত

ভাল হয়। কিন্তু সে কেবল মায়া। সংসারে যে যাহার অদৃষ্ট লইয়া আইসে। আমরা কেবল মোহে মত্ত হইয়া মনে করি, আমরা অদৃষ্টের কায নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। যাহারা ভাবে, সব গুছাইয়া রাখিয়া—কায সারিয়া তবে পার-ঘাটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের গুছান শেষ হয় না—কায থাকিয়াই যায়। যখন পারে যাইবার ডাক পড়ে তখন সব ফেলিয়াই যাইতে হয়। আমার ডাক পড়িয়াছে। এবার যাইতে হইবে। কাহারও বাপ চিরস্থায়ী হয় না।"

বিরজা তবুও জিদ্ করিতে লাগিল। স্নেহশীল পিতা শেষে বলিলেন, "তোর তৃপ্তি হয় ডাক্তার দেখাইব কিন্তু জানিস্ 'ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে নাহি পায় বিধি।' এই সেই অসাধ্য ব্যাধি।"

রাধাচরণ বামাচরণের কথায় তাহার ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিল। বামাচরণ তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার বাটীতে আসিতে পত্র লিখিলেন।

রাধাচরণ গৃহে আসিল। সন্ধ্যার পর রাধাচরণকে ডাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন, ভৃত্যকে তাঁহার হাত বাক্স আনিতে বলিলেন। রাধাচরণ আসিলে তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। ফরাসের উপর লণ্ঠনের মধ্যে গেলাসে নারিকেল তৈলে পলিতা জ্বলিতেছিল। রাধাচরণ উঠিয়া ফরাসে বসিল। ভৃত্য বাক্স দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক আনিব কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "না। তুই বাহিরে যা'।"

ভৃত্য চলিয়া যাইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাধাচরণকে বলিলেন, "কয়টা কথা বলিবার জন্য আজ তোমাকে ডাকিয়াছি।"

রাধাচরণ বিস্মিত ভাবে জ্যেষ্ঠতাতের দিকে চাহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার বয়স অনেক হইয়াছে; আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। কিন্তু আমি মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়টা কথা বলিবার আছে। আমার ভূমিসম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সবই আমি তোমার ও আমার নামে নাম-পত্তন করাইয়াছি। তাহার অর্দ্ধাংশ তোমার। আর তোমার পিতার উপার্জ্জিত টাকা খাটাইয়া যাহা হইয়াছে তাহা এই তোমাকে দিতেছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাতবাক্স খুলিয়া কয়খানা কোম্পানীর কাগজ রাধাচরণকে দিলেন।

রাধাচরণ বলিল, "ও টাকাও ত আপনার। আমি একা পাইব কেন?"

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় পিতৃব্যের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, ও টাকাও আমার। আমি তোমাকে দিতেছি।"

"আপনি আমাদের কয় ভ্রাতাকে সব সমান ভাগ করিয়া দিউন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্নেহে পুত্রাধিক স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকে দক্ষিণ করতল রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "দেবী যদি বেতনের টাকা তোমার কাছে রাখে, তুমি কি প্রাণ ধরিয়া সে টাকা তহবিলে লইতে পার?"

রাধাচরণ তবুও বলিল, "আমি টাকা লইব না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কেন লইবে না? বামাচরণকে ব্যবসা করিতে আমিই ত টাকা দিয়াছি। জামিন দিলে তোমার ভাল চাকরী হইতে পারে; এ টাকা লইয়া তুমি ব্যবসাও করিতে পার। আমি তোমাকে টাকা দিতেছি। তুমি অবশ্যই লইবে।"

রাধাচরণ আর কোন কথা বলিল না। সে পূর্ব্বে কখনও জ্যেষ্ঠতাতের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে নাই; আজ যে পারিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃতি বশতঃ। সে ভাবিল, ইহার পর বামাচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া টাকাটা কয় ভ্রাতায় ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রবিবারে তারাকে একবার পাঠাইয়া দিও।"

"আমি লইয়া আসিব" বলিয়া রাধাচরণ উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাগজ কয়খানি তাহার হস্তে দিলেন।

রাধাচরণ কলিকাতায় যাইয়া বামাচরণকে সব কথা বলিল। বামাচরণ তাহাদিগকে বঞ্চিত করায় পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। সে কথাও ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানিতে পারিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে তিনি যেমন প্রীত হইয়াছিলেন, পুত্রের ব্যবহারে তেমনই ব্যথিত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে মাঘ মাসে তিনি শয্যা লইলেন। এই সময় এক দিন তিনি বিরজাকে বলিলেন, "বিরজা, অনেক দিন শৈলজাকে দেখি নাই। একবার আসিতে পারে না? মরিবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিতে পাইব না?"

বিরজা শৈলজাকে পত্র লিখিল। সে পত্র পাইয়াই শৈলজা পিত্রালয়ে আসিল।

পিত্রালয়ে আসিয়া শৈলজা রাধাচরণকে কলিকাতা হইতে আনাইল; বলিল, "এ সময় সেজবৌ কলিকাতায় কেন?"

পত্নীর সন্তানসম্ভাবনাহেতু রাধাচরণ তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। সে বলিল, "সেজবৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে হইবে।"

শৈলজা রাগিয়া উঠিল; বলিল "এখন তাহারও বাপের বাড়ী যাইবার সময় নহে; তোমারও কলিকাতায় থাকিবার সময় নহে। বুঝিতে পারিতেছ না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত? তোমার এমন বুদ্ধি হইল কেন? কাহাকে হারাইতে বসিয়াছ তাহা কি বুঝিতেও পারিতেছ না?" সে জানিত, জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে পিতৃগৃহে তাহার সকল অধিকারের শেষ হইবে।

তিরস্কৃত রাধাচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল এবং পত্নীকে গৃহে লইয়া আসিল। পিসীমা সেই সঙ্গে আসিলেন। তখন লোকলজ্জাভয়ে বড় বধূও ইচ্ছাপুরে আসিলেন।

নীরজা অল্পদিনপূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। তাহার শাশুড়ী তাহাকে এত শীঘ্র পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। তাই পার্ব্বতীচরণ তাহাকে আনিতে দানাপুরে গেল। সে বহু অনুনয় বিনয়ের ফলে ভগিনীকে লইয়া আসিতে পারিল বটে; কিন্তু ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। তাহার শাশুড়ী গৃহের গৃহিণী। তাঁহার পুত্রগণ বিদেশে চাকরী করে, কেহ পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইতে পায় না। সকলকেই গ্রাসাচ্ছাদনের অনিবার্য্য অর্থ ব্যতীত সব টাকা মা'কে পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি সেই অর্থ সঞ্চিত করেন। তাঁহার অর্থলালসা এমনই প্রবল যে, বধূরা পত্র লিখিবার জন্য একখানা খাম প্রয়োজন হইলেও সকল সময় পায় না। বিবাহিতা পৌত্রীরা পিতৃগৃহে আসিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন—খরচ বাড়িবে। তিনি রুক্ষপ্রকৃতি। তাঁহার দেহ স্বভাবতঃ শীর্ণ—অস্থিচর্ম্মসার; তাহার উপর অম্লরোগে জীর্ণ। কাযেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে বিলম্ব ঘটে না। পার্ব্বতীচরণ এক দিনেই তাঁহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইল। তাহাতে সে শঙ্কিত হইল।

ফাল্গুনের মধ্যভাগে এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিবারের সকলকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, "বামাচরণ, পার্ব্বতীচরণ, রাধাচরণ, দেবীচরণ—তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ

আছে। আমার গৃহে আছেন গৃহবিগ্রহ, আর আছেন বিধবা ভগিনী ও বায়ু-রোগগ্রস্তা ভ্রাতৃবধূ। ইঁহাদের আর আমার এই চারি কন্যার যেন অযত্ন না হয়। আমি কন্যাদের বিবাহ দিয়াছি। তাহাদের অদৃষ্টে সুখই থাকুক আর দুঃখই থাকুক তাহারা তোমাদের যত্নের—স্নেহের প্রত্যাশী,—অন্নের প্রত্যাশী নহে। বিরজার অর্থ ভোগ করিবার লোক নাই। সরোজার শ্বশুর তাহাকে তাহার চলাচলের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে সব কাগজ বাক্সে পাইবে। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সৎপথে চলিও—কষ্ট পাইবে না। আর সব ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।"

শৈলজা জ্যেষ্ঠতাতের পদসেবা করিতে করিতে কান্দিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন, মা? আমার জন্য আনন্দ কর—তোদের সকলকে দেখিতে দেখিতে মরিতেছি; এমন সুখভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?"

শৈলজা আরও কান্দিতে লাগিল। তাহার পক্ষে এ বেদনা পিতৃশোকের সঙ্গে মিশিয়া অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল।

আরও দুই দিন গেল, তৃতীয় দিন প্রাতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগিনীকে বলিলেন, ছেলেদের আহারের উদ্যোগ করিয়া দাও। আমার অবস্থা ভাল নহে।"

তিনি প্রতিবেশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন। তাঁহার নাড়ীজ্ঞানের কথা গ্রামে সকলেই জানিত। তিনি আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ছেলেদের কিছু বলিবেন কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন," এতদিন কথায় ও কাযে যাহা বলিয়াছি তাহা যদি না বুঝিয়া থাকে তবে আজ বলিলেই কি বুঝিবে? এখন আমার আর উহাদের কিছু বলিবার নাই, আমাকে তীরস্থ করিবার ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবতার নাম স্মরণ করিলেন—যুক্ত করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রি হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাকরোধ হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে ভগিনী পুত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রীর রোদননিনাদের মধ্যে তাঁহার প্রাণ দেহ ত্যাগ করিল। ভট্টাচার্য্য পরিবারের উচ্চ চূড়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল—স্বার্থত্যাগী গৃহকর্ত্তার আদর্শ লুপ্ত হইল।

রাধারাণী

(১)

হাসিমপুরের রামরতন মণ্ডল নিজের দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সংসারের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। সে জাতিতে সৎগোপ। তাহার অন্তঃকরণ উচ্চ আশায় পরিপূর্ণ ছিল এবং সে চরিত্রবলে অনেক লোকের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিয়াছিল। গ্রামের দশজন রামরতনের এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের অন্যরূপ কারণনির্দ্দেশ করিত। তাহারা প্রায়ই বলাবলি করিত যে, রামসদয় ঘোষের পুরাতন ভিটা হইতে এক ঘড়া টাকাপ্রাপ্তি রতন মণ্ডলের সৌভাগ্যের কারণ। টাকায় কি না হইতে পারে? টাকায় মানুষের বুদ্ধি খুলিয়া যায়—মূর্খও পণ্ডিত হয়! সদয় ঘোষ রামরতনের বন্ধু ছিল। সংসারে তাহার কেহ না থাকায় মৃত্যুকালে সে রামরতনকে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা ও কয়েক বিঘা দেবোত্তর জমী দিয়া যায় এককালে উক্ত সদয় ঘোষরা খুব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল—বনিয়াদী বংশ সুতরাং সেই ভিটা হইতে এক ঘড়া টাকাপ্রাপ্তির কথায় কেহ বড় সন্দেহ করিত না।

রামরতন মণ্ডল কথাটা যে না শুনিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সে ইহার কোন প্রতিবাদ করিত না; বরং দুই এক জন লোককে ব'লত, "আমার পরিশ্রমই আমার উন্নতির কারণ—পরের টাকা পাইয়া তাহার দ্বারা (অদৃষ্টে না থাকিলে) কি সুখ সৌভাগ্য ক্রয় করা যায়?" রামরতন তাহার দাদাঠাকুর বা পুরোহিতের নিকট সন্ধ্যাকালে প্রায়ই বটতলার রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ শ্রবণ করিত এবং তাহার অনেকাংশ সে আয়ত্ত করিতেও পারিয়াছিল। তাহারই ফলে সে কোন কোন ঘটনায় ঐ সকল গ্রন্থের উপমা প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

সংসারে রামরতন মণ্ডলের স্ত্রী, তাহার বৃদ্ধা মাতা এবং পাঁচ বৎসরের একটি কন্যা ছিল। ইহা ব্যতীত গৃহে কৃষিকার্য্যের জন্য দুইজন তাহারই স্বজাতীয় কৃষাণ এবং গরুগুলির তত্ত্বাবধানজন্য একজন রাখাল ছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত রামরতনের সন্তান হইল না দেখিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা খুবই দুঃখিতা ছিলেন এবং স্থানীয় কোন ভদ্র পরিবার বৃন্দাবনে দেবদর্শনে যখন গমন করেন, সেই সময়ে বৃদ্ধা তাঁহাদের হস্তে দশটি টাকা দিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন, ইহাতে যেন শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য

রামরতনের একটি সন্তানলাভ। তাহারই দুই বৎসরমধ্যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাই বৃদ্ধা সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—রাধারাণী।

রাধারাণী চাষার মেয়ে, তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে। রাধারাণী যখন রক্তাভ মাংসল গণ্ড লইয়া একগাল হাসিতে হাসিতে পাড়ার ডাক্তার বাবুর বাড়ী ছুটিয়া যাইত, তখন ডাক্তার বাবুও তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রাধারাণীর একটা বিশেষত্ব ছিল, সে প্রায়ই বাড়ী থাকিত না—আহারের সময় তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা বা পিতা তাহাকে পাড়ার ভিতর হইতে খুঁজিয়া আনিতেন। রাধারাণীর অল্পবয়সের এই কু-অভ্যাসের জন্য তাহার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা যথেষ্ট চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহার জন্য দুঃখও করিতেন। কিন্তু বৃদ্ধা একমাত্র নাতিনীর বিরাট স্নেহনীরে যখন অবগাহন করিতেন, তখন সকলই ভুলিয়া গিয়া দেবতার নিকট তাহার অক্ষয় পরমায়ু ও একটি ভাল "বরে"র প্রার্থনা মাত্র করিয়া বসিতেন—উপরে উক্ত কু-অভ্যাসের কথা তাঁহার আর সে সময়ে মনে আসিত না।

দেখিতে দেখিতে রাধারাণী দশমবর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল: বর্ষার নববারিসম্পাতে ক্ষীণপ্রাণা লতিকার অঙ্গসমূহ সরস হইয়া যেমন নয়নবিমোহন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ রাধারাণীর প্রতি অঙ্গের মধ্য হইতে একটা সুখকর সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া দিত। সে দিন দিনই সঙ্কোচের পথ পরিত্যাগ করিয়া যেন বিকাশের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাড়ার সকলেই বলিত - রাধারাণী যেন প্রকৃতই "রাধারাণী"। বৃদ্ধা তখন মনে মনে যে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা নরলোকের অদৃশ্য হইলেও, বৃদ্ধাকে এক দিন বলিতে শুনা গিয়াছিল যে, রাণীকে আর কোথাও বেড়াইতে যাইতে দেওয়া হইবে না - পাছে মেয়ের উপর উপদেবতার দৃষ্টি পড়ে।

(২)

সন ১৩১৭ সাল। এবার গ্রামে ম্যালেরিয়া সর্ব্বসংহারক করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এমন গৃহ নাই, যথায় রুগ্নের আর্ত্তনাদ না শ্রবণগোচর হইতেছে। লোকের পেটজোড়া প্লীহা, হস্তদ্বয় ক্ষীণ—পঞ্জরের অস্থিগুলি গণনা করা যাইতেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! কোটরগত চক্ষু, মস্তকে কেশরাশি বিবর্ণ ও দলিত ক্ষেত্রের ন্যায়—দেখিলে হৃদয়ে শঙ্কা হয়। রোগের

যখন পূর্ণ প্রকোপ উপস্থিত হইল, তখনকার সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কে কাহাকে জল দেয়, তাহার ঠিক নাই। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী— সকলেই যেন স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এ যেন মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র। ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ—ঘরে ঘরে হাহাকার—ঘরে ঘরে অভাবের বিকট নৃত্য।

রামরতন মণ্ডলও এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়াজ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা স্বামিস্ত্রীতে আজ ছয় মাস কাল অনবরত জ্বরভোগ করিয়াছে। এখন রাধারাণীর বয়স ১২ বৎসর। সে পিতা-মাতার কাছছাড়া হয় নাই। পূর্ব্বে যে রাধারাণী কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! সে নিজহস্তে পিতামাতার পথ্য প্রস্তুত করে, ঠাকুরমা'কে রন্ধনে সাহায্য করে এবং সময়মত ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া আইসে। আজ কাল তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। তাহার ঠাকুরমা'র হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত—কম্পিত-কলেবরে বৃদ্ধা অগ্রে তাঁহার পৌত্রীর মঙ্গলকামনা করিয়া তবে পুত্রপুত্রবধূর মঙ্গলকামনা করিতেন। স্নেহের কি নিম্নগতি!

(৩)

দিন যায়, থাকে না। এইরূপে গ্রামের কত ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ যে ভাগীরথীর বালুকাপূর্ণ বেলাভূমিতে ভস্মসাৎ হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে? রামরতন ও তাহার স্ত্রী বৃদ্ধা মাতার ও কিশোরী কন্যার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিল। আজ বৃদ্ধার বুকে যেন একটা পর্ব্বতের চাপ—যাঁহার মুখে আমরা কত রহস্য-কথা শুনিয়াছিলাম, আজ তাঁহার যেন কিছুই নাই! বৃদ্ধা একটা ভীষণ বিভীষিকায় নিতান্ত অবসন্নহৃদয়ে যেন কিসের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! তাঁহার শুষ্ক---ম্লান ওষ্ঠদ্বয় শীতের অস্তোন্মুখ পাণ্ডুর চন্দ্রের ন্যায় রাধারাণীর সন্তোষবিধানজন্য কদাচিৎ কম্পিত হইত মাত্র।

আজ রাধারাণীর সকলই গিয়াছে। সে নিঃসহায়া বনহরিণীর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয়ে কেবলই হা-হুতাস করিতেছে। তাহার স্নেহময়ী মাতা, স্নেহশীল পিতা অনন্ত কালের কোন্ অজ্ঞাত ভবনে চলিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গোলা-ভরা ধান্য প্রভৃতি, পল্লীবাসীরা যাহা লক্ষ্মীর কৃপা মনে করে, তাহাও নষ্ট হইয়াছে! এখন রাধারাণীর একমাত্র অবলম্বন, তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা। সে এখনও বালিকা। তথাপি তাহার বালিকা-হৃদয়ে বল ছিল—বিশ্বাস ছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, রামরতন মণ্ডলের কন্যাকে

গ্রামের দশজন উপেক্ষা করিবে না। তাহার পিতা গ্রামের লোকের কি না করিয়াছিলেন? গ্রামে যখনই যাহার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পিতা তখনই তাহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। আর আজ তাহারা কি সেই সকল উপকারের কথা এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া যাইবে? সেই উজ্জ্বল আলোক কি অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইবে? সন্ধ্যায় যখন পল্লীখানি নিতান্ত নিস্তব্ধভাব ধারণ করিত, তখন রাধারাণী তাহার বৃদ্ধা ঠাকুমা'র অস্থিকঠোর বুকে আপনার মুখখানি রক্ষা করিয়া নিতান্ত অধীরভাবে এই সকল কথা কহিত। আর বৃদ্ধা একটা একটা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন,—কদাচিৎ বা তাহার সন্তোষ উৎপাদন জন্য "হুঁ" কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ নানা কথার পর সে ঘুমাইয়া পড়িত। আর বৃদ্ধা অনন্ত শূন্য হৃদয় লইয়া শয্যায় ছট্ফট্ করিতেন। এইরূপে তাহাদের দুঃখের দিনগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

বাঞ্ছারাম ঘোষ রাধারাণীর পিতার জীবিতকালে তাহাদের বাড়ীতে কৃষাণের কার্য্য করিত। গ্রামে যখন ম্যালেরিয়া জ্বরের লেলিহান শিখা গৃহে গৃহে ফিরিতেছিল, বাঞ্ছারাম তখন কলিকাতায় পলাইয়া গিয়া বড় বাজারের একটা দোকানে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। দেড় বৎসরপরে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম হইয়া আসিল, বাঞ্ছারাম তখন গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং তাহার অবস্থাপরিবর্ত্তনের জন্য নানা প্রকার ফন্দী আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাঞ্ছারামের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বৃহৎ মস্তক, রক্তবর্ণ চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া রাধারাণী শৈশব হইতেই তাহাকে ভয় করিত। এখন কলিকাতায় থাকিয়া তাহার দেহ আরও স্ফীত হইয়াছে; আর তাহার কৃষ্ণবর্ণের উপর বার্নিসের ন্যায় একটা জ্যোতি দেখিয়া রাধারাণীর পূর্ব্বভয় যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। বাঞ্ছারাম বাড়ী আসিয়াই নায়েবের সঙ্গে যোগ করিয়া রাধারাণীর ৫০ বিঘা উৎকৃষ্ট জোতজমী বন্দোবস্ত করিয়া লইল। নায়েব জমীদারকে বুঝাইয়া দিল, রাধারাণী বালিকা, তাহার ঠাকুরমা বৃদ্ধা—তাহারা এ জোত রক্ষা করিতে পারিবে না; খাজনার টাকার অভাবে এক দিন নীলামে চড়িবে —তাঁহারও অনর্থক ব্যয়বৃদ্ধি। জমীদার নগদ নজরের টাকা ও খাজনাবৃদ্ধি পাইয়া বাঞ্ছারামকে উৎকৃষ্ট ৫০ বিঘা জোত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

রাধারাণীর ঠাকুরমা ও রাধারাণী এ কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাতে

তাহাদের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। বৃদ্ধা তাঁহার শালগ্রাম শিলার মন্দিরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তোমার মর্য্যাদা তুমি যদি রক্ষা করিতে না পার, নিঃসহায় আমি—তাহার কি করিতে পারি? তবে দেখিও, ঠাকুর! রাণীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

বাঞ্ছারামের একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম কৈলাস। কৈলাসের সঙ্গে রাধারাণী শৈশবে অনেক খেলা করিয়াছে। তাহার প্রকৃতি তাহার পিতার প্রকৃতির বিপরীত। সে গ্রাম্য পাঠশালায় যতটুকু লিখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের একটা সাকার মূর্ত্তি না থাকিলেও মানবের হৃদয়ে সে মূর্ত্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট—"কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না", "কাহারও অনিষ্ট করিবে না"—ইত্যাদি নীতি-বাক্যের মর্ম্ম বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল; সুতরাং তাহার ফলে সে তাহার পিতার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। তাহার পিতা যখন রাধারাণীর ৫০ বিঘা জোত আত্মসাৎ করিয়াছিল, তখন কৈলাস নিতান্ত অধীর-হৃদয়ে রাধারাণীদের বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহাকে ও তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা'কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রাধারাণীর বৃদ্ধা ঠাকুরমা তাহার প্রতি রুষ্ট না হইলেও তাহারই পিতার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে বাঞ্ছারাম তাঁহার বাড়ীতে—তাঁহার পুত্রের আমল হইতে ৩০ বৎসর যাবৎ সামান্য কৃষাণের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, যে একমুষ্টি অন্ন ও পরিবারবর্গের বস্ত্রাদির জন্য কত দিন বৃদ্ধার পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কালমাহাত্ম্যে তাহার আজ এ কি ব্যবহার! বৃদ্ধা কোন-রূপেই ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন না। অনেক চিন্তার পর শেষে তিনি "অদৃষ্টে"র দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৫)

এখন রাধারাণীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। যৌবন তাহার সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। ঠাকুরমা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। সে এখন বড় হইয়াছে। রাধারাণী নির্ভয়ে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা'কে বলিয়াছে, "তুমি জীবিত থাকিতে আমি বিবাহ করিব না।" এই বৃদ্ধ বয়সে রামরতন মণ্ডলের মা যে তাঁহার নাতিনী-জামাই-ঘরে গিয়া

একমুষ্টি অন্নের জন্য বাস করিবেন, এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহনীয়। বৃদ্ধা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কত দৃষ্টান্ত দিলেন। কিন্তু রাধারাণী অটল; সে যে পণ করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভঙ্গ হইবে না। এ সংসারে রাধারাণীর ভালবাসার পাত্র কেহ ছিল না। সে তাহার সরল হৃদয়ে সকলকেই ভালবাসে; কিন্তু যৌবনের প্রেম কাহাকে বলে, রাধারাণী তাহা কখনও উপলব্ধি করে নাই। সে কৈলাসের ব্যবহারে যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করিত—কৈলাসকে স্নেহ করিত। সে শৈশব হইতে কৈলাসকে খেলার সাথী জ্ঞানে স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনও দিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের কোন অভিনয় হইতে দেখা যায় নাই—কেবল একটা প্রীতির ভাব ছিল, এই পর্য্যন্ত। কৈলাসের পিতা যখন তাহাদের এইরূপে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, তখনও রাধারাণী কৈলাসের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। কৈলাসও তাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিল; তাহার পিতা যে রাধারাণীর পিতার কৃপাতেই গ্রামে বাস করিতে পারিয়াছিল, তাহা সে ভুলে নাই।

যাহা হউক, এক দিন বাঞ্ছারাম রাধারাণীর ঠাকুরমা'র নিকট উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার মিষ্টকথার পর তাহার পুত্রের সহিত রাধারাণীর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিল। বৃদ্ধা ঘৃণায় তাহার মুখ হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। বাঞ্ছারাম অপমানিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইবে। বাঞ্ছারাম জমীর ফসলে ও পাটের চাষে যথেষ্ট লাভবান্ হইয়া উঠিতেছিল। পাটের দর খুবই চড়া, তাই বাঞ্ছারাম ধনমদে এতদূর দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রামের কাহাকেও মনুষ্য বলিয়া সে মনে করিত না।

(৬)

কৈলাস ও পাড়ার ডাক্তার বাবু দুর্দ্দিনে বৃদ্ধার সাহায্য করিতেছিলেন। তাহাদের যখনই অন্ন-বস্ত্রের ও ঠাকুরের সেবার অভাব হইত, তখনই কৈলাস ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গোপনে সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিত। একদিন রাধারাণী ঠাকুর-ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে ভাবিতেছে, এ কি? কৈলাস আমার কে? সে তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করে কেন?—এমন সময়ে কৈলাস আসিয়া উপস্থিত। রাধারাণী তাহার প্রশান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি কৈলাসের মুখে স্থাপিত

করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "কৈলাস! তোমার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।" কৈলাস কোন উত্তর দিতে পারিল না; সেও তাহার সঙ্গে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

এই দিন একটা নূতন ভাব তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া একটু বসিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কৈলাসের পিতার অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন যাহা করিতে পারে নাই, কৈলাসের ব্যবহারে তাহাই যেন সম্পাদিত হইতে চলিল। কিন্তু রাধারাণীর প্রতিজ্ঞা, সে বিবাহ করিবে না। সে বিবাহ করিলে পিতামহীর কি হইবে? আবশ্যক হইলে সে গ্রাম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কৈলাস তাহাকে অভয় দিয়াছিল।

কৈলাসের সেই কথায় রাধারাণীর হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তনের সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। রাধারাণী কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, পিতার ব্যবহার নিষ্ঠুর হইলেও, পুত্রের মন এমন সহানুভূতিপূর্ণ কেন? মানবচরিত্রের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটনের ক্ষমতা তাহার ছিল না, কিন্তু কৈলাসের প্রতি অনুরাগে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

(৭)

দিন যায়—থাকে না। অতি দুঃখের রাত্রিও প্রভাত হয়—সুতরাং রাধারাণীদের দুঃখের দিনগুলিও কাটিতে লাগিল। একদিন রাধারাণী নীরবে বসিয়া ভাবিতেছে, এ কি হইল? তাহাদের বড় বড় ঘরগুলির চালে খড় নাই; বাড়ীর উঠান তৃণে পরিপূর্ণ, বিষ্ণুমন্দিরের বারান্দায় রাশীকৃত আবর্জ্জনা। এ কি হইল! সে এক দিনও ইহার জন্য অশ্রুপাত করে নাই। কিন্তু আজ সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় চঞ্চল। তাহার উপর তাহার ঠাকুরমা শয্যাশায়ী। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। এমন সময়ে কৈলাস ঔষধ লইয়া আসিল। সে বৃদ্ধার জন্য দূর গ্রামে কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। আবার সন্ধ্যায় কবিরাজের নিকট যাইতে হইবে। কৈলাস জিজ্ঞাসা করিল, "রাধারাণি, ঠাকুরমা কেমন আছেন? কি করিয়া তোমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব!" রাধারাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া কৈলাসও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল!

তাহার পর? তাহার পর সেই দিন রাত্রিকালে রাধারাণীদিগের তিন

মহাল বাড়ীর সাতখানি খড়ের চালে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব তাঁহার সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য, সেই অগ্নিকুণ্ড ভেদ করিয়া রাধারাণী ও তাহার শয্যাশায়ী পিতামহীর উদ্ধার সাধন করে? সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন বিপন্ন করিতে চাহিল না।

এই সময় কৈলাস একখানি সিক্ত কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া রাধারাণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। রাধারাণী তখন তরঙ্গ-তাড়িত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবলই ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কি উপায়ে বৃদ্ধাকে গৃহ হইতে বাহির করিবে, বুঝিতে না পারিয়া রাধারাণী যেমন পিতামহীর গৃহে প্রবেশ করিবে, অমনই বংশনির্ম্মিত চাল খসিয়া পড়িল—রাধারাণী তীব্র যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া "মা গো" বলিয়া একবার আর্ত্তনাদ করিল মাত্র। রাধারাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে—এমন সময়ে কৈলাস আসিয়া তাহাকে বাহুযুগলে বেষ্টিত করিয়া ধরিল। কৈলাস তাহাকে বাহিরে আনিবে, এমন সময় একখানা বড় চাল তাহাদের নিকট পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—রাধারাণী কৈলাসের স্কন্ধে তাহার মস্তক রাখিয়াছিল—সে মস্তক আর সে তুলিবার অবসর পাইল না। তাহারা উভয়ে সেই অবস্থায় সেই প্রবল অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

* * * *

আর বাঞ্ছারাম? সে এখন উন্মাদ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের লোক তাহাকে দেখিলে তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকে—বাঞ্ছারাম! যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল!

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস।

নবম অধ্যায়।

(২)

মহামতি মিরাবো লোকান্তরিত হইলে ফরাসীরাজ নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই সসাগরা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও অহর্নিশি লাঞ্ছিত হইতেছেন—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দীনহীন দরিদ্রের ন্যায় অর্থকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। টুইলারি-প্রাসাদ তাঁহার কারা-গৃহ। তিনি সপরিবারে রাজনৈতিক বন্দীর ন্যায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন। অবশেষে দুঃখের প্রবল পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি পলায়নের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অহর্নিশি প্রহরিবেষ্টিত টুইলারি-প্রাসাদ হইতে পলায়ন সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি বন্দীর ন্যায় জীবন ধারণ অপেক্ষা পুরুষকারের সাহায্য গ্রহণে অন্ততঃ একবার দুঃখ-দশা বিমোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেনাপতি-প্রবর বৌলির সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৌলি ফরাসীরাজের নিতান্ত অনুগত। তিনি যুদ্ধ-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত। ফরাসীরাজের সর্ব্বশক্তি বিলুপ্ত হইবার পর হইতে তিনি জাতীয় সমিতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু রাজ-পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ। তিনি ইত্যগ্রে ন্যান্সি নগরের বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে রাজার অনন্ত দুঃখ দৃষ্টে ব্যথিত হইয়া তিনি রাজপরিবারবর্গের পলায়নে সাহায্যের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিদেশীয় শত্রুগণের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত তিনি প্রদেশে সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক মণ্টমেডি নগরে তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যগণকে সমবেত করিলেন; প্যারিস হইতে মণ্টমেডি গমন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বণ্ডি, তৎপরে চ্যালন্স, তৎপরে সমভিলি নগরে যাইতে হয়। সমভিলি হইতে কিয়দ্দূরে মণিহোল্ড নগর অবস্থিত। মণিহোল্ড অতিক্রম করিয়া অগ্রে ক্লারমেণ্ট, তৎপরে ভেরিনিছ নগরে গমন করিতে হয়। মণ্টমেডি নগর ভেরিনিছের অনতিদূরে অবস্থিত। প্যারিস নগর

হইতে সীমান্ত প্রদেশের সৈনিকগণের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সমগ্র রাজবর্ত্ম সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ ছলনা করিয়া বৌলি প্রাগুক্ত নগরসমূহে কিয়ৎপরিমাণে সৈন্য সংস্থাপিত করিলেন। রাজপরিবারবর্গ প্যারিস হইতে যে শকটে বণ্ডিনগর পর্য্যন্ত গমন করিবেন, ফারছন নামক জনৈক সুইটজার-ল্যাণ্ডদেশীয় যুবক সেই শকটপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। বুড়ো নামক রাজভক্ত সেনাপতি চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে বণ্ডি হইতে সমভিলি নগর পর্য্যন্ত রাজশকটের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পলায়নের নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমভিলি নগরের সেতুপথে জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। সেনাপতিপ্রবর ড্যাণ্ডস মণিহোল্ড হইতে ক্লারমাট নগর পর্য্যন্ত একদল অশ্বারোহী সহভিব্যাহারে রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। ক্লারমাট নগরে একদল এবং ভেরিনিছ নগরে একদল অশ্বারোহী সংস্থাপিত হইল।

য়ুরোপের এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে হইলে উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র গ্রহণ করা আবশ্যক। রাজ-পরিবারবর্গ কতকগুলি কাল্পনিক নামে পরিচিত হইয়া অনুমতি-পত্র সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যার শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম্ ডি টুর্জ্জেল ব্যারন ডি কর্ফ নাম্নী সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া পরিচিতা হইলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যা কর্ফের কন্যাদ্বয়ের এবং রাজ্ঞী তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রীর স্থান অধিকার করিলেন। রাজভগিনী ব্যারন ডি কর্ফের আশ্রিতা মহিলা এবং রাজা তাঁহার ভৃত্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে রাজ পরিবারস্থ সকলে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। অচিরে মহানাট্যের অভিনয় হইবে। অচিরে তাঁহারা পার্থিব সুখ অথবা পার্থিব দুঃখের চরম সীমা দৃষ্টি করিবেন। তাঁহারা শঙ্কটময় ভীষণ পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁহারা সুখ ও দুঃখ-সাগরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। পাদবিক্ষেপনকালে পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ।

২০শে জুন (১৭৯১ খৃঃ) রাত্রি একাদশ ঘটিকাকালে আহারান্তে রাজ-পরিবারবর্গ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা, রাজপুত্র, রাজকুমারী, রাজভগিনী ও ম্যাডাম ডি টুর্জ্জেল প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক থিয়েটার বন্দর নামক প্যারিস নগরের সুপ্রসিদ্ধ বন্দরসান্নিধ্যে আগমন করিলেন।

তথায় এম্ ডি ফারছন শকটসমভিব্যাহারে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা শকটারোহণ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার সহিত একত্র প্রাসাদের বহির্দ্দেশে আগমন করিলে প্রহরিগণের মনে পাছে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া রাজ্ঞী জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সমভিব্যাহারে প্রসাদত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র পথে গমন করিলেন। কিন্তু নগরের রাজবর্ত্মসমূহ রাজ্ঞী এবং তাঁহার ভৃত্য উভয়েরই অপরিচিত। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ কর্ত্তৃক পথ প্রদর্শিত হইলে যদ্রূপ ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। তাঁহারা দুইজন বহুক্ষণ যাবৎ বহু দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে এক স্থানে সেনানেতৃবর ল্যাফাইট শকটারোহণে আগমন করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞীর হৃৎকম্প হইল। তিনি তখন শশব্যস্ত হইয়া একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার স্তম্ভ শ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দিশাহারা হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাঁহারা ফরাসি-রাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রাজ্ঞী শকটারোহণ করিবামাত্র শকট প্যারিস নগর হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকঘণ্টাকালমধ্যেই বণ্ডি নগরে উপনীত হইল। বণ্ডি নগরে আগমন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞী এক শকটে এবং রাজপুত্রকন্যা,রাজভগিনী ও শিক্ষয়িত্রী দ্বিতীয় শকটে আরোহণ করিলেন। অনন্তর শকট চ্যালন্স নগরে উপস্থিত হইল। তখন রাজ্ঞীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অপর প্রান্তে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর ভয় নাই আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি।" অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংসারের জটিলতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। চক্রান্তনিহিত অনন্ত চক্রের সমন্বয়ে যে বিশ্ব সংসার রচিত তাহা সরল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। যিনি বাহুবলে ব্যূহভেদের ন্যায়,বুদ্ধিবলে সেই চক্রসমষ্টি ভেদ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু সেই ব্যূহ, সেই চক্রান্ত-নিহিত চক্র ভেদ করা রাজপরিবারবর্গের সাধ্যাতীত। রাজাও রাজ্ঞীর ন্যায় অনভিজ্ঞ। চ্যালন্স নগরে আগমন করিয়া বিপজ্জালমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি সেই নগরে প্রকাশ্যভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাহাদের দুরভিসন্ধি থাকিলে রাজপরিবারবর্গ এই স্থানেই বিপদগ্রস্ত হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা

কোন প্রকার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল না। চ্যালন্স নগর হইতে যাত্রা করিয়া রাজপরিবারবর্গ সমভিলি নগরে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিলেন। সমভিলির সেতুসন্নিধানে সোনানায়ক বুড়ো অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত থাকিবেন এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু সেতুসন্নিধানে অশ্বারোহী না দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দে নিরানন্দ হইল। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া অরক্ষিতভাবে মণিহোল্ড নগরে যাত্রা করিলেন। মণিহোল্ড নগরে উপনীত হইলেই তাঁহাদের বিপদের সূত্রপাত হইল।

বিধাতা বিমুখ হইলে অভাবনীয় কারণ হইতে বিষম বিপত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। বক্ষ্যমাণকালে ফরাসিদেশে জাতীয় সমিতির আদেশে ধাতু-মুদ্রার ন্যায় কাগজ-মুদ্রাও প্রচলিত হইয়াছিল। কাগজ-মুদ্রার উপরিভাগে ফরাসিরাজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। রাজপরিবারবর্গ মণিহোল্ড নগরে আগমন করিলে, ড্রয়েট নামক ডাকঘরের কর্ম্মচারী কাগজে মুদ্রাঙ্কিত রাজ-মূর্ত্তির সহিত আগন্তুকগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির সৌসাদৃশ্য অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শকটদ্বয় মণিহোল্ড হইতে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ফরাসিরাজ সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ করিয়া ড্রয়েট তাঁহাদের অনুসরণের নিমিত্ত জনৈক দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের শরীররক্ষণকল্পে মণিহোল্ড নগরে যে সমস্ত অশ্বারোহী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের সেনাপতি ড্রয়েটের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে সন্দিহান হইয়া অশ্বারোহিগণকে অবিলম্বে রাজশকট-সন্নিধানে ধাবমান হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ড্রয়েট রাজপরিবারবর্গের পলায়নবৃত্তান্ত মণিহোল্ড নগরের জাতীয় সৈন্যগণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। জাতীয় সৈন্যগণ শরীর-রক্ষক অশ্বারোহি-গণের অশ্বশালা বেষ্টন পূর্ব্বক সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইল। সুতরাং, শরীর-রক্ষকগণ অশ্বারোহণে সমর্থ হইল না। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া অশ্বারোহিদলের নেতৃপ্রবর ড্রয়েট-প্রেরিত অশ্বারোহীর প্রাণ সংহারের নিমিত্ত একটি দ্রুতগামী অশ্বে জনৈক রাজভক্ত সৈনিক পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। রাজভক্ত সৈনিক অত্যল্প কালমধ্যেই ড্রয়েটপ্রেরিত অশ্বারোহীর সমীপ-বর্ত্তী হইল। কিন্তু ড্রয়েটদূত অচিরে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসরণকারী সৈনিকের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

অনন্তর রাজশকটদ্বয় ক্লারমণ্ট নগরে উপনীত হইত। এই স্থানে বৌলির

আদেশক্রমে রাজপরিবারবর্গের সাহায্যের নিমিত্ত কতকগুলি অশ্বারোহী সৈনিক সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সৈনিকগণের নায়ক তাহাদিগকে রাজশকট সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বিপ্লবসমাগমে রাজার বিশ্বস্ত সৈনিকগণেরও চলচিত্ততা উপস্থিত হইয়াছে। অশ্বারোহিগণ রাজপরিবারবর্গ পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইল। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া রাজ-পরিবারবর্গ প্রহরিবিহীন হইয়া ভেরিনিছ নগরে যাত্রা করিলেন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির পদে পদে বিপদ। ভেরিনিছ নগরে পৌঁছিবামাত্র শকটদ্বয়ের অশ্ব পরিবর্ত্তিত হইলে, রাজপরিবারবর্গ নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেও এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অশ্ব পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বৌলি এই স্থানে স্বীয় পুত্রের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বৌলিপুত্র নিরূপিত স্থানে উপস্থিত না থাকিয়া নগরের অপর প্রান্তে অশ্বসহ রাজপরিবারবর্গের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; অথচ ভ্রমবশতঃ স্থানপরিবর্ত্তনের সংবাদ ফরাসিরাজকে প্রদান করেন নাই। নিরূপিত স্থানে অশ্ব দেখিতে না পাইয়া রাজপরিবারবর্গ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া রাজ্ঞী পদব্রজে দ্বারে দ্বারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৌলির পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া রাজা শকট-চালককে অশ্বপরিবর্ত্তন না করিয়াই শকট চালনা করিতে বলিলেন। কিন্তু শকটচালক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টাকাল বৃথা অতিবাহিত হইতে বৌলিপুত্র অশ্বসহ রাজপরিবারসমীপে আগমন করি-লেন। তখন অশ্ব পরিবর্ত্তনের পর শকট চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইত্যবসরে ভেরিনিছ নগরে ড্রুয়েট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তৎ-প্রেরিত অশ্বারোহীর কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি স্বয়ং ভেরিনিছ নগরে আসিয়া নগরস্থ জাতীয় সৈন্যগণের নিকট রাজপরিবারবর্গের পলায়নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাজশকটদ্বয় নগরের সেতুসন্নিধানে আগমন করিলে রাজা দেখিলেন যে, জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সেতুপথ অবরুদ্ধ; সুতরাং বল-প্রয়োগ ভিন্ন পলায়নের সম্ভাবনা নাই। রাজশকটে দুইজন মাত্র বন্দুকধারী ছিল। তাহারা শত্রুগণের ব্যূহভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বন্দুক উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে জাতীয় সৈন্যগণ শকটের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া শতাধিক বন্দুক যুগপৎ উত্তোলিত করিল। রাজা অবরোধকারিগণের বলাধিক্য দৃষ্টে সান্ত্রিদ্বয়কে বলপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গ্রন্থ-পরিচয়।

নির্ব্বাসন-কাহিনী।*

এই গ্রন্থের লেখক মহাশয় বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপ্রচারক ও বক্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শেষে তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক কারণে নির্ব্বাসিত হয়েন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার নির্ব্বাসনের কথায় পূর্ণ। যে সরলতা ও সরসতাগুণে মনোরঞ্জন বাবুর বক্তৃতা শুনিতে চ্যূতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত দলে দলে শ্রোতার সমাগম হইত, আলোচ্য পুস্তকে সেই দুই গুণই বর্ত্তমান। স্বজনবিরহিত অবস্থায় কারাগারে মনোরঞ্জন বাবু যেরূপ শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন—কারাবাসকে যেরূপ সাধনসহায় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কারাগৃহে তিনি এমনই শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন যে, মুক্তিসংবাদ পাইবার কথায় লিখিয়াছেন,—"চৌদ্দ মাস কাল যে ঘরে বাস করিয়াছি, যে উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি, আজ তাহা ছাড়িয়া যাইব ভাবিয়া মনে সত্যই কিছু ক্লেশ হইল। আমার রান্নাঘরের কাছে আমি ক্ষুদ্র একটি ধনিয়া-ক্ষেত করিয়াছিলাম, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষেতের কাছে গিয়া ধনে গাছগুলিকে স্পর্শ করিতে ও সেগুলির আঘ্রাণ লইতে লাগিলাম। যেখানে যেখানে রোজ বেড়াই, সেই সব স্থানে বেড়াইতে লাগিলাম। আরাম-কেদারায় বসিয়া নীল আকাশ ও সবুজ বৃক্ষ দেখিয়া লইলাম। আর আমার সেই মার্জ্জার-

* নির্ব্বাসন-কাহিনী—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—গিরিডি। মূল্য আট আনা মাত্র।

পরিবার, তাহারা সংখ্যায় এখন আটটী; তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহারা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই যে, এতদিন যে ব্যক্তি তাহাদের আশ্রয় ও প্রতিপালক ছিল, সে আজ হঠাৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। আদুরী আমার বড়ই আদরের ছিল। রাত্রিতে আমি কখনও কখনও আহারের পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আদুরী সম্মুখের দুইটী পা আমার খাটের উপর তুলিয়া দিয়া আমাকে ঠেলিয়া জাগাইত, কিন্তু আমার গায়ে নখর লাগিত না; মকমলের ন্যায় কোমল ক্ষুদ্র পায়ের মৃদু আঘাতে আমি জাগিয়া দেখিতাম, আদুরী আমাকে ঠেলিতেছে, অমনি আমি বুঝিতাম যে, ৯টা বাজিয়াছে, আমার রাত্রির আহারের সময় হইয়াছে। আহারের পর বিড়াল-পরিবার প্রসাদ পাইবে, তাই আমাকে জাগাইতেছে। আদুরীর অনেক কথা এখনও মনে পড়িতেছে,তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি তাহার যে অতুল অনুরাগ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিয়াছি, মনুষ্যের মধ্যেও সেরূপ বিরল। * * * সে আপন সন্তানগণকে স্তন্যপান করাইতেছে, এমন সময়ে অদূরে ভাই-বোন কেহ কোনও কারণে কাঁদিলে আপন সন্তান ছাড়িয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইত। অনেক সময়ই দেখা যাইত, সে আপন তিনটী সন্তান ও তিনটী ভাই-বোনকে এক সঙ্গে স্তন্যদান করিতেছে; ইহাতে তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি অনেক সময় উহার ভাই-বোনকে স্তন্যদানে বাধা দিয়াছি; কেন না, তাহারা তখন বড় হইয়াছে, কিন্তু আদুরী গোপনে তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইত। একদিন একটি ভগিনীকে পাওয়া গেল না, তজ্জন্য আদুরী সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছিল। আজ এই বিড়াল-পরিবারকে ছাড়িয়া যাইব ভাবিয়া আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলাম।”

মনোরঞ্জন বাবু যেরূপভাবে বিড়াল-পরিবারের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে এক সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা ব্যতীত আর কোথাও দেখিয়াছি, মনে হয় না।

গ্রন্থখানির ভাষা যেমন মধুর, ভাব তেমনই নির্ম্মল। আর গ্রন্থে নানা রূপ বর্ণনা এমনই সরস যে পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। গ্রন্থে গ্রন্থকারের সদানন্দ হৃদয়ের পরিচয় সর্ব্বত্রে সপ্রকাশ।

নারীধর্ম্ম *

এই গ্রন্থখানি হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীগণের উদ্দেশে লিখিত। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'সন্ধ্যা' ও 'প্রতিবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকার হিন্দু ব্রাহ্মণ, হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং হিন্দুত্বের গৌরবে উৎফুল্ল। তিনি নানা শাস্ত্র-রত্নাকর মন্থন করিয়া হিন্দু-আদর্শের কয়েকটি মূল্যবান্ রত্ন বঙ্গীয় হিন্দুগৃহস্থের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কুললক্ষ্মীদিগের কৃপাকটাক্ষে এই রত্নাভরণগুলির উজ্জ্বল মহিমা বিকীর্ণ হইয়া বঙ্গের গৃহ সুন্দর, শান্তিময় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব সুখের মঙ্গল-নিকেতনে পরিণত করুক।

কার্য্যক্ষেত্র হইতে শ্রান্ত-ক্লান্ত-হৃদয়ে যখন আমরা গৃহে ফিরি, তখন গৃহপ্রান্তের স্নিগ্ধছায়ায় যে কত সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত আছে, তাহা আমাদের বুঝিবার অবকাশ হয়। যে অন্তঃপুর আমাদের আলয়, কর্ম্মস্রোতের জন্মস্থান, শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, জাতীয় জীবনের ধাত্রীগৃহ,—যে অন্তঃপুর আমাদের লীলার কুঞ্জবন, ধর্ম্মাপবর্গের নিলয়, চিন্তা ও সাধনার আশ্রয়, সন্তানের চরিত্রভূমি সেই অন্তঃপুরে সতীত্বের আদর্শ, ধর্ম্মের গৌরব, সরলতাপবিত্রতার মূর্ত্তি দেখিতে কে না ইচ্ছা করেন? কিন্তু সে কাল গিয়াছে, যখন পুরমহিলারা গৃহকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে আনন্দ পাইতেন, ব্রতচর্য্যায় যখন প্রোষিত-ভর্তৃকার ও বিধবার সময় সুখে কাটিয়া যাইত, স্বামীর পরিচর্য্যায়, সন্তান-পালনে এবং রোগীর শুশ্রূষায় যাঁহাদের হোমশিখার ন্যায় পবিত্রমূর্ত্তি অমিত দীপ্তিতে প্রতিভাত হইত! সে কালের সে আদর্শ এখন স্মরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। আজকাল রঙ্গমঞ্চ কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী, রোহিণী ও বিনোদিনী বা তাঁহাদের প্রতিবেশিনীগণের চটুল চপলতায় মুখরিত, যাত্রাগানে সীতা-সাবিত্রীর স্থলে রসে ভরপূর নূতন নূতন চরিত্রের আমদানী হইতেছে, এবং কথক ঠাকুর যখন কদাচিৎ কখনও দেখা দেন, তখন তিনি এই নূতন রুচির সহিত সুর মিলাইয়া, পুরাতনের সাঁচ্চার উপর হালের চুম্‌কি বসাইয়া নিজের "সিধা ও বিদায়ের" পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সুযোগ

* নারীধর্ম্ম—শ্রীগিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। কলিকাতা ৩নং মিরজাপুর ষ্ট্রীট হইতে সেন, রায় কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

করিতেই ব্যস্ত। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, পুরাতন আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এইজন্য সমাদরলাভের অধিকারী। ইহাতে অনেক শিখিবার ও শিখাইবার আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে শাস্ত্রীয় নীতিগুলির একটি নীরস শুষ্ক সংস্করণ করিয়া তুলেন নাই, পরন্তু উদাহরণ ও লিপিকৌশলের গুণে সেগুলিকে যথেষ্ট সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে পাতিব্রত্য, সন্তান-লালন, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সংসার-ধর্ম্মের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুচারুরূপে ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে অথচ সীতা, পার্ব্বতী, মহাশ্বেতা, কাদম্বরী, দেবী চৌধুরাণী ও রাণী শরৎসুন্দরীর উপন্যাস ও আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় অতি উপাদেয় ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রচার সফল হউক, বঙ্গরমণী আর্য্যনারীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন, মানবজাতির ইতিহাসে আর্য্যনারীর মাতৃমূর্ত্তি ও পত্নীমূর্ত্তি অক্ষয়, উজ্জ্বল ও চিরগৌরবান্বিত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

গ্রন্থখানির আকারের তুলনায় মূল্য (এক টাকা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, এবং মুদ্রাকর-প্রমাদও ততোঽধিক। আশা করি, এই দুইটি বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে মনোযোগী হইবেন।

আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম *

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থখানির ন্যায় এ পুস্তিকাখানিও নারীধর্ম্মের প্রতিপাদনকল্পে রচিত। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সচরাচর যেরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বক্তৃতার দ্বারাই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির কলেবর পুষ্ট। সুতরাং আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই। হিন্দুললনাদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে কেবল কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া, পতিস্তোত্র পাঠ, পতিপদপ্রক্ষালন ও পতিপাদোদকপানের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। উপদেশ যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয়, উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে একটি দিব্য আদর্শ হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া যায়, স্বভাব-কোমলা গৃহপিঞ্জরকোকিলাগণের মনোবৃত্তিগুলি সহজে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহা না করিতে পারিলে,

* আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম—শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্য-সিন্ধু-প্রণীত। কলিকাতা ৬৭ কলেজষ্ট্রীট ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য চারি আনা।

এ সকল পুস্তকের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও সৎকথার প্রসঙ্গমাত্রই উপাদেয়। গ্রন্থকার সেজন্য সমাজের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ও ভাষার বিশুদ্ধিও প্রশংসার্হ।

আফগান-আমির-চরিত।*

গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত আবুনাসের সইদুল্লা-প্রণীত। "প্রণীত" না বলিয়া "অনূদিত" বলিলে বোধ হয় সুসঙ্গত হইত। কেন না, এখানি আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমির আবদুর রহমানের স্বহস্তলিখিত আত্মচরিত। মূলগ্রন্থ পার্শীভাষায় লিখিত; গ্রন্থকার তাহার অনুবাদক মাত্র। অনুবাদকার্য্য অনেক সময়ে বড়ই দুরূহ ব্যাপার; তিনি সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পার্শীপাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে অনুবাদ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের বঙ্গভাষার উপর যে প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র ভ্রমপ্রমাদশূন্য না হইলেও প্রাঞ্জল, গতিবিশিষ্ট ও সরস।

আমির আবদুর রহমানের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ ও ষড়্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। কখনও তিনি পলাতক, কখনও সেনানীপ্রিয়, যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতি, কখনও নিজরাজ্যে নজরবন্দী, কখনও পররাজ্যে স্বাগত অতিথি, কখনও মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় ম্রিয়মাণ, কখনও স্বেচ্ছাচারী পিতৃব্যের রোগশয্যাপার্শ্বে সেবাতৎপর। এই সকল কারণে আবদুর রহমানের আত্মচরিত উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপ্রদ। তাঁহার অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনগুলি সেইজন্য আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। রুস ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থলে পড়িয়া পরলোকগত আমির কিরূপে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের বিবরণ হইতে জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? এই আত্মচরিতে আমির তাঁহার নিজের দুন্দুভি নিজে বাজাইতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার বর্ণনার মধ্যে সরলতা, সত্যের মর্য্যাদা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস বেশ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আবদুর রহমানের জীবন অধ্যবসায়ের একটি সুন্দর

* আফগান-আমির-চরিত (প্রথম ভাগ)—শ্রীআবুনাসের সইদুল্লা-প্রণীত। ঢাকা, ঘোড়াশাল, ইস্‌লামিয়া পাবলিসিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

দৃষ্টান্ত। কৈশোর হইতেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু শিবাজী ও হায়দার আলির ন্যায় বাল্যকালে লিখা-পড়া শিক্ষার দিকে মনোযোগ করেন নাই। পরে একজন প্রণয়ার্থিনী মহিলার পত্রের প্রত্যুত্তর স্বহস্তে লিখিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া সাতিশয় লজ্জা অনুভব করেন এবং তদবধি লিখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। দৈবের অনুগ্রহে যে তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবন কাহিনীর লিপি-চাতুর্য্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

গ্রন্থকার৺ আবুনাসের সইদুল্লা সাহেব বঙ্গভাষায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়া যে অদম্য উৎসাহ ও সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যের হিতকারী ব্যক্তি-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকখানিকে ভ্রমপ্রমাদবিরহিত করিবার জন্য গ্রন্থকারকে মনোযোগী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। অনুবাদের ভাষা প্রায়ই স্থানে স্থানে আড়ষ্ট হইয়া যায়; আলোচ্য গ্রন্থেও সে দোষ একান্ত বিরল নহে। সেগুলির পরিহারও বাঞ্ছনীয়।

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

ঝাঁন্সির লক্ষ্মীবাই।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁন্সিতে যে বীর-রমণীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার কথা অনেক পাঠকই শুনিয়াছেন। এই রমণী ইংরেজরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; বিচার-বুদ্ধির অভাবে আপনার অসাধারণ শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে। য়ুরোপীয় মনীষাসম্পন্ন লেখকগণ লক্ষ্মীবাইয়ের নাম করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। তাঁহারা বীরের জাতি, তাই রমণী-হৃদয়ে এই বীরত্বদর্শনে তাঁহারা বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। লক্ষ্মীবাইয়ের নাম কেবল রাজ-দ্রোহের অভিযোগে কলঙ্কিত হয় নাই, পরন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপেও কলুষিত হইয়া-ছিল। কিন্তু সেই কলঙ্ক বাদ দিয়া যদি আমরা তাঁহার চরিত-কথার আলোচনা করি, তাহা হইলে তাঁহাতে অনেক অসাধারণ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফে' জনৈক লেখক লক্ষ্মীবাইয়ের চরিতাখ্যান অবলম্বনে একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই সুন্দর সন্দর্ভের সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভারতের ইতিহাসে ঝাঁন্সির রাণীর যে চরিত-কথা কীর্ত্তিত রহিয়াছে, সাহসে ও শৌর্য্যে তাহা ফ্রান্স দেশের বীর-রমণী জোয়ান অব আর্কের চরিতাখ্যান অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। উহা চিরকালই মানবমণ্ডলীর সহানুভূতি সন্ধুক্ষিত করিতে থাকিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত ঘটনার সমসাময়িক লোক এখনও অনেকে জীবিত আছেন। পুরাতন যুগের জ্বালামালামণ্ডিত এরূপ গৌরবময় ব্যাপার ইদানীন্তন যুগে আর কোথায়ও সংঘটিত হয় নাই। যে সময় এই মহারাষ্ট্রীয় রমণী তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সময় প্রতিহিংসার প্রণোদনে তাঁহার কার্য্যাবলী নির্ম্মমতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় লাঞ্ছিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু রমণী আমাদের শত্রুদিগের মধ্যে প্রধানা ও বিদ্রোহীদলের প্রধানা নেত্রী ছিলেন, আমাদের তাঁহাকে সম্মান করাই কর্ত্তব্য।

বীরত্বের সম্মান।

সিপাহী-বিদ্রোহের আবির্ভাবকালে ঝাঁন্সি অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়। বিস্তারে ঐ অঞ্চল ইংলণ্ডের দুইটি বৃহৎ শায়ার বা জেলার তুল্য। ইহার অধিবাসি-সংখ্যা আড়াই লক্ষ। বিদ্রোহাবির্ভাবের অল্প দিন পূর্ব্বেই ঝাঁন্সির লোকনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন; তৎপরে ঐ রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ রাজার অল্পবয়সী বিধবা ভার্য্যার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, সুতরাং

বিদ্রোহের কারণ।

রাণীর অন্তরে ক্রোধানল লোল-রসনা বিস্তৃত করিয়া জ্বলিতেছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সংবাদ শিলাময় দুর্গবাসিনী রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট পৌঁছিল। রাণী মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত কামানগুলি তুলাইয়া লইলেন। কোম্পানীর এজেণ্টকে বুঝাইলেন যে, তিনি বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন। এজেণ্ট তাহাই বুঝিলেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং গোপনে বিদ্রোহীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যখন তিনি যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন, তখনই আচম্বিতে ব্যাঘ্রীর ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন।

রাণীর বিশ্বাসঘাতকতা।

রাণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দুর্গস্থিত মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান পর্ব্বতশিখরস্থ একটি সুদৃঢ় দুর্গে সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেকগুলি শিশু ও ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীও ছিলেন। রাণী সেই দুর্গের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গস্থ ব্যক্তিবর্গ সাহসে ভর করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জল, খাদ্য, গোলা বারুদ ফুরাইয়া আসিল। তাঁহারা সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য রাণীর নিকট দূত পাঠাইলেন। রাণী দূতদিগকে হত্যা করিয়া পুনরায় প্রচণ্ডবেগে উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাণীর দুর্গাধিকার-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন রাণী ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার নিশান প্রেরণ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি উক্ত দুর্গে অবরুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে কোনও ইংরেজাধ্যুষিত স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। বিপন্ন দুর্গবাসীরা রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু যখন অবরুদ্ধ খৃষ্টানগণ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নিরস্ত্র অবস্থায় দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, অমনই রাণীর সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে অত্যন্ত নির্ম্মম হইয়া হত্যা করিল। এই কাপুরুষোচিত, পরুষ ও অধর্ম্মের কার্য্য রাণীকে ভীষণ কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিল।

বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপিণী।

অবরুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিবার পর রাণী লক্ষ্মীবাই দুর্গ ও দুর্গের সন্নিহিত জনপদের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী অত্যন্ত দূরদর্শিনী ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহীরা পরিণামে জয়যুক্ত না হইলে, তাঁহার সেই আপাততঃ সুবিধা, সুবিধা বলিয়াই গণ্য হইবে না। সুতরাং বিদ্রোহীরা যাহাতে জয়লাভে সমর্থ হয়, সে জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ—চৈতন্যস্বরূপ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নিজের রাজকোষ আপনার প্রস্তুত মুদ্রায় পূর্ণ, দুর্গাদি সুদৃঢ় ও সেনাসমূহ জনবলে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। সেনাদল শিক্ষিত হইলে রাণীই তাহাদের নেত্রীস্বরূপিণী হইয়া উঠিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া রাণীর দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল এবং ঐ সমস্ত লোক অদম্য উন্মত্ত উৎসাহে দুর্গের প্রাকার-পরিখাদি সুদৃঢ় করিতে আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। রাণীকে তাহারা দেবী বলিয়া মনে করিত।

কিছুকাল ঝাঁন্সি এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোম্পানীর সৈন্য উহা অধিকৃত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিল।

সার হিউ রোজ সসৈন্যে ঝাঁন্সি অবরুদ্ধ করিলেন। তত্রত্য বিদ্রোহী সৈন্যের তুলনায় রোজের সৈন্যসংখ্যা অনেক অল্প ছিল। ঝাঁন্সি সহরের পরিধি দুই ক্রোশ। ইহার জনসংখ্যা ত্রিশ হাজার। দুর্গসম্মুখ হইতে চতুর্দ্দিক্ লক্ষিত হইত এবং সন্নিহিত স্থানে গোলা নিক্ষিপ্ত করা যাইত। ইতোমধ্যে তান্তিয়া-তোপী বাইশ হাজার সৈন্য ও আটাশটি কামান লইয়া অবরোধ-কারী বৃটিশ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। সার হিউ রোজ প্রতিভাশালী সেনানী ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার শৌর্য্য-কাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল। অসাধারণ মনীষাপ্রভাবে তিনি প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধ জয় করিবার রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই রহস্যটি এই,—"শত্রুগণ যখন অনাবৃত প্রান্তরে থাকিবে, তখন ক্ষিপ্রতার সহিত উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে চঞ্চল করিয়া দিবে, যখন উহারা প্রাকারাদির অন্তরালে অবস্থিতি করিবে, তখনও ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া উহাদের পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দিবে; আর যদি তাহারা পলায়ন করিতে থাকে বা পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের অনুসরণ করিবে।" শত বর্ষের ভূয়োদর্শনে এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরেজ এই অভিজ্ঞতা অনুসারেই কার্য্য করিত। তান্তিয়া তোপীর যত সৈন্য ছিল, তাহার দ্বাদশাংশের একাংশ মাত্র সৈন্য লইয়া সার হিউ রোজ প্রচণ্ড বিক্রমে ও অদম্য বেগে তান্তিয়াকে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণের বেগে বিদ্রোহীদিগের ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল, উহাদের সেনাসংস্থান-কৌশল একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। যে সেনাদল ঝাঁন্সির অবরোধ নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাজিত হইয়া প্রান্তরপারে পলায়ন করিল। তখন সার হিউ রোজ যেন বজ্রবন্ধনে দুর্গটিকে বেড়িয়া ধরিলেন। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই যতক্ষণ ও যতদূর সম্ভব নগর রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন এবং যাহাতে তিনি শত্রুহস্তে বন্দিনী না হয়েন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ঝাঁন্সির রমণীগণ এই কার্য্যে পুরুষের সহকারিণী ও উৎসাহদায়িনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রমণীগণ গোলাগুলী ও বারুদ প্রভৃতি পুরুষদিগকে যোগাইয়া দিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দৃষ্ট হইত। রাণী ও তাঁহার সখীগণ মণিমাণিক্য-খচিত পোষাক পরিধান করিয়া সন্ধ্যায় শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে অস্ফুট আলোকে কৃষ্ণ কোট্টাট্টালকে (Black Tower) গমন করিতেছেন, দেখা যাইত। একজন ইংরেজ গোলন্দাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুঁড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিল। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যে ক্ষেত্রে রমণী বিদ্রোহের বুদ্ধিস্বরূপিণী হয়েন, সে ক্ষেত্রেও ইংরেজ জাতি রমণীর প্রাণ সংহার করিতে সম্মত নহেন। ইংরেজ-চরিত্রের ইহাই মহত্ব।

সার হিউ রোজ।

অতি বিস্ময়জনক ভাবেই রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ কয় সপ্তাহ

কালমধ্যে যত বিস্ময়কর ঘটনা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে তাঁহার জীবনে আর কখনই সেরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটে নাই। সার হিউ রোজ ঝাঁন্সি সহর অধিকৃত করেন। নগরবাসীরা যেন কোনও অতিমানুষী শক্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। রাজপ্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠেই তুমুল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহীরা প্রাসাদপ্রকোষ্ঠের নিম্নতলে বারুদ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। প্রখর রবিকরে তের ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিবার পর দেখা গেল যে, বন্দীদিগের মধ্যে রাণী নাই। রাণী সমস্ত দিন যুদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, বিজয়লাভের আর কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তিনি যেরূপ বিস্ময়জনক ভাবে পলায়ন করেন, তাহার নিকট উপন্যাসবর্ণিত অতি বিস্ময়জনক ঘটনাও পরাজয় মানে। সমুন্নত দুর্গচূড়ার গবাক্ষ হইতে রাণীকে নিম্নে একটি অশ্বপৃষ্ঠে অবতরণ করাইয়া দেওয়া হয়। কয়েক শত মাত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার সপত্নীপুত্রকে কোলে লইয়া রাণী তথা হইতে অশ্বারোহণে কল্পি দুর্গে পলায়ন করেন। কল্পি ঝাঁন্সি হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বিস্ময়জনক পলায়ন।

রাণী কল্পিতে পলায়ন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সার হিউ রোজ অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি রাত্রিযোগে দ্রুতবেগে রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং প্রচণ্ড আক্রমণে বিদ্রোহীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। কিন্তু এই কার্য্য করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। প্রখর আতপ-তাপে অনেক ইংরেজ সেনানায়ক ও সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। অনেকে প্রলাপে হাসিতেছিল ও কাঁদিতেছিল। সে কালের সেই হাতাহাতি যুদ্ধ অত্যন্ত ভীষণ। জনৈক আইরিশ গোরা শরীরের উনিশটি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহাকে যখন ডুলিতে তোলা হয়, তখন সে বলিয়াছিল,—"ভাই সকল! সাবধান, যেন আমার মাথা না নড়ে; নড়িলেই মাথাটি পড়িয়া যাইবে।" কল্পি দুর্গটি একটি গিরিশীর্ষে সংস্থাপিত। গিরিটি যমুনা-জল হইতে উত্থিত। উহার চারি-পার্শ্বে অনেক খাত। এই দুর্গে রাণী স্বয়ং যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সার হিউ রোজকে পরাভূত করা অসম্ভব। সন্দিগর্ম্মিতে বারংবার অবসন্ন হইয়াও তিনি উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে কল্পি দুর্গ অধিকৃত করিতে সমর্থ হয়েন।

কল্পি অধিকার।

কিন্তু ইহাতেও লক্ষ্মীবাই ক্ষান্ত হইলেন না। শত্রুর নিকট পরাজয় মানিবেন না, ইহা তাঁহার সংকল্প। এইবার তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও বিস্ময়জনকত্বে তাহা অদ্ভুতকর্ম্মা নেপোলিয়নের ক্ষিপ্রতা ও বিস্ময়জনক কার্য্যের তুল্য। রাণী সমস্ত বিদ্রোহী সেনা লইয়া আবর্ত্তনপূর্ব্বক চম্বল নদী পার হইয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় চলিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত প্রবলবেগে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ইংরেজরাজের বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের দলে যোগ দেন নাই। রাণীর সৈন্য সিন্ধিয়ার সেনাকে আক্রান্ত ও পরাভূত করিল। রাণী তথায় উপনীতা হইলে সিন্ধিয়া-সেনা রাণীর দলে

রাণীর বীরত্ব।

যোগ দিল। মহারাষ্ট্রের প্রধান নরপাল সিন্ধিয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন। প্রাসাদ রাণীর হস্তগত হইল। সিন্ধিয়ার রাজকোষ ও অস্ত্রাগার রাণীর অধিকারে আসিল। যে দিন উপর্য্যুপরি দুই যুদ্ধে রাণী পরাজিতা, সেই দিনই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্যের—অধিক ধনের ও অধিক অস্ত্রের অধীশ্বরী হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। অনেকের মনেই আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

যাহা হউক, সার হিউ রোজ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিলাত হইতে তাঁহার ছুটীও মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছিল।

শেষ।

তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া পুনশ্চ রাণীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গোয়ালীয়র দুর্গের সান্নিধ্যে তাঁহার সহিত বিদ্রোহীদিগের হাতাহাতি যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনা কর্ত্তৃক দুর্গাধিকারের পূর্ব্বেই রাণী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাণী সেনাদলে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আট হাজার সৈন্য তখন প্রচণ্ডপরাক্রমে বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। জনৈক সেনা দেখিল, রক্তপরিচ্ছদমণ্ডিত, শ্বেত পাগড়ী-শোভিত জনৈক যুবক প্রচণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল। যখন বিদ্রোহী সেনা হটিয়া আসিতেছিল, তখন উক্ত ইংরেজ সেনা সেই শ্বেতাম্বরা শ্বেত পাগড়ী-শোভিতা পুরুষবেশা রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মস্তক এক কোপে দেহচ্যুত করে। গোয়ালীয়র-দুর্গ তখন অনধিকৃত, রাণীর দেহ তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত। তাঁহার গলায় সিন্ধিয়ার কোষাগার হইতে লুণ্ঠিত সুন্দর মতির মালা দোদুল্যমান। এক সময় উহা পর্ত্তুগীজ-রাজের ভূষণ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। উক্ত ইংরেজ লেখকই লিখিয়াছেন যে, বহু দোষ সত্ত্বেও রাণী অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মেলা।

১

ঊষা ও সন্ধ্যার হাসি
বিচিত্র মেঘের খেলা,
লয়ে রবি শশী তারা
গগন পেতেছে মেলা।

২

ফুটাইয়ে ফুলদল
মাতা'য়ে মধুপগণ,
কানন রচেছে মেলা
লয়ে তরু লতা বন।

৩

গভীর নির্ঘোষে মাতি
রঙ্গে ভঙ্গে দুলি' দুলি',
সাগর পেতেছে মেলা
অগণিত ঢেউ তুলি'।

৪

ভাই ভগ্নী দারা সুত
লয়ে প্রেম ভক্তি স্নেহ,
মানব রচেছে মেলা
বাঁধি মধুময় গেহ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়